অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বর্দ্ধমান

চৈত্র ১৩২১, এপ্রিল ১৯১৫

সাহিত্য শাখা

২য় খণ্ড

ভূমিকা
রমাকান্ত চক্রবর্তী

সম্পাদনা
গোপীকান্ত কোঙার

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট • কলকাতা-৭৩

নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে,
কাব্য-সাহিত্যে লোক সাধারণের প্রবেশ ঘটাতে
সাহায্য করেছে যাঁদের সৃষ্টি
এবং
সাহিত্য যারা ভালবাসেন তাদের উদ্দেশে

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

- বর্ধমান জেলার মেলা ঃ সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
- বর্ধমান সমগ্র, (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড)
- বর্ধমান সমগ্র, (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে)
- বর্ধমান জেলার পূজা-পার্বণ ও উৎসব
- বর্ধমান জেলার সাহিত্যিক অভিধান
- Bardhaman : Glimpses of Tourism
- বর্ধমান ঃ এক ঝলকে পর্যটন
- পত্র-পত্রিকা পরিচিতি ঃ বর্ধমান
- বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত ও জাল প্রতাপচাঁদ মামলা

ভূমিকা

প্রথমেই এই মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদক অধ্যাপক ড. গোপীকান্ত কোঙার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করি যে, অধ্যাপক ড. কোঙার সুগভীর বর্ধমান-প্রেমের পরিচয় রেখেছেন বর্ধমান-বিষয়ক তাঁর তেরোটি তথ্যপূর্ণ রচনায়। এই গ্রন্থটি তাঁর দ্বারা সম্পাদিত বর্ধমান বিষয়ক চতুর্দশ গ্রন্থ, এবং তা ঐতিহাসিক বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান, সত্যই অপরিহার্য।

১৩২১ বঙ্গাব্দে, মহারাজা বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুরের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের স্থান ছিল বর্ধমান নগর। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন গীতকীর্তি মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। "সাহিত্য সম্মিলন"-এ কেবলমাত্র সাহিত্যই আলোচিত হত না, এর বিভিন্ন শাখায় আলোচিত হত ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞান। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যোগদান করেছিলেন। এই সাহিত্য সম্মিলনকে সর্ব-বিদ্যাবীক্ষণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে, বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এমন কথা অবশ্যই বলা যায় যে, বর্ধমান নগরসহ অন্যত্র যে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে দেশের মানুষ, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত বাঙালিদের সুসংবদ্ধ প্রবন্ধ পাঠে একটা সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদ ছিল। একে কেউ কেউ বলেছেন "বাঙালি জাতীয়তাবাদ"। তাতে তো কোনও ক্ষুদ্রতা ছিল না, বরঞ্চ ছিল এক বলিষ্ঠ দেশভাবনা। অনেক পরিশ্রমে সংগৃহীত অষ্টম অধিবেশনের প্রবন্ধসমূহ পড়লেই তা বোঝা যাবে। এই গ্রন্থে চৌত্রিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধ-পাঠকদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, আব্দুল করিম এবং আব্দুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখেরা। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুরচিত, তথ্যপূর্ণ। এই সব প্রবন্ধ ঠিক রাবীন্দ্রিক ধারার অনুবর্তন ছিল না এই বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সাহিত্য-শাখার সভাপতি বাংলা ভাষার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল্য এখনও আছে। পরিবর্তন ছিল বাস্তব। সেই বাস্তব পরিবর্তনের উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। বলেছেন

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির কথা। কিন্তু, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় "নবনাগরিক সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে বঙ্গ সাহিত্যে দোষ-ত্রুটির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে অকারণে আক্রমণ করেছেন। এটাও বোধ হয় এক ধরনের "প্রাচীন" জাতীয়তাবাদ, যা ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমালোচনাও দেখা যায়। একটা "কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা" এই সংকলনে স্পষ্ট, এবং হয়তো সেই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হবে।

সম্পাদনার কথা

বাঙালীর সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন না হলেও এর গুরুত্ব বা ঐতিহ্য কিন্তু কম নয়। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুরে পাদরীদের দ্বারা বাংলা বই প্রকাশ, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের গ্রন্থ প্রকাশ, বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ, ১৮৫১ সালে লিটন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, তৎকালীন বাংলাদেশের ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর জন বীম্‌স কর্তৃক Academy of Literature-এর প্রয়োজন সম্পর্কে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ, ১৮৯৩ সালে কলকাতায় শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে 'The Bengal Academy of Literature'-এর প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সাহিত্য সভা, সামাজিক সভার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতি তার ভাষা ও সাহিত্যকে একটি মাধ্যম বা উপায় হিসাবে বেছে নিতে শুরু করে। বাঙালীকে একত্রিত করার জন্য বাঙালী সংঘ গড়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে গণআন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটলো তাকে আরও সুনির্দিষ্ট ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনার স্বার্থে অরাজনৈতিক বহু ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে সক্রিয়ভাবে সামিল হলেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের লেখা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এদৎসত্ত্বেও ১৯০৫ সালে সরকারিভাবে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হয়। কিন্তু সাহিত্য ও ভাষা চর্চার আন্দোলন থেমে থাকেনি। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে বা নগরে নগরে সাহিত্য সভা করে সাহিত্য প্রসারের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাই এটি নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে বাঙালীর এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় বাংলার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০১ সালে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ে চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। তাছাড়া তৎকালীন স্বদেশী যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলার মানুষের চিন্তায় জাতীয়তার কেন্দ্র, স্বরাজ শক্তির প্রতিমূর্তি এবং স্বাধীনতার উৎস হিসাবে এবং বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক সত্তা সন্ধানের এক উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হতো। এক কথায় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। এরপর দেশ স্বাধীন হয়েছে; সমাজিক,

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও চলার পথে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে একশত যোল বছর পরে তার অতীত ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে। ঐতিহ্য কোনো স্থাণু বিষয় নয়। আর এই ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তী প্রজন্ম নিজের মতো করে ঐতিহ্য গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগৃহীত গ্রন্থ, চিত্র, মূর্তি, পুঁথি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি আজও গবেষক এবং বিদ্বজ্জনদের চিন্তার খোরাক জোগায় এবং ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সজীব রয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর সাধারণভাবে বার্ষিক অধিবেশন প্রথম থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এবং অন্যান্য অধিবেশনও হয়েছে যেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচালনা সক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে সভ্য অন্তর্ভুক্তি-করণ, বিভিন্ন সমিতি গঠন, পত্রিকা সম্পাদনা, পুস্তক প্রকাশ, পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি বহু বিষয়। কিন্তু ১৩১২ সালে সাহিত্য পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ বৎসর প্রথমে রংপুর এবং পরে ভাগলপুরে পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমর্শ দেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হলে আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করা যাবে এবং সেজন্য সাহিত্য পরিষদকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতির সঙ্গে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সংরক্ষিত করার আহ্বান জানান। ১৩১২ সালে ৯ই ভাদ্র বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে কলকাতায় টাউন হলে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ বার করেন তাতে উল্লেখ করলেন ঃ "আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।"

১৩১১ সালে ময়মনসিংহ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১২ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সাড়া জেগেছিল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লোকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সরকারের দমননীতি উক্ত সম্মেলনকে ভণ্ডুল করে

দেয়। ১৩১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বহরমপুরে সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং এই সময় নাম দেওয়া হয় 'প্রদেশিক সাহিত্য সম্মেলন'। কিন্তু প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সাহিত্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা যাওয়ায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হলেও সাহিত্য সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। তবে কলকাতায় শিল্প প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' নাম দিয়ে ১৩১৪ সাল থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১৪ সাল থেকে শুরু করে মাঝের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত এবং ১৩৪৬ সাল থেকে বন্ধ থাকার পর ১৩৬৬ থেকে ১৪১২ সাল পর্যন্ত মোট ৬০টি অধিবেশন বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১৪ সালে প্রথম অধিবেশন হয় কাশিমবাজার (বহরমপুর) রাজবাড়িতে এবং এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অধিবেশনগুলিতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রমুখেরা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। অধিবেশনগুলির বৎসর, স্থান ও মূল সভাপতিবৃন্দের নাম এখানে দেওয়া হল।

বঙ্গায় স্যাহত্য সাম্মলন

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
প্রথম	১৩১৪	মুর্শিদাবাদ (কাশিমবাজার)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিতীয়	১৩১৫	রাজসাহী শহর	প্রফুল্লচন্দ্র রায়
তৃতীয়	১৩১৬	ভাগলপুর (বিহার)	সারদাচরণ মিত্র
চতুর্থ	১৩১৮	ময়মনসিংহ শহর	জগদীশচন্দ্র বসু
পঞ্চম	১৩১৮	চুঁচুড়া (হুগলী)	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
ষষ্ঠ	১৩১৯	চট্টগ্রাম শহর	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
সপ্তম	১৩২০	কলকাতা	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অষ্টম	১৩২১	বর্ধমান শহর	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
নবম	১৩২২	যশোহর শহর	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
দশম	১৩২৩	বাঁকিপুর (বিহার)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
একাদশ	১৩২৪	ঢাকা শহর	চিত্তরঞ্জন দাশ
দ্বাদশ	১৩২৬	হাওড়া শহর	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ত্রয়োদশ	১৩২৯	মেদিনীপুর শহর	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
চতুর্দশ	১৩৩০	নৈহাটী (২৪ পরগণা)	বিজয়চন্দ মহতাব
পঞ্চদশ	১৩৩১	হাওড়া (রাধানগর)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ষোড়শ	১৩৩১	ঢাকা (মুন্সীগঞ্জ)	জগদীন্দ্রনাথ রায়

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
সপ্তদশ	১৩৩২	বীরভূম (সিউড়ি)	অমৃতলাল বসু
অষ্টাদশ	১৩৩৫	হাওড়া (মাজু)	দীনেশচন্দ্র সেন
ঊনবিংশ	১৩৩৬	কলকাতা (ভবানীপুর)	স্বর্ণকুমারী দেবী
বিংশ	১৩৪৩	হুগলী (চন্দননগর)	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২১তম	১৩৪৪	কৃষ্ণনগর (নদীয়া)	প্রমথ চৌধুরী
২২তম	১৩৪৫	কুমিল্লা	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
২৩তম	১৩৬৬	মেদিনীপুর (বৈষ্ণবচক)	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪তম	১৩৬৭	কলকাতা (ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হল)	প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ
২৫তম	১৩৬৮	বর্ধমান (গঙ্গাটিকুরী)	সুধীররঞ্জন দাস
২৬তম	১৩৬৯	কৃষ্ণনগর (নদীয়া)	রমেশচন্দ্র মজুমদার
২৭তম	১৩৭০	কামারপুকুর (হুগলী)	নরেন্দ্র দেব
২৮তম	১৩৭২	বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী
২৯তম	১৩৭২	জলপাইগুড়ি শহর	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০তম	১৩৭৪	সিউড়ি (বীরভূম)	মনোজ বসু
৩১তম	১৩৭৪	রামচন্দ্রপুর (পুরুলিয়া)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২তম	১৩৭৫	কান্দি (মুর্শিদাবাদ)	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
৩৩তম	১৩৭৬	তমলুক (মেদিনীপুর)	অন্নদাশঙ্কর রায়
৩৪তম	১৩৭৭	পুরুলিয়া	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫তম	১৩৭৮	শিলিগুড়ি শহর	প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
৩৬তম	১৩৭৯	মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম)	সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৭তম	১৩৮০	বর্ধমান শহর	আশাপূর্ণা দেবী
৩৮তম	১৩৮১	কোচবিহার শহর	আশাপূর্ণা দেবী
৩৯তম	১৩৮৩	হুগলী রাজহাটী বন্দব	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
৪০তম	১৩৮৪	চন্দননগর (হুগলী)	আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৪১তম	১৩৮৪	মেদিনীপুর (বিদিশা উপনিবেশ)	কালীকিংকর সেনগুপ্ত
৪২তম	১৩৮৬	বারাকপর (২৪ পরগণা)	কালীকিংকর সেনগুপ্ত (অন্নদাশঙ্কর রায়ের অনুপস্থিতিতে)
৪৩তম	১৩৮৬	আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ার	মনোজ বসু

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
৪৪তম	১৩৮৭	২৪ পরগণা (জয়নগর-মাজিলপুর)	আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৪৫তম	১৩৮৮	হাওড়া (ভারতচন্দ্র মেলা)	দেবেশ দাশ
৪৬তম	১৩৮৯	কলকাতা (স্কটিশচার্চ কলেজ ভবন)	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৭তম	১৩৯০	জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী (কলিকাতা)	জীবনতারা হালদার
৪৮তম	১৩৯১	সুধাকরপুর (নদীয়া)	ড. উমা রায়
৪৯তম	১৩৯৩	শান্তিনিকেতন	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫০তম	১৩৯৪	হাটথুবা (২৪ পরগণা)	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
৫১তম	১৩৯৫	মালদহ	ড. অজিত কুমার ঘোষ
৫২তম	১৩৯৬	বাঁকুড়া	ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩তম	১৩৯৭	রাজপুর, মেদিনীপুর (হলদিয়া)	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৪তম	১৩৯৮	জলপাইগুড়ি	ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫তম	১৩৯৯	বার্ণপুর	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৬তম	১৪০১	কৃষ্ণনগর	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৭তম	১৪০৩	মুর্শিদাবাদ	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৮তম	১৪০৬	পুরুলিয়া	ড. সরোজমোহন মিত্র
৫৯তম	১৪১১	অমৃতপুর (সাতগাড়া)	ড. সরোজমোহন মিত্র
৬০তম	১৪১২	কাটোয়া (বর্ধমান)	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সেটি হল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' শুরু হয় তা ১৩৪৫ সালে ২২তম সম্মিলনের পর বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গদেশ বিভাগ প্রভৃতি কারণে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে ১৩৬৬ সালে সম্মেলন পুনরায় শুরু হয় 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' নামে অভিহিত করে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কোনো উদ্যোগ ছিল বলে জানা যায় না এবং পৃথকভাবে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন নামে নথীভুক্তকরণ হয়। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বর্তমান কার্যালয়ের ঠিকানা পৃথক এবং এটির সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কোনো সম্পর্ক নেই বলা যেতে পারে। বর্তমানে

এটির ২২জন সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে যেটি সদস্যদের দ্বারা দু বছর অন্তর নির্বাচিত হয়। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৩৬৬ সালের সম্মিলনকে ২৩তম সম্মিলন বলে উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তী সম্মিলনগুলিতে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ১৪১২ সালে ৬০তম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বিদগ্ধ মানুষ এবং বিভিন্ন পেশা বা রুচির মানুষ যেমন গ্রন্থকার, সাময়িক ও দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক, বিভিন্ন ধর্ম ও সাহিত্য সভার সম্পাদক ও সভাপতি, শিক্ষা বিভাগের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি, ব্যবহারজীবী, মহারাজ থেকে প্রজা, এমনকি সামান্য ভূম্যধিকারী, চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ, শাস্ত্রানুরাগী, দার্শনিক, সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে এমন মানুষ, বিজ্ঞানী প্রভৃতি উপস্থিত থেকেছেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য (১) সাহিত্য শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি) (২) ইতিহাস শাখা (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি) (৩) বিজ্ঞানশাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি) (৪) দর্শন শাখা (দর্শনের বিভিন্ন বিষয়) প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে আলোচনার পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাদেশিক সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্মেলন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য প্রথম অধিবেশন থেকেই বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য তৃতীয় অধিবেশনে যে নিয়মাবলীর উল্লেখ করা হয় তা চূড়ান্ত রূপ পায় চতুর্থ অধিবেশনে যেখানে নির্দিষ্টভাবে ১৯টি নিয়ম বা কার্যপদ্ধতির কথা বলা হয়। নিয়মাবলীর ১৪(খ) তে বলা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কার্যবিবরণ মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনগুলির লিখিত বিবরণ খুব কমই পাওয়া যায়। তবুও বলা যায় এত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য সম্মেলন নজির বিহীন।

পরবর্তী সময়ে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, (১৩৬৬ সাল থেকে) যেগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির জাঁকজমকতা যেমন পূর্বের মত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তেমনি বিষয়বস্তু, আলোচনা ও অংশগ্রহণও ম্লান হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে দেড় থেকে দু হাজার পর্যন্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি থাকলেও শেষের দিকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে প্রতিনিধির সংখ্যা অনেকক্ষেত্রে দেড় থেকে দুশোতেও নেমে আসে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্মিলন প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত করাও সম্ভব হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অধিবেশনগুলিতে সংক্ষিপ্ত আকারে স্মরণিকা প্রকাশ

করা হয়েছে। বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সদস্য সংখ্যা প্রায় তিনশো। অধিবেশনগুলি মূলত দুদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এবং কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হয়। কলকাতায় অবস্থিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কলকাতা ছাড়াও বগুড়া, হুগলী, মালদহ প্রভৃতি স্থানে শাখা রয়েছে এবং সেগুলি পৃথক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এতে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রতি অনুরাগ ও প্রসারে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে ঐতিহ্য তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি।

অতীতে সাহিত্য সম্মেলন বহু অনুষ্ঠিত হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। আবার বহু সম্মেলন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটি ঐতিহ্যপুর্ণ সাহিত্য সম্মেলনের উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হল 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' যেটি ১৯২৩ সালে শুরু হয় এবং এখানেও বারানসীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সম্মেলনের জন্ম ১৯২২ সালে বাংলার বাইরে 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' নাম নিয়ে। পরের বৎসর ১৯২৩ সালে এটির নাম হয় 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এবং ১৯৫৩ সালে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে এটির নাম হয় 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।' 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' গুলিতে প্রবাসী বাঙ্গালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর অধিবেশন আজ পর্যন্ত ৮১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৮ সালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়খণ্ডের কোডারমায় প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। এক কথায় ১৯২৩ সাল থেকে শুরু করে প্রায় শতাব্দী প্রাচীন সর্ব ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে ব্যাপৃত আছে। কেবলমাত্র সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা প্রকাশ নয়, নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থও উক্ত সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। 'সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা', সুনীলময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬, প্রায় হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থে সম্মেলনের দীর্ঘকালের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড উল্লিখিত হয়েছে। 'সম্মেলন সাহিত্য সংগ্রহ, বহির্বঙ্গে বাঙালি', ১ম খণ্ড (২০০৭), ২য় খণ্ড (২০০৮), উপদেষ্টা, সুনীলময় ঘোষ, মুখ্য সম্পাদক ড. রামদুলাল বসু গ্রন্থগুলিতে বহু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে যা বাঙালী মনের চিন্তন ও দর্শন একটি দর্পণে ধরা পড়েছে বলা যায়।

পরবর্ত্তী সময়ে আরও বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সময়েও রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক প্রভৃতি স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে থাকে। তাছাড়া বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (যা প্রায় কলকাতা-কেন্দ্রিক) অথবা বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (যার পরিধি পৃথিবী জুড়ে বলা হচ্ছে) তাদের বয়স এখনও

এক দশক হয়নি। আবার বর্তমান সময়ে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্দোলন, সমবায়, শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে সম্মেলন প্রায়শই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আর বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রভূমি হিসাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম উপযুক্ত স্থান হিসাবেও বিবেচিত হয়।

কিন্তু আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে (১৩২১ সালে) বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। এ সম্মিলন আর পাঁচটা সম্মেলনের মতো সাধারণ সম্মিলন ছিল না। তার প্রমাণ পাই উক্ত সম্মিলনের অধিবেশন সংক্রান্ত কার্যবিবরণী থেকে যেটি ১৩২২ সালে ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বর্ধমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব এই সম্মিলনের আহ্বায়ক ছিলেন এবং তাঁরই সভাপতিত্বে এই সম্মিলনের প্রথম দিনেই উপস্থিত ছিলেন দেড় হাজার দর্শক, শ্রোতা ও প্রতিনিধি। সেদিনের সভার মূল সভাপতি ছিলেন স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। আর নক্ষত্র সমাবেশ হয়েছিল যাঁদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, ননীগোপাল মজুমদার, যোগেশ চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মুন্সী রওসন আলী চৌধুরী, ব্যোমকেশ মুস্তফি, গুণালঙ্কার মহাস্থবির, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, জলধর সেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ বসু, রাখালরাজ রায়, হর্ষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় যামিনীমোহন মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা, এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ত্রিপুরা, ভাগলপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি দিল্লি থেকে বহু বিদগ্ধ মানুষ সম্মিলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অধিবেশনের আলোচনা চারটি শাখায় ভাগ করা হয়। (১) সাহিত্য শাখায় সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং এই শাখায় ৪৯টি প্রবন্ধ; (২) বিজ্ঞান শাখায় সভাপতি ছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং এই শাখায় ১৬ টি প্রবন্ধ; (৩) ইতিহাস শাখায় সভাপতি ছিলেন যদুনাথ সরকার এবং ২৩টি প্রবন্ধ এবং দর্শন শাখায় সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং এই শাখায় ১৭টি প্রবন্ধ রাখা হয়েছিল। অধিবেশন-এর কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলি ছিল অতি উচ্চমানের এবং সমসাময়িক সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রতিফলন।

অধিবেশন যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য যে প্রস্তুতি ও আয়োজনের কথা কার্যবিবরণীর মধ্যে রাখা হয়েছে তা দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে শতবর্ষ পূর্বে বর্ধমান শহরে এমন একটা আয়োজন বোধ হয় খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। নিমন্ত্রণ থেকে শুরু করে অভ্যর্থনা জানানো, থাকার ব্যবস্থা, রেল

কনসেশন-এর ব্যবস্থা, যানবাহনের ব্যবস্থা, বাসস্থান, মণ্ডপ, প্রদর্শনী, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, প্রভৃতি বহু বিষয় সুচারুভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতি-প্রকরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম দিনের কার্যসূচীতে দেখা যায় অভ্যাগতদের আহ্বান-অভিনন্দন জানানোর সুপরিচালিত এক সভা। সেখানে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভিভাষণ দিচ্ছেন। পূর্ববর্তী সপ্তম সম্মিলনের কার্যবিবরণী পঠিত হচ্ছে এবং অন্যান্য কার্য সমাধা হচ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বর্ধমান সাহিত্য শাখা-পরিষদ, বর্ধমান পুরবাসী, বর্ধমান রাজার পক্ষ থেকে অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। সম্মিলনের প্রধান সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গুণাবলী সম্পর্কে মহারাজের উক্তি ছিল খুবই তাৎপর্য। তাছাড়া সভাপতির অভিভাষণ, দ্বিতীয় দিনের কার্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, সভার শেষে অভ্যাগতদের প্রতি মহারাজের বিনম্র আবেদন, থাকা-খাওয়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ সত্যই চমৎকৃত করে।

দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচী খুবই সুপরিকল্পিত ছিল এবং সুচারুভাবে কার্যকরী হয়। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এই চারটি শাখায় আলোচনার জন্য পৃথক মণ্ডপের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ এসেছিল তার মধ্যে থেকে বাছাই করে নির্দিষ্ট প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে (১ম খণ্ড) লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তৃতীয় দিন ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় দিনের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই দুই সভার কাজ শেষ হওয়ার পর চারটি শাখা একত্র হয়ে বেলা একটার সময় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন শুরু হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে পরলোকগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য বন্ধুদের প্রতি শোক প্রকাশ থেকে শুরু করে অনুপস্থিত সদস্যদের প্রেরিত পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ, বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয় কার্যবিবরণীর অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

সভাপতির সম্বোধনসহ 'ক' থেকে 'ঞ' পর্যন্ত দশটি পরিশিষ্টে স্বস্তিবাদ, নবম বার্ষিক সম্মেলন পরিচালন সমিতি, অভ্যর্থনা সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ, কার্যনিবাহক সভার সাধারণ সদস্য, পরামর্শ সমিতি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ, বর্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণকারী সভাসমিতি, পুস্তকাগার ও পাঠাগারের তালিকা, সম্মিলনে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের তালিকা, স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্মবিভাগ, প্রতিনিধিগণের বাসস্থান, প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষ্যে বর্ধমান রাজবাটীতে আমোদ-প্রমোদ, আয়-ব্যয়, প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষত 'ক' পরিশিষ্টে সভাপতির সম্বোধনে উল্লিখিত কুড়িটি

বর্ধমান তথা বাঙালীর 'গৌরব'এর কথার উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। "ট" পরিশিষ্টে 'বর্ধমানের পুরাকথা' স্বতন্ত্রভাবে ১ম খণ্ডে রাখা হয়েছে।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষ্যে যে চারটি পৃথক শাখায় আলোচনা হয়েছে, তন্মধ্যে বর্তমান খণ্ডে সাহিত্য শাখার বিষয়বস্তু রাখা হল। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়সূচীর মাধ্যমে এগুলি রাখা হয়েছে। উক্ত শাখায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। সভার শুরুতে তিনি দীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পরিবর্তন, রামায়ণ-মহাভারত-এর অনুবাদ থেকে শুরু করে ইসলামী সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব, সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্ক, জটিলতা প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সভাপতির ভাষণ যেন অনেকটাই ছিল সাহিত্য চর্চার দিক নির্দেশ। এরপর গদ্য এবং পদ্য মিলিয়ে ৪৯টি প্রবন্ধ পঠিত হয় অথবা কয়েকটি পঠিত বলে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ৩৪টি প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। বিষয়সূচীর মধ্যে দেখা যায় কেবলমাত্র সাহিত্য নিয়ে সাধারণ আলোচনা ছিল না, বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্য, ভাষা, চিত্র, শিল্প, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শিক্ষা, বিভিন্ন কবির সৃষ্টি, মঙ্গলকাব্য, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রভৃতি নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি থেকে সমসাময়িককালে বাংলা সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তু ও ধারা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেমন ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে খুব কঠোর ও কঠিন ভাষায় যে মন্তব্য করেছেন তা আজ অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক অথবা রূঢ় মনে হতে পারে। প্রবন্ধটি সম্পর্কে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ সম্পর্কে যে ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার গুরুত্বও কম নয়।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সৃষ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে নতুন দিকের সূচনা করে, পরিবর্তন সূচিত হয় তাতে বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অনেকে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। সাধু এবং চলিত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, বিদেশি ভাষা, মুসলমানদের ভাষা, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ভাষা এধরনের নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে আসে। বলা যেতে পারে সাহিত্যের এক যুগ পরিবর্তনের কালে সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয় যেমন আলোচনায় স্থান পেয়েছে তেমনি সাহিত্যিক এবং বিদ্বজ্জনেরা অনেকাংশে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এ ধরনের সাহিত্য চর্চা নিশ্চিতভাবে অনেকাংশে ঐতিহ্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে এবং সেই ঐতিহ্যকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেই পরবর্তী প্রজন্ম সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে চলেছে।

এক কথায় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন এর কার্য বিবরণী তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পর্কে একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যেখানে স্বয়ং মহারাজা অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং জাঁকজমকতা থাকবে এটা আশা করা যেতেই পারে, কিন্তু আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বাংলার সাহিত্য চর্চার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ তা সত্যই আকর্ষণীয় এবং অনুধাবনযোগ্য।

প্রসঙ্গত একটি পরিতাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' নাম নিয়ে যে ২২টি অধিবেশন হয় এবং 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' নাম নিয়ে যে ৩৮টি অধিবেশন আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য খুব কমই পাওয়া গেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে যা রক্ষিত আছে তা অতি সামান্য একটি অংশ মাত্র বলা যায়। 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন', সংস্থার কাছেও তথ্য রক্ষিত হয়নি।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটি হল, মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন শুরু হয় এবং প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে মূল সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ-জনকে সম্মিলনে হাজির করা হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুপস্থিত ছিলেন। এ সম্পর্কে অনেকেই নীরব। অবশ্য সম্মিলন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহানুভূতিপত্র পাঠিয়ে ছিলেন এবং সেটি সম্মিলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সংক্ষেপে পাঠ করে শোনানো হয়। আবার বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা বা সমালোচনা উঠে এসেছে সেগুলি মনকে বেশ নাড়া দেয়। 'নব নাগরিক সাহিত্য' প্রবন্ধে শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন। তা ছাড়া সমসাময়িকালে অন্যান্য নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কেও সমালোচনা উঠে এসেছে। 'সাহিত্য ও তাহার সম্পদ' প্রবন্ধে শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তি .. "রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া নূতন বিশেষ কিছুই লেখেন নাই, বরং পুরাণ লেখাই ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া ও ইউরোপকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফের! এই অনুবাদের জোরেই তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পাইলেন।" ...পড়ে সত্যই অবাক হতে হয় যে রবীন্দ্র বিরোধিতা সেই সময়ে কোন পর্যায়ে ছিল। অবশ্য রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রসঙ্গ কেবলমাত্র সমসাময়িককালে নয় পরবর্তী সময়েও তার সন্ধান মেলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'আনন্দ-বিদায়' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক বিরূপ চিত্র তুলে ধরেন এবং ফলে উক্ত নাটকের দর্শকদের দ্বারা তিনি নিগৃহীত হন (*রবি জীবনী*, শ্রী প্রশান্ত কুমার পাল, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২২৮)। আবার আদিত্য ওহদেদার-এর *রবীন্দ্র বিদূষণের ইতিবৃত্ত*-এর মত গ্রন্থও রচিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে। অনুরূপ বিষয়ের কথা হয়তো আরও উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এ

ধরনের বিরোধিতা রবীন্দ্র প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেনি অথবা সত্যের অপলাপ ঘটানো হয়েছে বলা যায়। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণগুলি মনে করা যেতে পারে ঃ (ক) রবীন্দ্রনাথ সমাজব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, (খ) তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, (গ) তিনি হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে লিখলেও তা অনেকের পছন্দ হয়নি, (ঘ) তিনি জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, (ঙ) তিনি সর্বসাধারণের জীবনের কথা জানতেন না এবং যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ছিলেন না, (চ) তাঁর সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব খুব বেশি ছিল প্রভৃতি। এ ধরনের অভিযোগ যে সঠিক ছিল না তা রবীন্দ্র সৃষ্টি নিয়ে বহু আলোচনা ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করে বিষয়টি দীর্ঘায়িত না করাই শ্রেয় মনে করছি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *রবীন্দ্রজীবনী ও কাব্য প্রবেশিকা*, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭২, গ্রন্থে রবীন্দ্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে সঠিকভাবেই তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। বরং বলা যেতে পারে *চোখের বালী*, *নৌকাডুবি*. *গোরা*, *ঘরে বাইরে*, প্রভৃতি উপন্যাস তৎকালীন প্রাচীনপন্থী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেননি। তাইতো দেখি যখন *চিত্রাঙ্গদা* প্রকাশিত হয় তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলছেন "অশ্লীলতার দায়ে এই বই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা উচিত।"

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করার বাসনা অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে যেমন কিছু সময় লেগে যায়, তেমনি আমার চাকুরিজনিত কর্মব্যস্ততার কারণেও হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া গ্রন্থটি কোন একটি জায়গা থেকে সামগ্রিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে যেমন কিছু অংশ পেয়েছি, তেমনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার থেকেও কিছু অংশ সংগৃহীত হয়েছে। "লুপ্তরত্ন উদ্ধার" করা এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করার কাজে যাঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রয়াত প্রভাত ভট্টাচার্য যিনি মূল গ্রন্থটির একটি বড় অংশ তাঁর সংগ্রহ থেকে ফটোকপি করে নিতে সাহায্য করেছিলেন; অধ্যাপক শ্রী রামদুলাল বসু নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি যিনি তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক শ্রী কিশোরীরঞ্জন দাশ, সম্পাদক, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ড. দেবকুমার ঘোষ প্রমুখেরা নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ড. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রী নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় যাঁরা বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত রয়েছেন, পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রী সদানন্দ দাস, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বর্ধমান শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত, বার-বার তাগাদা দিয়ে আমাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাছাড়া অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করার

জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, এঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা। অধ্যাপক শ্রী স্বপন বসু, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মহাশয় তাঁর অকৃপণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা। এছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী, ১৪০৩, *সাহিত্য সম্মেলনের ইতিবৃত্ত*—অমরনাথ করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৪০১, *সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা*, সুনীলময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯; *সম্মেলন সাহিত্য সংগ্রহ*, বহির্বঙ্গে বাঙালি, ১ম খণ্ড (২০০৭), ২য় খণ্ড (২০০৮) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বিভিন্ন অধিবেশনের স্মরণিকা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছি এবং তাদের কাছে আমি ঋণী।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হলো প্রায় শতবর্ষ পূর্বে যে ভাষা ও বানান ব্যবহার করা হয়েছে তা অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেছি। পাঠক যাতে মূল বিষয়-ভাবনা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে তার জন্য মন্তব্য থেকে সচেতনভাবে বিরত থেকেছি।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়, সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং সাধারণ সম্পাদক এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমার এই উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার সহধর্মিণী সুলেখা কোঙার সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে প্রায় মুক্তি দিয়ে আমার একাজে সহযোগিতা করেছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। পুত্র প্রিয়দর্শন ও পুত্রবধূ অর্চনা সতত প্রহরী হিসাবে আমার একাজে সহায়তা করেছে। আর আমার ছোট্ট ভাই অমর্ত্য তার আদর আর আবদার দিয়ে আমার একাজের ক্লান্তি দূর করেছে। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা, শুভেচ্ছা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর শ্রী কমল মিত্র মহাশয় এবং তার কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এত দ্রুত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে, যেটা বলতে চাই তা হলো গ্রন্থটি প্রকাশের কাজে কিছু ভুলত্রুটি হয়তো থেকে যেতে পারে। মূল গ্রন্থের জীর্ণ অবস্থা এবং পুরাতন ফটোকপি থেকে কপি করে নেওয়ার দরুন কিছু অস্পষ্টতা ছিল। সে কারণে হয়তো ত্রুটিমুক্ত করা যায়নি। তাছাড়া পুরাতন বানানকে রক্ষা করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়তো থেকে যেতে পারে। এক্ষেত্রে দায় সম্পূর্ণ আমার। কিন্তু আগামী দিনের গবেষক, বিদ্বজন ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাজে লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

গোপীকান্ত কোঙার

সূচীপত্র

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর
কে. সি. এস্. আই., অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

ভূমিকা

এবার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় ষাটটীর অধিক প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে কতকগুলি কবিতা। ষাটটী প্রবন্ধ একদিনে পড়িয়া উঠা কঠিন হইবে বলিয়া, আমি দুইদিন আগে গিয়া সাহিত্য-শাখার সেক্রেটারী উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কমলকৃষ্ণ বসু এম্, এ, বি, এল-এর সাহায্যে এবং উপস্থিত প্রবন্ধলেখকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন্ প্রবন্ধের কতটুকু পড়িতে হইবে, কোন্ প্রবন্ধলেখককে কতটুকু সময় দিতে হইবে স্থির করিয়া লই। তাহার ফলে একদিনের মধ্যেই ১১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ হইয়াছিল। একেবারে প্রবন্ধ পড়িতে পারিলাম না বলিয়া কাহারও দুঃখ হয় নাই। এজন্য আমি সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট বিশেষ বাধিত। তিনি যেরূপ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, যেরূপ সৌজন্য ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ভাল না বলিয়া থাকা যায় না।

আমাকে একবার সভাপতির আসন ছাড়িয়া ইতিহাস-শাখায় একটি প্রবন্ধ পড়িতে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সাহিত্য-শাখার উপকার ভিন্ন অপকার হয় নাই। কারণ আমার অনুপস্থিতিতে প্রবীণ লেখক স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে নাটোরের মহারাজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোক আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রবন্ধ শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি অতি সুললিত ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্যের গতি-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি বৰ্দ্ধমানে আসিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রবন্ধটি শেষ করেন।

গদ্যে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষার গতি লইয়া লেখা। ইংরাজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাব এবং বাঙ্গালা শিক্ষার অভাবে সেকালের সুপ্রচলিত অনেক বাঙ্গালা কথা এখন উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহার বদলে যে সকল কথা গড়া হইতেছে সেগুলি না শুনিতে মিষ্ট না মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। পণ্ডিত মহাশয়েরা পাশী শব্দ ব্যবহার করিতে চান না, তাহাতে কতকগুলি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় ঢুকিতেছে। সে সকল শব্দ সংস্কৃত অভিধানেও পাওয়া যায় না। যাঁহারা ইংরাজিতে ভাবেন তাঁহারা ইংরাজি কথার তর্জ্জমা করিতে গিয়া নানা অলৌকিক সংস্কৃত শব্দের সৃষ্টি করিয়া বসেন। প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত

বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষা কি পথে চালাইলে ভালরূপ চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেক সুপরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সাহিত্যের দুরবস্থার কারণ, সাহিত্যসেবীদিগের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। যামিনী বাবু মনে করেন যে, পল্লীতে পল্লীতে পাঠাগার স্থাপন করিয়া লোকের সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ইচ্ছা প্রবল করিয়া দিলে আপনা-আপনি সাহিত্যসেবীদিগের সুবিধা হইবে। এই সকল পাঠাগারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কিরূপ হইবে, তাহাতে কিরূপ আসবাব-পত্র থাকিবে, কিরূপ পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে, গৃহটির আকার-প্রকার কিরূপ হইবে, এইসব বিষয়ে একটি পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

কয়েকজন সুলেখক অনেকগুলি অজ্ঞাতনামা সুকবির জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় সাধক-কবি নবাই ময়রার জীবন-চরিত ও তাঁহার কবিত্বের নমুনা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস সন্ন্যাসী ওরফে "ভুলুয়া বাবা" চুপির দেওয়ান মহাশয়ের বংশাবলি, জীবন-চরিত ও বর্দ্ধমানরাজের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক এই সমস্ত সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সাধক-কবি নীলাম্বরের জীবন-চরিত ও কবিতার নমুনা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মির্জ্জাহোসেন আলি নামক একজন সাধক মুসলমান কবির সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয় "মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" নাম দিয়া কবি দৌলৎকাজি প্রণীত "লোর চন্দ্রাণী ও সতী ময়নার" পুঁথি নামক দুইখানি বাঙ্গালা কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। লোর চন্দ্রাণীতে কবি আপনার উৎসাহদাতা রোসাঙ্গ রাজের অনেক কথা বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিজ রামপ্রসাদ ও সুপ্রসিদ্ধ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটু সমালোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা সুদুর পল্লীগ্রামে থাকিয়া কোন না কোন সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহিনী যাঁহারা লোকসমাজে প্রচার করেন তাঁহারাও ধন্য। বঙ্গপল্লীসমূহে এইরূপ কত রত্ন লুক্কায়িত আছে কে বলিতে পারে।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকির "হিন্দু-মুসলমান" নামক প্রবন্ধটি সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন---যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের মঙ্গলচিন্তা কাহারও হৃদয়ে বলবৎ হইয়া থাকে তবে তিনি সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্দ-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করুন। কিন্তু এই মিলন এই সৌহার্দ্দ রাজনীতি-চর্চ্চায় সভার সাহায্যে সম্ভব না। তবে কি হিন্দু-মুসলমানে মিলনের কোন সদুপায় নাই? আছে।

সে উপায় মাতৃভাষার সেবায়, সে উপায় বাণীমাতার সাধনায় এবং সে উপায় বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চায়। এখানে স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল নাই, আছে কেবল জ্ঞানের পিপাসা।

শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র সিংহ "সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেটিও সকলের মন দিয়া পড়া উচিত। এই প্রবন্ধে তিনি সঙ্গীত-সম্বন্ধে অনেক পুরাণো খবর দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "ভালবাসা ও মাতৃত্ব" নামক প্রবন্ধে এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের কাব্যে প্রেম ও প্রেমে কাব্য নামক প্রবন্ধে গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁহারা নাটক ভালবাসেন ও বাঙ্গালা নাটক-সম্বন্ধে খবর রাখেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ মহাশয়ের, "৺গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল" নামক প্রবন্ধ পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি এই প্রবন্ধে উভয় কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "সাহিত্য ও চিত্রশিল্প" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"সাহিত্যের গঠন ভাষার উপর। ভাষা যেমন ভাব-প্রকাশের একটি মার্গ, কলাবিদ্যাও তেমনি ভাব-প্রকাশের অন্যতম উপায়। এই হিসাবে সাহিত্য ও শিল্পের ক্রিয়া একই।"

কবিতাগুলির মধ্যে দেবগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ মজুমদার-প্রণীত "ম্যালেরিয়া" নামক কবিতাটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কবি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত একখানি গ্রামের ছবি দিয়াছেন। ছবিটা উপর উপর দেখিলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার ভিতরে গভীর শোকের ছবি।

যে খাটটী প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল, সবগুলিই সুপাঠ্য সন্দেহ নাই। সম্মিলন যদি একদিনে এইরূপ ৬০, ৭০টি প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তবে সম্মিলন ব্যর্থ নয়। উহা যে কেবল "Huge Co-eating" তাহা নহে। উহা দ্বারা ভিতরে ভিতরে একটা বেশ ভাল কাজ হয়।

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন

আজ আমরা মহা সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শন ভালবাসেন, আজ তাঁহারা আমাদের এখানে আসেন নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র বাঙ্গলা-সাহিত্যসেবী, তাঁহারাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমরা মন খুলিয়া কথা কহিতে পারি। এখানে সকলেই এক ব্যবসায়ী, সকলেরই সুখ ও দুঃখ এক। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কি আছে? আছে পদ্য, কাব্য, নাটক, নবেল, রচনা, জীবনচরিত, কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে আমরা এত দিন কি করিয়া আসিয়াছি, তাহার একটা বিবরণ চাই। সেই সংক্ষেপ বিবরণ পাইলে, তাহার কোথায় কি ভাল আছে ও কোথায় কি মন্দ আছে, তাহা দেখিতে পাইব, দেখিতে পাইলে মন্দটি ছাড়িয়া ভালটি লইতে পারিব এবং ভালকে আরও ভাল করিতে পারিব।

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকের বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যে সকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদ্‌লাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়। এই-রূপে গোবিন্দচন্দ্রের গীত ও মাণিকচন্দ্রের গীত এত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্য্যের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই

নাই। সে কালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। সুতরাং উহার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সেকালে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ গতি ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল হইয়া-গেলেও উহাও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে লেখা। তখন লোকে কিরূপে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিস বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভালবাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আর্বিভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রামরসায়ন" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়"পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কীরূপ

অদ্ভুত কারিকুবি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? ও পথটা যেন লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু-চারটা গান লিখিয়া চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না? আমাদের সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত। বাঙ্গলায় যত বই বাহির হয়, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষায় হয় না। এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। বাঙ্গলার যত বই অন্য ভাষায় তর্জ্জমা হয়, এত ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় হয় না। ইহাও আমাদের আনন্দের বিষয়। রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙ্গলা ভাষার

জয় জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে? ঝোঁক যদি চুট্‌কীর উপর হয়, ক্রমে চুট্‌কীও যে খারাপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কী আরম্ভ হইয়াছিল; কেন না, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী—এই সব ত চুট্‌কী-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমার ভয় হয় পাছে বাঙ্গলার কাব্যটা চুট্‌কীতেই অবসান হইয়া যায়।

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথিগণ একে একে অস্তগত হইয়াছেন; যাঁহারা আছেন, তাহারাও প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি ঐ ব্যাপার—লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না। বই পড়িলেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইয়া নাম লইবার চেষ্টা। একজন প্রাচীন নাটককার বলিলেন, "আমি দশ বৎসর ধরিয়া 'রত্নাবলী'খানিকে বাঙ্গলা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক মনের মত হইয়া উঠিতেছে না।" কিন্তু আবার দেখিতেছি অনেকে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া নাটক থিয়েটারে জোগান দিতেছেন। এক একবার মনে হয় যেন, কিছুদিন নাটক লেখা বন্ধ করিলে ভাল হয়।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলের ইতিহাসও বেশী প্রাচীন নয়। কিন্তু এখানেও ঐ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব তত দিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এ রকম ত চুট্‌কীতে হয় না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গলীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি, জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু-চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল

জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া, অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ, মানুষ থাকিলেই তাঁহার সম্বন্ধে 'সুবিধা'। 'কুবিধা' দুই থাকে। যাহারা সুবিধা তাহারা শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, যাহারা কুবিধা তাহারা শতমুখে নিন্দা করিবে—দোষ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবার বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আর এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরও দুইখানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেববাবু এ বিষয়ে দু-চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবু নবেলের দোষ-গুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষ-গুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মস্ত অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার ভার একা দীনেশবাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই দেশের ভাল কাজ করিতে পারেন। কিন্তু নির্ভয়ে দোষ গুণ দুইই দেখাইয়া দেওয়া দরকার। বঙ্কিমবাবু "বঙ্গদর্শনে" একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পর সে চেষ্টা আর দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে যে সব দোষ-গুণ-পরীক্ষা হয়, সেটা

যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত। "ওগো অমুক এই বই লিখিয়াছেন, তোমরা কেন।"—এই যেন সে বিচারের মানে। অনেক মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বলেন, "আমাদের পড়িবার সময় নাই। গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থের দোষগুণ দেখাইয়া দিলে আমরা ছাপাইতে পারি।" এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এরূপ দোষগুণ-বিচার আমরা চাহি না। আসামী জজ হইয়া বিচার করিবে, এটা বোধ হয় কেহই চাহিবেন না?

বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম দেখাইয়া দিলাম। কোথায় কি গুণ আছে, কোথায় কি অভাব আছে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কোন্ মন্দ জিনিস ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাল জিনিস আরও ভাল করিতে হইবে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কথা আছে—সেটা বাঙ্গলা ভাষার গতি।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাতকর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের

গতি একরূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলির তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" দুই একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত' মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত' লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটেনা, ছি!- ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত"। আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল", তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে। যথা ঃ

"শিঙ্গিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।"

"সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরা নিজ অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি।"

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি সমসাময়িকগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।"

"দেশের লোকের চিন্তা তাহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল।"

"দেখিলাম গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে।"

"হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।"

আর অধিক তুলিয়া ভিজা কম্বল ভারি করিব না। মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে? নহিলে বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে. তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া স্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্স্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকান্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ কবিয়া একটু সর্টন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন?

দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সব কথা ভদ্রলোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে। "গালগল্প" লিখিতে আপত্তি কি ? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয় "স্বকপোলকল্পিত" বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে? সুতরাং এই সকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন—অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? পোকায় ত কাটিবে?" বাস্তবিকই বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গলা বই পোকাতেই কাটে?

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী

শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। "রেলওয়েকে" "লৌহবর্ত্ম" করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাস্তাকে "রাজমার্গ" ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে "বংশপরিচালনা" লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে "শ্বশ্রূ মহাশয়" লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়া গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আর বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে

প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাদুঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলার আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন "পর্য্যবেক্ষণিকা"। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না,—তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর", মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী,উড়িয়া ও হিন্দী খুজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা", "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলো দাঁতভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত ; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ., সি. আই. ই.
সভাপতি, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বাঙ্গালা সাহিত্য

শ্রী নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অভাব—বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালা বই, মাসিক পত্রাদি অনেক আছে—নিত্যই বাড়িতেছে—বাঙ্গালা যেন শতমুখী হইয়া সাগর-প্রমাণ উন্নতির দিকে ছুটিতেছে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখ--লেখা অনেক আসিতেছে, কিন্তু লেখার মত লেখা বড়ই কম। ভাষার বিশুদ্ধি নাই—স্বচ্ছতা নাই; মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে যে রাশি রাশি লেখা বাহির হইতেছে, দেশের লোক প্রায়ই তাহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম—সহজে বুঝিতে পারে না বলিয়া বুঝিতে চাহে না। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সংস্কৃত ইংরাজি পড়িবে, কেহ বা উর্দ্দু পারসি পড়িবে—সে সব ভাষায় লিখিত বইগুলি যেন বেশি সুবোধ্য, বেশি সরস বলিয়া মনে করে। তবে বাঙ্গালা উপন্যাস কতক চলে। কিন্তু জড় ও চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য ও অবিভেদ দেখাইয়া দেয়, বুঝাইয়া দেয় এরূপ উপন্যাসের সংখ্যা বাঙ্গালায় অল্প বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা উপন্যাসের চলন বেশি নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালা উপন্যাসেরই তৃতীয় সংস্করণ দেখা যায় না।

বাঙ্গালার এই অবস্থার কারণ খুঁজিতে গেলে আগে বাঙ্গালার স্বরূপ নির্ণয় ও বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে হয়। এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য সদস্যগণের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়—এই প্রার্থনা।

সংস্কৃত, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত. হিন্দি, দেশি চলিত কথা, পারসি, আরবি, ইংরাজি, পর্টুগিজ প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে গৃহীত শব্দে পুষ্টকলেবর হইলেও মূলে বাঙ্গালা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা,তাহার ব্যাকরণাদি যে স্বতন্ত্র, তাহা এখন প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। অনেকে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের সন্তান--প্রাকৃতবিশেষ বলেন। তাহা স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা সংস্কৃতের ছাঁচে গঠিত নয়। মাগধী ও পালির সহিত বাঙ্গালার গঠন-সাদৃশ্য বরং অধিক। তবে বাঙ্গালার অধিকাংশ শব্দ যে সংস্কৃতমূলক তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই সকল সংস্কৃত শব্দ কতক অবিকৃত কতক বিকৃতভাবে আসিয়া বাঙ্গালার গঠন ও অবয়ব-বর্দ্ধনে সহায় হইয়াছে।

বাঙ্গালার আদি শিক্ষকগণ বাঙ্গালাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত বলিয়া মনে করিতেন না। সেই কারণে তাঁহাদের রচনা পড়িবামাত্র বুঝা যায়। তাহাতেই আজিও এই জ্ঞানালোকদীপ্ত বাঙ্গালী-সমাজে প্রাচীন গ্রন্থাবলির পাঠক অধিক।

তবে প্রাচীনেরা সংস্কৃত পদ্য পাঠে বিভোর ছিলেন। তাহাতেই বাঙ্গালার ধাতুগত পয়ারেই তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ লেখকেরাও গ্রন্থাদি রচনায় পয়ারেরই আশ্রয় লইতেন। পাঠান আমলে বৈষ্ণব সাহিত্যের

অভ্যুদয় হয়; তাহাতে সেই পয়ার, আর তাহার নন্দী ভৃঙ্গী ত্রিপদী চৌপদী। এইরূপ ছন্দোবন্ধে লিখিবার কারণ পয়ার পড়িতে সোজা আর মিষ্ট; সহজে মুখস্থ হয়; আর রচনাও সহজ।

বাল্যাবস্থায় বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থাদির অভাবে সেই সময়ে লিখিত দলিলাদি দ্বারা এবং সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গে যে সকল বাঙ্গালা টিপ্পনি ও ব্যাখ্যা আছে, এবং যে সব কথকতার পুথি আছে, তাহার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্যাবস্থা—কথাটি হয় ত একটু আপত্তিজনক। কারণ শচী অর্থাৎ দেবশক্তির যেমন চিরযৌবন, জীবিত সাহিত্য এবং বিজ্ঞানেরও সেইরূপ চিরবাল্য। আজি আমরা যে জীবিত সাহিত্য বা যে বিজ্ঞানের ভরা যৌবন মনে করিতেছি, দুতিন শত বৎসর পরে তখনকার লোকে সেই ভরা যৌবনকে বাল্যাবস্থা বলিয়া মনে করিবে। আবার জগতে যে জাতি যত বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী, তাহাদের ভাষা, তাহাদের সাধারণ উন্নতির বাল্যাবস্থা ততই অধিক। কারণ তাহাদের উত্তরাধিকার করিবার সম্পত্তি অনেক। আবার হীনতর জাতিসমূহের উত্তরাধিকার করিবার জিনিস কম বলিয়া তাহাদের ভাষা অল্পকাল মধ্যে অকালপক্ক হইয়া উঠে। বাঙ্গালি বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী জাতি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সংস্কৃতভাষার অক্ষয় ভাণ্ডার আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতের ব্যাকরণ আবার কল্পতরু—জগতে ওরূপ কল্পতরু আর নাই। আমাদের উত্তরাধিকার করিবার যোগ্য সম্পত্তি অনেক। অক্ষয় ভাণ্ডারের যে সমস্ত পদার্থ আমরা সহজে পরিপাক করিতে পারিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিয়াছি। এখনও পরিপাকযোগ্য পদার্থগুলি গ্রহণ করিব। তবে সে গ্রহণ ও পরিপাক কালসাপেক্ষ। কাজেই আমাদের শিক্ষানবিশিব সময় খুব লম্বা, সুতরাং আমাদের সাহিত্যের, আমাদের ভাষার এখনও বাল্যাবস্থা। তবে এই বাল্যাবস্থার আরম্ভকালকেই এখানে বাল্যাবস্থা বলিতেছি।

এই বাল্যাবস্থার যে সময়ের কিছু কিছু লেখা এখনও পাওয়া যায়, সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কথকেরা দেশের লোককে শিক্ষা দিতেন। ভদ্রলোকেরা সেই ভাষার অনুকরণ করিতেন। অন্যেরা মনোযোগ পূর্ব্বক সেই শাস্ত্রীয় উপদেশ ও ব্যাখ্যান শুনিত; আপনাদের মধ্যে সে ভাষা ব্যবহার না করিলেও বেশ বুঝিত। এই পণ্ডিতি ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহাতে একটা সুন্দর বাক্যরীতি ও অর্থগৌরব ছিল; অল্প কথায় ভাবব্যক্তি হইত।

যে সকল লোক রাজদরবারে কাজ করিতেন বা অন্য কোনরূপে সংসৃষ্ট থাকিতেন, যাহারা নবাব বা রাজকর্ম্মচারীদিগের সংস্রবে আসিতেন, এখনকার ন্যায় সে সময়েও সুবিধার জন্য তাঁহারা রাজভাষা অর্থাৎ রাজদপ্তর ও আদালতে ব্যবহৃত ভাষা শিখিতেন। এইরূপে দেশের মান্যগণ্য কর্ম্মী লোকেরা উর্দ্দু পারসি পড়িতেন। সে সময়

ঐ ভাষার শিক্ষা যেমন দরকারি ছিল, তেমনি মানেরও ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শেখার মত সে সময়ে উর্দ্দু পারসি হিন্দি শেখা চলন হইয়া গিয়াছিল। কথায় কথায় সাধারণেও উর্দ্দু পারসি হিন্দি শিখিত এবং আপনারাও ব্যবহার করিত। এই নবাবি ভাষা দেশে বেশ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে আলিপুরে একজন ব্রাহ্মণ উকীল আমার জন্য একখানি আরজির মুসবিদা করেন। তাঁহার লেখার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ পারসি কথা। উকীল মহাশয় বেশ ইংরাজি জানিলেও কথায় কথায় আপনার পারসি বিদ্যার গৌরব করিতেন। নবাবী আমলের এই ভাষাকে এখানে 'দরবারি' ভাষা বলিব।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া দেশের অন্য লোকে যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাতে সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক কথা অনেক থাকিলেও প্রাকৃত বাঙ্গালা কথাই তাহাতে বেশি থাকিত। এই ভাষাকে এখানে চলিত বাঙ্গালা বলিব। এই চলিত বাঙ্গালা প্রাকৃতিক নিয়মে স্থানভেদে নানা প্রকার প্রাকৃত বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে।

পণ্ডিতি ভাষা।—বঙ্গদেশ ন্যায়শাস্ত্রের জন্য সমগ্র ভারতে, শুধু ভারতে কেন—সমস্ত পৃথিবীতে অতুল সম্মান পাইয়াছিল। বঙ্গের প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামে অনেক ন্যায়ের টোল ছিল। অনেক পণ্ডিত, অনেক ছাত্র সেখানে ঐ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। বিষয়ী লোকে ঐ সকল পণ্ডিত ও ছাত্রের খুব খাতির করিতেন। শাস্ত্রীদিগের কথাবার্ত্তায় ন্যায়শাস্ত্রের অনেক কথা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বিষয়ী লোকে ঐরূপ কথা বেশ বুঝিতেন—ক্রমে নিজেরাও ব্যবহার আরম্ভ করেন। অনেকগুলি কথা বাঙ্গালার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল। এইরূপে নিমিত্তকারণ, নিমিত্তের ভাগী, ব্যভিচার (ইহাতে ঐ নিয়মের ব্যভিচার ঘটিল) অবান্তর শব্দ (আনুষঙ্গিক), অন্বয়, ব্যতিরেক (তাহা থাকিলে থাকা না থাকিলে না থাকা) সহচর (একত্র বাহুল্য ব্যভিচার নিয়মভঙ্গ) কাকতালীয় ন্যায়, উপন্যাস (প্রস্তাব), অবচ্ছেদাবচ্ছেদ (সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে, সমগ্র), অনুগম (একরূপে নির্দ্দেশ), ব্যাপ্তি (নিয়ত সম্বন্ধ যথা বুদ্ধে ঈশ্বরত্বের ব্যাপ্তি ছিল, তাই তিনি অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইলেও হিন্দু তাঁহার মত গ্রহণ করিল না) ব্যাপ্তিগ্রহ (নিয়ত সম্বন্ধ জ্ঞান), কার্য্যকারণভাব, সাজাত্য, বৈজাত্য, সমানাধিকরণ (একস্থানাবস্থান), অন্ধপঙ্গুন্যায়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, ভাবিত (এখন অনুপ্রাণিত কথাটি ইহার আংশিক অর্থ বুঝায়) অঙ্গাঙ্গিভাব, এতাবদ্বয় প্রভৃতি অনেক কথা শিক্ষিত সমাজে, এমন কি অনেক কথা সমাজের নিম্নস্তরেও চলিত। পণ্ডিত সাহচর্য্যে এইরূপ নিয়মবিধি, অপূর্ব্ববিধি, পরিসংখ্যা, পর্য্যুদস্ত, ব্যবর্ত্তক, ভাব, ভাবার্থ, ভাবাভাস, ভাবানুগ, অনুভাব, বিভাব, অবলম্বন, উদ্দীপন, সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি অন্য শাস্ত্রীয় কথাও চলিয়া যায়। এ সকল কথা যেরূপ অর্থের ব্যঞ্জক—তাহা দু এক কথায় বলা যায় না। সুতরাং কথাগুলি ক্রমে অচল হইয়া গেলে বাঙ্গালার ক্ষতি। ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের

বিশেষত্ব, বঙ্গের ধর্ম্মপুস্তক চণ্ডীও সেইরূপ। ঘরে ঘরে তখন চণ্ডীপাঠ হইত। মেয়েরা পর্য্যন্ত চণ্ডীর মাহাত্ম্য, চণ্ডীর দার্শনিক ভাব, চণ্ডীর আধ্যাত্মিকতা, চণ্ডীর বৈজ্ঞানিক ভাব বুঝিত—তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিত। তাহার ফলে রক্তবীজের ঝাড়, রক্তবীজের বংশ, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, গোলে মালে চণ্ডীপাঠ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ বলে, নমো নমো করে, দুর্গোৎসবের ব্যাপার প্রভৃতি অনেক কথা, অনেক বাক্য নানা অর্থে বুঝাইতে বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠা হয়; এখনও বেশ চলিতেছে।

বাঙ্গালীর পরম আদরের জিনিষ রামায়ণ। রামায়ণের আদর্শে বাঙ্গালী আপনার সংসার পাতিয়াছে। তাহার আলোচনার ফলে কত শব্দ কত বাক্য নানা অর্থ বুঝাইতে বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। রাম না হ'তে রামায়ণ, রামরাজ্য, রাবণের চুলা, সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতা কার মা, লঙ্কাপোড়া, রামের মত স্বামী, সূর্পনখা, রাক্ষসী মায়া, সোণার লঙ্কা, স্বর্ণপুরী ছারখার, গন্ধমাদন, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভকর্ণের ঘুম, বানরের গলায় হার, লঙ্কার আমে হাড়ে টক, মৃত্যুবাণ, লক্ষ্মণ, দেবর লক্ষ্মণ, তর্পণ, লঙ্কাকাণ্ড, লঙ্কাদাহ, ইন্দ্রজিতের অস্ত্র, ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট, মুখপোড়া, বালির পিণ্ড, কালনিমে মামা, বিভীষণ, হনুমান, কুঁজি, তাড়কারাক্ষসী, অগ্নিপরীক্ষা, ধনুকভাঙ্গা পণ প্রভৃতি এখনও বাঙ্গালি সমাজে খুব চলিতেছে।

রঘুনন্দনের স্মৃতিও বাঙ্গালীর একটা বিশেষত্ব। বাঙ্গালী হিন্দু স্মৃতি-শাস্ত্রমত নানা প্রকার ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন—পণ্ডিত সঙ্গ করিতেন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা শুনিতেন—তাহাতে যোগ দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা আয়ত্ত করিয়া আপনাদের ভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে নিত্য, কাম্য, আচমণি, প্রশস্ত, অপ্রশস্ত, পারণ, বৃষোৎসর্গের ব্যাপার, নির্জ্জলা, পঞ্চগ্রাসি করা, পঞ্চ দেবতার পূজা, কুচানৈবেদ্যের দেবতা, আবরণ দেবতা, একাদশী, অপূর্ব্ব দুরদৃষ্ট (পাপ) উর্জ্জং বহন্তী, পিণ্ডদান, পিণ্ড চট্‌কান, গয়াং গচ্ছ করা, সংকল্প নিষ্পত্তি, উত্তরসাধক, জলাঞ্জলি দেওয়া, বিজয়া বিসর্জ্জনের বাজনা, বিসর্জ্জনের পালা, মহাভারত, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, কুরুক্ষেত্র (করবো) ন স্যাৎ করা, আত্মপুরুষ (শুখায়ে গেল) প্রাণ প্রতিষ্ঠা, প্রাণ উড়ে গেল, দেবখাত, অখাত, প্রতিষ্ঠা (স্থাপন, সমাপন, ধর্ম্ম, পুণ্য যশ) পুরোহিত প্রভৃতি কত শব্দ বাঙ্গালভাষায় লব্ধপ্রবেশ হইয়া নানা অর্থ বুঝাইত, এখনও বুঝাইতেছে। এই সকল শব্দের ও বাক্যের অর্থগৌরব যথেষ্ট,—প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধের ভয়ে দেখাইতে পারিলাম না।

আমরা সমাজের লোকের সহিত মিশি না, যদি কখন মিশি—শিক্ষকভাবে, প্রধানভাবে; ছাত্রভাবে মিশিতে আত্মলাঘব বোধ করি। এইরূপ শব্দ ও বাক্যের দিকে লক্ষ্য করি না বলিয়া ভাষার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। ফলে অনেক সময় এরূপ কথা ব্যবহার করি—যাহা বাঙ্গালার রীতিসঙ্গত নহে—যাহা কখনই আমাদের হইবে না।

মোটের উপর যাহা আমাদের নিজস্ব, যাহাতে আমাদের বিশেষত্ব, আমাদের গৌরব, তাহা ছাড়িয়া আমরা জাতীয় জীবন অন্য দিকে ছুটাইবার চেষ্টায় আছি। অন্য বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলেও ভাষাসম্বন্ধে বোধ হয় সম্ভব নয়। তাই এখন লেখক ও পাঠকের মধ্যে আকাশ-পাতাল দূর দাঁড়াইয়াছে।

পণ্ডিতি ভাষার কথা তুলিয়া অনেক বাজে কথা বলিলাম। এখন প্রাচীন দরবারি ভাষার কথা বলিব। এই ভাষার বিশেষ্য পদের অর্দ্ধেকেরও অধিক উর্দ্দু পারসি হিন্দি। নবাবি আমলের অন্তর্দ্ধানের সহিত এই অসঙ্গত প্রাধান্য লোপ পাইয়াছে। তবে অনেক কথা বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। মুন্সী, মৌলবী, মোল্লা, নাজির, হাকিম, দারোগা, দেওয়ান, নবাব, বাদশা, বেগম, পীর, সাহেব, দপ্তর, ইজারা, রাজি. রাজিনামা, নসিব, দস্তুর, উকীল, মোক্তার, আদালত, দাখিলা. খাজনা, মেজাজ, আন্দাজ, হজম, বদ, বদহজম, মুনসেফ, সদর আলা, দিলদরিয়া, চশমখোর, নিমরাজি, বদমাইস, নারাজ, নাচার, বেচারা, হাজির, হাজিরা, অবোধ, মাল, বমাল, বকলম, জমিদার, থানাদার, তালুকদার, বাজাদার, চিড়িয়াখানা, দাওয়াইখানা, দপ্তরখানা, বালাখানা, আইনবাজ, মামলাবাজ, মোকদ্দমাবাজ, হাজি, গাজি প্রভৃতি বহুসংখ্যক কথা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল শব্দ এখনও চলিতেছে এবং চলিবে। তবে পারসি উর্দ্দু হিন্দি ক্রিয়াপদ বাঙ্গালায় বড় স্থান পায় নাই।

চলিত ভাষায় সংস্কৃত-শব্দ, সংস্কৃত মূলক প্রাকৃত শব্দ ছাড়া অসংস্কৃত-মূলক কথা অনেক। ক্রিয়াপদ অনেক অনেক স্থলে সংস্কৃতমূলক হইলেও বাঙ্গালার নিজ সম্পত্তি। যেমন ভূত্বা সংস্কৃত; হুবিত্ত—প্রাকৃত; হইয়া—বাঙ্গালা। এই ভাষায় উল্লিখিতরূপ অনেক উর্দ্দু পারসি হিন্দি কথা প্রকৃত বাঙ্গালা কথার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সহর, মহাল, জমা (খাজনা) খস্‌ড়া. মুসবিদা, আমানত, জমিদার, কারখানা, মুদিখানা, ছাপাখানা, পাহারাওয়ালা, দোয়াত প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালা কথা বলিয়াই সকলে মনে করে। আরবি কথা কাগজ কলম বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন কথকেরা এই চালতভাষা ও পণ্ডিতি ভাষার মিশ্রণে কথকতা চালাইতেন। কথকতার পুথিগুলিই তাহার প্রমাণ। শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও ভদ্রাভদ্র সকল সমাজেই এই ভাষা চলিত; এখনও পল্লীঅঞ্চলে এই ভাষা কতক চলিতেছে।

এই চলিতভাষা দেশের সর্বত্র একরূপ নয়। উচ্চারণ-প্রভেদ ছাড়িয়া দিলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এই ভাষার এত পার্থক্য দেখা যায় যে, আপাত দৃষ্টিতে এক এক স্থানের ভাষাকে এক একটি প্রাকৃতিক বাঙ্গালা বা বাঙ্গালার প্রাকৃতিক বলিয়াই মনে হয়। এ সমস্তই কিন্তু বাঙ্গালা—আমাদের নিজস্ব ভাষা—নিজের সম্পত্তি।

ক্রমে ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের সহিত অনেক ইংরাজি কথা চলিত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। স্কুল, কলেজ, মাষ্টার, পেন, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, জজ, লাট প্রভৃতি

একেবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। বিদ্যার প্রসার বৃদ্ধিও নানা কারণে আরও অনেক ইংরাজি কথা বাঙ্গালায় গ্রহণ অনিবার্য্য।

এখন গদ্য সাহিত্য ইতিহাসের শেষটুকু বলিয়া লই। ইংরাজ-অধিকার দৃঢ়মূল হইলেই খৃষ্টান মিশনারিগণ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালায় বাইবেল শিখাইতে বসিলেন। শ্রীরামপুরে ছাপাখানা বসিল। বাঙ্গালী খৃষ্টানের লেখা মথি লিখিত সুসমাচার, লুক লিখিত সুসমাচার বঙ্গে ঘোষিত হইল। ক্রমে কতকগুলি দুপাতা, চারিপাতার খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তিকা, একখানি ব্যাকরণ ও একখানি অভিধান বাহির হইল। ইহাতে সংস্কৃত কথা বেশী থাকিলেও প্রায় ইংরাজি রীতিতেই লিখিত হইয়াছিল। ইহার পর প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলি, প্রবোচন্দ্রিকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের আর্বিভাব হয়। এই সব বই বড় সুপাঠ্য ছিল না; এই জন্য বেশী দিন চলে নাই। পুরুষ-পরীক্ষাও ঐ শ্রেণীর পুস্তক। এই বইগুলি এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাদের স্থান হারাইয়াছে।

ইহার পর প্রধান গদ্য-লেখক রাজা রামমোহন রায় ও সংবাদ ভাস্করের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। তাহার পর প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। ইঁহারা অনেকগুলি বাঙ্গালা বই লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের লেখকগণ কতকটা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাবে ভাবিত ছিলেন। তাঁহাদের লেখাতেও সেই ভাব দেখা যায়। ঈশ্বরগুপ্তের লেখা অনেকটা খাঁটি বাঙ্গালা। টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোমের লেখাও এই শ্রেণীর। তবে তাঁহাদের লেখা সাময়িক আদর পাইলেও পূর্ণমাত্রায় সাহিত্য-গৌরব পায় নাই।

তাহার পর সংস্কৃত কলেজের মহারথী ছাত্রগণ ও ডাক্তার কৃষ্ণ বন্দ্যো প্রভৃতি পাদরীবৃন্দ আসরে নামিলেন। কৃষ্ণ বন্দ্যোর লেখায় সংস্কৃত শব্দ খুব বেশি না থাকিলেও, তাহা খাঁটি বাঙ্গালা নয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর ও তাঁহার সহচর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মা শক্তিশালী লেখকগণ যতদূর সম্ভব চলিত ভাষা ছাড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালাই সাহিত্যে মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য; সেই ধারণাবশে তাঁহারা এরূপ বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন যে, অনুস্বার বা বিসর্গ বসাইয়া লইলে এবং ক্রিয়াপদগুলি একটু বদ্‌লাইয়া দিলে অতি সুন্দর সংস্কৃত হয়। তাঁহাদের বাঙ্গালা বড় মিষ্ট, গালভরা, মুখপোরা বাঙ্গালা। কিন্তু দেশের লোক কেহই ঐ ভাষায় কথা বলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল ও মহাভারতের ভাষা সুন্দর—তাঁহার অন্য বইগুলির অপেক্ষা সরল এবং বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত।

এই পণ্ডিতেরা প্রায়ই সংস্কৃত ইংরেজি বই অনুবাদ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তও এই সময়ে বিবিধ ইংরাজি পুস্তক অবলম্বনে অনেকগুলি বই লেখেন। তাঁহার বাঙ্গালাও প্রায়ই বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা—তবে তত সুমিষ্ট নয়।

এই অনুবাদযুগে অনেকে অনেক বই লেখেন। ইঁহারা বাঙ্গালায় চলিত ক্রিয়াপদগুলিকে সাহিত্য-মর্য্যাদা দিয়া গ্রন্থে স্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। হওয়া বা করা ভিন্ন অন্য বাঙ্গালা ক্রিয়াপদগুলি প্রায়ই আমল পাইত না। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর ভাববিশেষ লইয়া হওয়া ও করা ধাতুর সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ সৃষ্ট হইয়া এই সকল গ্রন্থে স্থান পাইত। বঙ্কিমবাবু সে প্রথা ছাড়িয়া দেন। তাঁহার লেখায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও চলিত বাঙ্গালা ক্রিয়াপদগুলি স্থান পাইল; প্রকৃত বাঙ্গালার আদর দেখা দিল। কারণ ক্রিয়াপদ ও বিভক্তিই ভাষার বিশেষত্ব। গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি অবধি বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাবে এরূপ ভাবিত ছিলেন যে, দেশের চলিত ভাষার আলোচনা অনুসন্ধান এবং একটু ছাট্ কাট্ পালিশ দিয়া সেই ভাষাকেই কাজে লাগান আবশ্যক মনে করিতেন না,—চলিত ভাষার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্যই ছিল না। অনেকের দেশের লোকের সহিত মিশামিশিও ছিল না; দেশীয় পণ্ডিতদিগের যাঁহারা কোন খবর রাখিতেন, তাঁহারাও পণ্ডিতি বাঙ্গালাকে সুনয়নে দেখিতেন না। দরবারি বাঙ্গালা তাঁহাদের চক্ষে গণ্যই ছিল না। আর দেশে চলিত প্রাকৃতগুলি তাঁহাদের চক্ষে বড়ই হীন ছিল। মোটামুটি বলিতে গেলে দেশে চলিত তিনরূপ ভাষার কোনটিই তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

এখনকার লেখকেরা প্রায়ই ইংরেজিওয়ালা—ইংরাজিভাবে ভরপুর। ইঁহারা প্রায়ই সংস্কৃতদ্বেষী—কারণ সংস্কৃত ভাল জানেন না, ইঁহারা ইংরাজিতে চিন্তা করেন। চিন্তার ফল বাঙ্গালায় লিখিতে হইবে—অথচ প্রাচীন তিন রকম ভাষা মিশিয়া এখন যে আকারে দেশে চলে—তাহার সহিত ভাল পরিচয় নাই। সুতরাং হয় সংস্কৃত কল্পতরুর আশ্রয় লও—না হয় বাঙ্গালা বর্ণে ইংরাজি চালাও। কল্পতরুর আশ্রয় কিন্তু ব্যাকরণ-সংস্কার না থাকিলে মিলে না। কিন্তু তাহা কোথায়? যে সাধনায় সে সংস্কার মিলে, সে সাধনা ত নাই—করা হয় নাই—করিবার সময়ও নাই, কাজেই অদ্ভুত রকমের নূতন নূতন অবোধ্য, অনেকস্থলে অশুদ্ধ শব্দ বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে স্থান পাইতেছে।

এত হইল শব্দের কথা। নূতন সৃষ্ট শব্দের পর বেষ্টনী-মধ্যে ইংরাজি কথাটি আদত বসাইয়া দিলে অর্থবোধ হইবে। তাহাও একরূপ চলে। কিন্তু ইঁহাদের রচনার রীতিই যে বাঙ্গালা নয়। ইঁহারা যে রীতিতে বাঙ্গালা লিখেন, তাহার সহিত বাঙ্গালার রীতির দূর সম্বন্ধও নাই। সে রীতি বরং ইংরাজির—সে ধাঁচই ইংরাজির। এরূপ বাঙ্গালা দেশের লোকে বুঝিবে কিরূপে? যাঁহারা ইংরেজি ভাল জানেন—তাঁহারা মনে করিতে পারেন—বাঙ্গালা অক্ষরে—বাঙ্গালা কথায়—ইংরাজি পড়িতেছি। শব্দগুলির অর্থগ্রহ হইলে তাঁহারা বরং বাক্যের অর্থ করিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু যাঁহারা ইংরেজি রচনানীতি জানেন না—তাঁহাদের উপায় কি ?

এখন বিজ্ঞানচর্চ্চা দিন দিন বাড়িতেছে। জ্ঞানের বিশেষতঃ জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত চিন্তার প্রসার নূতন দিকে ধাইতেছে। চিন্তালব্ধ পদার্থসমূহ শব্দে প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালী নব্য-বিজ্ঞানের নূতন ছাত্র। দেশের প্রাচীন বিজ্ঞান বাঙ্গালী অনেক দিন ছাড়িয়াছে। প্রাচীন বিজ্ঞানের ভাষা এখন তাহার কাছে চীনে ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সব শব্দ বাঙ্গালী এখন পুনরধিগত করিতে প্রস্তুত নয়। আর প্রাচীন সাহিত্য বর্ত্তমান সকল অভাব পুরাইতে পারিবে না। তাই একেবারে খাঁটি ইংরাজি চালাইব বা তাহার কোন প্রকার বাঙ্গালা প্রতিনিধি লইব—এই একটি সমস্যা উপস্থিত। বিজ্ঞানের ন্যায় অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ নূতন বা আপাত-নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন নূতন কথার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে।

এ সম্বন্ধে সংস্কৃত-বাগীশদিগের কথা এই যে, লোকের বংশগত গুণ-দোষ যেমন একবারে লোপ পায় না—স্বভাব যেমন বাহিরের পালিষ সত্ত্বেও মৃদ্ধি বর্ত্ততে—আমাদের বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ স্বভাব যাবে ম'লে। বাঙ্গালা যদি কখন একবার মরে—তবেই ইহার এই সংস্কৃত-মূলক ভাষার—সংস্কৃতমূলকত্ব ঘুচিবে। আর কেনই বা বাঙ্গালা ভাষা অকারণে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া দিবে? তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজত্ব যাহার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়, সে পৈতৃকরাজ্য লইয়া কি করিবে—আর লইলেই বা কয়দিন রাখিবে? তবে এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যাহা পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহা গ্রহণ সঙ্গত।

কতকগুলি লেখক চলিত ভাষায় লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সংকল্প প্রশংসনীয়—তবে নিষ্পত্তি বেশ শক্ত। শিক্ষার অভাবে দেশের ভাষা আয়ত্ত নয়—আয়ত্ত করিবার চেষ্টাও নাই। সে বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা যেন স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দেশের ভাষায় লিখিতে গেলে আগে ত যত্নে সে ভাষার শব্দ ও বাক্যযোজনার রীতি শিখিয়া তাহাতে ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। সে ভাষার কথায় অভাব না পূরিলে তখন ভিন্ন ভাষার কথা গ্রহণীয়। সে সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকাই ভাল। অনেক স্থলে অবোধ্য বা অশুদ্ধ সংস্কৃত কথা অপেক্ষা সুপাঠ্য বিদেশি কথা লওয়া ভাল।

প্রাচীন বঙ্গদর্শনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন লেখায় অবোধ্য শব্দ ব্যবহারের অনেকগুলি উদাহরণ দেখাইয়াছেন। ইংরাজিনবিশের লেখা হইতে ঐরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেখান যায়। একজন লেখক ইংরাজি-সিলেবলকে 'একত্র উচ্চারিত বর্ণসমষ্টি'—আর জন সিলেবলই বলিয়াছেন। অথচ আজকাল গীতার প্রাদুর্ভাবে অনেকেই জানেন—'ওমং' একাক্ষর—অর্থাৎ এক সিলবল। হিন্দু মাত্রেই জানেন 'দুর্গা' দুই অক্ষর 'কৃষ্ণ' দুই অক্ষর—অর্থাৎ দুই সিলেবল। সংস্কৃতে এক শব্দের

বিভিন্ন অর্থ হয়। অক্ষর শব্দেও "এক" ও'সিলবল' দুই অর্থই বুঝায়। অথচ ইহা লেখকদিগের প্রণিধানে আসিল না। অবচ্ছেদাবচ্ছেদ, অন্বয় ব্যতিরেক, ব্যাপ্তি প্রভৃতি কথাগুলি এখনও দেশে কতক চলিতেছে—গ্রন্থকারেরা তাহা জানেন না; সুতরাং এই সব অর্থ বুঝাইতে এক এক রাশি কথা ব্যবহার করিতেছেন। তবু কিন্তু ঠিক অর্থ বুঝায় না। উত্তর সাধন, উত্তর সাধক আমাদের চলিত কথা; তাহা ছাড়িয়া কেহ প্রস্তাব দ্বিতীয় করেন, কেহ অনুমোদন, কেহ সমর্থন করেন। সমদুঃখসুখতা ও মায়া বিভিন্ন স্থলে ইংরাজি সিম্পাথির অর্থ প্রকাশ করে। যে স্থলে যে কথাটি খাটিবে লেখক তাহার নির্ণয় করিবেন। এ সব কথা ছাড়িয়া কোথা হইতে সহানুভূতি আসিয়া জুটিয়াছে। দেশের লোকে কি ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবে? অন্ধবিশ্বাস অন্ধভক্তি শুনিয়া লোকে অন্ধে বিশ্বাস, অন্ধে ভক্তি এইরূপ অর্থই বুঝিবে। ইংরাজিনবিশ লেখকেরা যেরূপ অর্থে ঐ দুই শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা বুঝাইয়া বলিলে লোকে কেহ কেবল হাসে, কেহ হা করিয়া থাকে। বিশ্বাসের যে চক্ষু থাকে, তাহাতে আবার ছানি পড়ে, অবৈজ্ঞানিক গেঁয়ে বাঙ্গালী তাহা ধারণা করিতে পারে না। সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া গেল—এখানে সম্ভাবনার অর্থ—ভাবী উন্নতি—পণ্ডিতি ভাষায়—'পরিণতি', কিন্তু সম্ভাবনার ঐ অর্থ কি লোকে বুঝিবে, না লইবে? একজন স্বচ্ছ বাঙ্গালার পাণ্ডা সংস্কৃতদ্বেষীর লেখার নমুনা দেখুন—"কবি নবীনচন্দ্র যদি ঐরূপ প্রাদেশিক ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে তাহা অবকাশরঞ্জিনী বা কুরুক্ষেত্রে না হইয়াও অবকাশরঞ্জনের উপযোগী হইত এবং তাহা আয়ত্ত করিতে কুরুক্ষেত্রের মত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত এবং তাহা দেশের আবাল বৃদ্ধ নরনারী সহজে উপভোগ করিলেও বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট নিতান্ত দুর্গম ও প্রহেলিকাময় হইয়া থাকিত।" কেমন সংস্কৃতকথা বর্জ্জিত রচনা—কেমন স্বচ্ছ! এই প্রহেলিকার অর্থ কেমন সহজ। দুর্গম কথাটিতেই বা কত বাহাদুরি!

ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালা লেখক, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকদিগকে বিষ নয়নে দেখেন। বলুন দেখি তাঁহাদের লেখার অর্থবোধে কি কখন কষ্ট হয়? হয় না কেন? তাঁহারা বাঙ্গালা রীতিতে লিখিয়াছেন; ইংরাজিনবিশ বাঙ্গলা লেখক—বাঙ্গালা রীতি জানেন না; সুতরাং ইংরাজি রীতিতে লেখেন। ফলে পড়িয়া অর্থ বুঝিতে লোকের ঘাম ছুটে।

আবার একদল লেখকের নবাবতার দেখা যায়;—ইঁহারা ভাষাকে ব্যাকরণ-সঙ্গত ও অভিধানাশ্রিত করিতে বড়ই নারাজ! অভিধানাশ্রিত কথার অর্থ বুঝিতে একটু কষ্ট আছে; কারণ অভিধানই ভাষার আশ্রিত—ভাষা কোথাও অভিধানের আশ্রিত নয়। তবে লেখকের অর্থ মোটামুটী যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বলুন দেখি—এরূপ সৃষ্টিছাড়া কথা কোথাও শুনিয়াছেন? অবশ্য ব্যাকরণ বা অভিধান দেখিয়া ভাষা হয় নাই; ভাষা

দেখিয়াই ব্যাকরণ ও অভিধান হইয়াছে। তবে সকল ভাষারই ব্যাকরণ ও অভিধান আছে। তবে ইংরাজি পড়িয়া তাঁহারা বাঙ্গলা নামধেয় ইংরেজি লেখেন—সেই ইংরাজিই গ্রামার বা শব্দশাস্ত্রের শাসনে শাসিত। ইংরাজের ন্যায় বাঙ্গলারও শব্দশাস্ত্র আছে—সেই শব্দশাস্ত্রের আবার লিখিত বা অলিখিত নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এই তিন বিভাগ আছে। তাহাতে নাম ও ক্রিয়ার ব্যুৎপত্তি, বাক্যমধ্যে প্রয়োগের প্রণালী এবং বাক্য যোজনা করিলে বলিবার ও লিখিবার রীতি শিখায়। ন্যায়শাস্ত্র যেমন তর্ক করিবার সূত্র শিখায় এবং তর্কের দোষ ধরিবার উপায় দেখাইয়া দেয়, শব্দশাস্ত্রও সেইরূপ শুদ্ধ শব্দ-প্রয়োগের উপায় এবং অশুদ্ধি অযুক্ত শব্দ প্রয়োগের দোষ বুঝাইয়া দেয়—আর বাক্যযোজনার রীতি শিখায়। ঐ রীতির উপরই ভাষার স্বচ্ছতা নির্ভর করে—কথায় বরং তত আসে যায় না। ইহা স্বীকার করি—ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া নির্ব্বোধ সুবোধ হয় না ; শব্দশাস্ত্রও পড়িয়া কুলেখক সুলেখক হয় না! সেটা শক্তিসাপেক্ষ। শক্তি স্বাভাবিক। তবে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া বুদ্ধিমান তার্কিক নির্ভুল যুক্তির অবতারণা করেন, সেইরূপ শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী শক্তিমান গ্রন্থকার নিখুঁত সুন্দর লেখেন।

আর বলিবেন—অভিধান! আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করি, সবই ত অভিধানে আছে। যে অর্থে ব্যবহার করি—তাহাও অভিধানে আছে। তবে অভিধানের হাত এড়াইব কিরূপে? মোট কথা শব্দশাস্ত্র পরিহার করিবার উপায় নাই; করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবে—লেখার অর্থসঙ্গতি হইবে না। ইহা স্বীকার্য্য যে শব্দশাস্ত্রের প্রাধান্য ঘটিলে সুত্রগুলি বেশী কড়াকড়ি হইলে লেখকের শক্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় না। তবে ঐ শাস্ত্রের সর্ব্বস্বীকৃত সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, বাক্যে শব্দ সমূহের অন্বয় বুঝা যাইবে না, ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইবে, পাঠক বিগড়াইবে, লোকে বাঙ্গালা ফেলিয়া সংস্কৃত, ইংরাজী উর্দ্দুর দিকে আকৃষ্ট হইবে। তবে শক্তিশালী লেখক প্রয়োজন মতে কোন স্থানে ক্বচিৎ শব্দশাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করেন—তাহাতে বড় কিছু যায় আসে না। যে প্রতি-প্রসবের স্থল মাত্র।

ইংরাজীনবিশ লেখকের বাঙ্গালা রীতির উপর কোন প্রকার বিতৃষ্ণা বা বিষদৃষ্টি আছে—ইহা বলি না; তাঁহারা যত্নে ইংরাজী পড়েন—ইংরাজীতে কথা কন; বাঙ্গালা ভাল করিয়া পড়েন না। অনেকে সকল সময়ে বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা চালান না। সেই কারণে বাঙ্গালা বাক্যরীতি তাঁহাদের আয়ত্ত নয়। ইংরাজী রীতি অভ্যস্ত—তাহাতেই বাঙ্গালা লিখিয়া ফেলেন।

সকল ভাষাই সংস্কৃত প্রাকৃত ভেদে দ্বিবিধ। শিক্ষিত লোকে, ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথা বলেন—তাহা সংস্কৃত। আর অশিক্ষিত লোকে ও স্ত্রীলোকে যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা প্রাকৃত। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরাও সংস্কৃত বলেন। বাঙ্গালা ভাষাও এইরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। সংস্কৃত ভাষা দেশের সর্ব্বত্রই একরূপ। প্রাকৃত

স্থানভেদে, কোন কোন স্থলে বা জাতিভেদে নানারূপ। মানভূম, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, গৌহাটি, ঢাকা, শ্রীহট্ট, মণিপুর ও চট্টগ্রামের সমস্ত শিক্ষিত লোক এখন যে ভাষায় কথা বলেন, তাহাই বাঙ্গালার সংস্কৃত। উচ্চারণগত ও শব্দগত কিছু প্রভেদ থাকিলেও এই ভাষা বঙ্গের সকল স্থানের শিক্ষিত লোকের নিকট পরস্পর সুবোধ্য।

প্রাচীন ভারতে যেমন দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পরের দুর্ব্বোধ্য নানা প্রকার প্রাকৃতের চলন ছিল, বঙ্গেও এখন সেইরূপ আছে। মানভূম ও চট্টগ্রামের প্রাকৃতও সেইরূপে ঐ দুই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর অবোধ্য। সকল স্থানেরই হিন্দু-মুসলমানের প্রাকৃতে যে একটু পার্থক্য আছে, তাহা জাতিগত। প্রাকৃত সমূহের মধ্যে এরূপ প্রভেদ চিরকালই থাকিবে, তবে ঐ সব প্রাকৃতের সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য হইবে না। প্রিয়দর্শিকাও সংস্কৃত ভাষায় নাটক বলিয়া গৃহীত হয় নাই। নাটকাদি ব্যতীত অন্য সাধারণ সংস্কৃত বাঙ্গালাগ্রন্থে বিনা প্রয়োজনে কোন স্থানীয় প্রাকৃতের স্থান থাকা উচিত নয়, থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালী জাতির সার্ব্বজনীন সাহিত্য হইবে না। তবে প্রয়োজন হইলে অন্য ভাষার নিকট ধার না করিয়া যতদূর সম্ভব নিজের ধন ব্যবহার করাই ভাল; কারণ ঐ সকল কথা অন্ততঃ কতকগুলি লোকের পক্ষে সুবোধ্য হইবে, অন্য সকলের পক্ষেও বৈদেশিক কথার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইবে না। যদি কোন স্থলে হয়, তখন ঐ প্রাকৃত কথা না লইয়া বিদেশী কথাই গ্রহণীয়।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, কুকি প্রভৃতি পাহাড়িরাও বঙ্গবাসী, তাহারাও বাঙ্গালী। তাহাদের শিক্ষিত লোকেরাও অনেকে সংস্কৃত বাঙ্গালা বলে। অক্সফোর্ড মিশনে এরূপ সাঁওতাল অনেক দেখিয়াছি। ঐরূপ গারো দেখিয়াছি—মৈমনসিংহ জেলায়; ঐরূপ খসিয়া অনেক দেখিয়াছি—শিলঙ্গে। এই জাতিগুলিকেও আমরা প্রাকৃত বাঙ্গালাভাষী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অত্যন্ত দুঃখের সহিত মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের সহিত বলিতেছি—আমাদের আলস্য ও উদাসীনতা, আর খৃষ্টান মিশনরিদিগের উদ্যোগে খাসিয়া সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি-সংস্কৃত বাঙ্গালার বদলে ইংরাজী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে! রোমান অক্ষরে আপনাদের প্রাকৃত ভাষা লিখিতেছে—আপনারা বাঙ্গালী ব্যতীত এক একটা ভিন্ন জাতি হইয়া যাইতেছে। মুসলমানদিগের বর্তমান বিতৃষ্ণা ও উর্দ্দু অনুরাগে বাঙ্গালার যে ক্ষতি, যে প্রসার হানি হইতেছে, এই পাহাড়িদিগকে সংস্কৃত বাঙ্গালা শিখাইলে—তাহাদের প্রাকৃত লিখনে বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রবেশ করাইলে—সেই ক্ষতিটুকু পুরিয়া যায়, এ একটা বড় কাজ। সাহিত্য-পরিষৎ এই কাজের ভার লইতে পারেন!

এখন উপসংহার করি। বঙ্গদেশের শিক্ষিত-সমাজে চলিত ভাষাই সংস্কৃত বাঙ্গালা। সেই ভাষাতেই এখন গ্রন্থাদি লিখিতে হইবে। বাঙ্গালারীতি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে

হইবে; কারণ তাহাই ভাষার জীবন—তাহাই ভাষার বিশেষত্ব। কথাগুলি ভাষার অবয়ব মাত্র। নূতন কথার প্রয়োজন হইলে আগে পূর্ব্ববর্ণিত তিন প্রকার পূর্ব্বপ্রচলিত বাঙ্গালায় ও প্রাদেশিক প্রাকৃতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় কিনা দেখিতে হইবে। তাহার পর দেখা উচিত—আমাদের প্রতিবেশীদিগের ভাষায়-উড়িয়া, আসামি ও হিন্দিতে আবশ্যক কথা আছে কিনা;—যদি থাকে তাহা সাধারণের গ্রহণযোগ্য কিনা? থাকিলেও, গ্রহণযোগ্য হইলে তাহা অবশ্য গ্রাহ্য। ইহাতেও অভাবপূরণ না হইলে সুবিধামত ইংরাজি বা প্রাচীন সংস্কৃত কথা গ্রহণীয়।

বাঙ্গালার ধাতুগত রীতি নির্ণয় এবং লেখকের অভ্যস্ত ইংরাজী রীতি ছাড়িয়া সেই বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করা একটু সাধনার কার্য্য; আর ঐরূপে শব্দ বাছাই করা অনেক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। অথচ আমাদের লেখকদিগের সেই সাধনা, সেই পরিশ্রম প্রবৃত্তি, সেই ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ই বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব মোচনের একমাত্র সাধন। এখন যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হয়—ধরিতে গেলে তাহা বাঙ্গালাই নয়। কাজেই বলিতে হয় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অভাব বাঙ্গালা ভাষা।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের অভাব ও তৎপ্রতীকার

শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এক কথায় বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গেলে, বলিতে হয় বঙ্গসাহিত্য কর্ণধার-বিহীন তরীর ন্যায়; সময়ের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য স্থির নাই, উদ্যমের লক্ষণ নাই, চালকগণ নিৰ্জ্জীবভাবে যন্ত্রচালিতের ন্যায়; কেবলই রীতিরক্ষার জন্য এক একবার ক্ষেপনী-নিক্ষেপ করিতেছেন। বঙ্গসাহিত্য আজ নেতাশূন্য; উহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইয়াছে; সাহিত্য-সমাজের উচ্চমর্য্যাদা অকুতোভয়ে লঙ্ঘিত হইতেছে। সাহিত্যের উন্নত গৌরবের ধুরন্ধর কেহই নাই। সাহিত্যরাজ্যের শাসনদণ্ড আজ নিদ্রিত, সাহিত্যানুশীলনের কর্ত্তব্য ও গাম্ভীর্য্য-বোধ অতি অল্প লেখকেরই আছে। সাহিত্য সাধনার বিষয় না হইয়া অনেকের কেবল প্রমোদের বিষয়ই হইয়াছে। ইহার অপরিহার্য্য ফল এই হইয়াছে যে, সাহিত্য শিথিল-গ্রন্থন ও চাপল্যযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভাষার ঝঙ্কার বাড়িয়াছে, অর্থের গৌরব বাড়ে নাই। শীর্ণ দেহ ঢাকিবার জন্য কেবল অলঙ্কারেরই প্রাচুর্য্য হইয়াছে।

সাহিত্যের বিভাগ বিশেষের প্রতি অত্যধিক প্রবণতা দ্বারা সাহিত্য একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। নিঃস্বার্থ সাহিত্যব্রতের দৃষ্টান্ত অতি বিরল হইয়াছে। সাহিত্য-সেবা লক্ষ্য না হইয়া উপলক্ষ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। হৃদয়বান্ লেখকের অভাবে যেমন হৃদয়গ্রাহী লেখা হইতেছে না, তেমনই গুণগ্রাহী পাঠক-সমাজও গঠিত হইতেছে না। ধনীলোকদিগের দ্বারা সাহিত্য-সেবীদিগের পরিপুষ্টি না হওয়াতে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিপক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে। সমবেত চেষ্টার অভাবে সাহিত্যের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য বিধান হইতে পারিতেছে না। এ হেন দীনা, ক্ষীণা, মলিনা, সাহিত্য-জননীর মুখ উজ্জ্বল কিরূপে হইতে পারে, তাহা বঙ্গসন্তানমাত্রেরই একান্ত চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। অগ্রে আমরা (১) রচনাপ্রণালী, (২) বিষয়-নির্ব্বাচন, (৩) ভাববিকাশ, (৪) রুচি, এই কয়ভাগে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া—পশ্চাৎ দোষের প্রতিকার, ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য ও উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

(১) রচনাপ্রণালী—বঙ্গ-সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আমরা মুখবন্ধেই বলিয়াছি। আধুনিক রচনাতে তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। রচনার স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় হইলেও যদৃচ্ছাচার অনুমোদনীয় নহে। বিশেষ বিশেষ নিয়মে বিশেষ বিশেষ ভাষার বিকাশ হইয়াছে। তাহার ব্যভিচার করিলে যে, ভাষার অস্বাভাবিক অবস্থা উৎপন্ন হইয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। অনেক লেখক ব্যাকরণের শাসন ও

শিষ্ট-প্রয়োগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। অনেক স্থলে ভাষা ইংরাজীগন্ধী হইতেছে। ইংরাজীর অনুকরণ বা অনুবাদ দোষনীয় নহে; কিন্তু বঙ্গভাষার প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে কি প্রকারে তাহা ভাষার পুষ্টিসাধন করিবে? এইরূপ কৃত্রিম ও বিদেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া বঙ্গভাষা স্বদেশীয়ের নিকট অপরিচিত বেশে উপস্থিত হইতেছে।

ভাষার আর একটা দোষের কথা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। কাহারও কাহারও মতে ভাষা কথিত আকারেই লিখিত হওয়া উচিত। টেকচাঁদ ঠাকুর, বনামে প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁহার "আলালের ঘরের দুলালে" এই মত প্রচলিত করিতে প্রথমে চেষ্টা পান— পরে "হুতোমপেঁচার নক্সাতে" কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার সহযোগিতা করেন; কিন্তু "গুপ্তকথা" ব্যতীত সাহিত্যের আর কোথাও ইহার আদর হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর রচনাপ্রণালী উদ্ভূত হইলে উহাকে সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের যবনিকা আশ্রয় করিতে হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনর্ব্বার ইহাকে আসরে অবতীর্ণ করেন। সেই হইতে সাহিত্যে ইহা দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে; কিন্তু রবীন্দ্রবাবু ইহাকে নূতন জীবনদান করিয়া নূতন বেশে উপস্থিত করিয়াছেন। নবসংস্কারে ইহাতে টেকচাঁদের প্রণালী বঙ্কিমবাবুর প্রণালীর নব সম্মিলন হইয়াছে। ঠাকুর পরিবারের হাতে ইহার কৃতকার্য্যতা মন্দ হয় নাই; কিন্তু আমাদের আশঙ্কা ইহাতে পাছে সাহিত্য গ্রাম্যতা-দুষ্ট হইয়া লঘুতাপ্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক সুন্দর রূপে সকলেরই প্রীতিকর, কিন্তু তাহাতেও অমার্জ্জিত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মার্জ্জিত সৌন্দর্য্য অধিক প্রীতিকর। ভাষারও সহজ সরলতা অপেক্ষা মার্জ্জিত কমনীয়তা অধিক প্রীতি-প্রদায়িনী। বিশেষতঃ মার্জ্জিত ভাষা মার্জ্জিত ভাবেরই প্রতিধ্বনি—সুতরাং মার্জ্জিত ভাষা দ্বারা সুশিক্ষারও সহায়তা হয়; সংস্কৃত সাহিত্যেও শিক্ষাভেদে নাটকীয় চরিত্রে প্রাকৃত ভাষা অরোপিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যেও নাটকের ও উপন্যাসের কথোপকথনে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

চপলতা বর্ত্তমান ভাষার অপর দোষ। পরিহাসপ্রিয়তা অনেক লেখকেরই স্বভাব হইয়াছে। বিষয়ের গুরু লঘু বিচার নাই—সুযোগ পাইলে উপহাস করিতে পারিলেই যেন ইঁহারা চরিতার্থ হন। ইহাতে আরও অমার্জ্জনীয় দোষ এই হইয়াছে যে, লেখক আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হইয়া সকলকেই ক্ষুদ্র ভাবিয়া অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রচনাকে সরস করিবার জন্যই বহুলপ্রচার হইয়াছে। ইহাতে রচনার গাম্ভীর্য্য ও সংযম ক্রমে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গদ্য রচনার কথা লিখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আমরা পদ্য রচনার কথা লিখিব। অধুনা রবীন্দ্রবাবুর কবিতাই কবিগণের আদর্শ। পূর্ব্বে কবিতা প্রকৃত-বিষয়িনী (Realistic) ছিল—রবীন্দ্রবাবুই প্রথমে ইহাকে কেবল ভাবময়ী (idealistic)

করেন। আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রবাবুর অনুকরণেই বহু কবিতা রচিত হইতেছে—কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর কল্পনা-সৌভাগ্য সকলের না থাকায় অনেক স্থলেই কেবল বাহ্য-গঠনই দৃষ্ট হয়, প্রকৃত ভাব মরীচিকার ন্যায় সম্পূর্ণ অনায়ত্ত থাকে।

(২) **বিষয় নির্ব্বাচন**—আধুনিক কালে উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মাসিক পত্রের কলেবর উপন্যাস গল্পেই প্রায় পূর্ণ হইয়া থাকে। মুদ্রিত পুস্তকের অর্দ্ধেকেরও অধিক কেবল উপন্যাস ও গল্প। সাহিত্যে যেন উপন্যাস ও গল্পের বাণ ডাকিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কেবল দুই একখানাতেই দৃষ্ট হয় না। সমাজের স্থায়ী আদর্শ অঙ্কনের প্রতিভা প্রায় কোন লেখকেরই দৃষ্ট হয় না।

আজকাল খণ্ড কবিতা লিখিবার এমনই একটা প্রবল ঝোঁক উপস্থিত হইয়াছে যে, রবিবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই কেবল—খণ্ড কবিতাতে আপনাদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিয়োগ করিতেছেন! ইহাতে তাঁহারা কেবল কবিতা সৃষ্টিই করিতেছেন; কিন্তু কাব্যসৃষ্টি কবিবার অবসর তাঁহাদের আর হইতেছে না। ভাবের সাধনা অভাবে তাঁহাদের কাব্যও আবছায়াময় হইতেছে। এই আবছায়াময় কবিতায় কোন আদর্শ চিত্রন নাই, ছায়াবাজীর ন্যায় কেবলই কৌতুক-প্রদর্শন। সুতরাং ইহাতে যেমন কোন ব্যক্তিগত উপকার হইতেছে না—তেমনই জাতীয় কোন উপকার হইতেছে না। কাব্যে আদর্শ চিত্রনের জন্য যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিশাল সহৃদয়তা ও উচ্চ কল্পনার প্রয়োজন, তাহার অভাবে কবিতাপ্রবাহ যে সংকীর্ণ খাতগামী হইবে. তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বিষয় নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দর্শন ও বিজ্ঞান বঙ্গ সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। কেবল অনুবাদেই যাহা কিছু ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের কঙ্কাল মাত্র। মৌলিকতার সহিত যোগ না হইলে যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইবে না—তেমনই আমরা ইহাদিগকে বঙ্গসাহিত্যের নিজস্বও বলিতে পারিব না।

(৩) **ভাব বিকাশ**—আধুনিক সময়ে মৌলিকতার অভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। আন্তরিকতার অভাবে কোন ভাবেরই সমুচিত পরিণতি হইতে পারে না। পূর্ব্বের লেখকগণ স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনে ঐকান্তিক যত্নবান্ হইতেন; সুতরাং তাহাতে কৃতকার্য্যতাও তদনুরূপ হইত। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে বিষয়ের উৎকর্ষ অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠাই অধিক অভীপ্সিত। ইহার ফল বহু আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া। অনেকেই যথোচিত আয়োজন না করিয়াও কেবল নাম কিনিবার জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন—ইহাতে ভাবের অভাবে কেবল ভাষারই ধ্বনি হইয়া থাকে। কোন বিশেষ স্থায়ী ভাবকে সাহিত্যে সঞ্চারিত করাই পূর্ব্ব লেখকদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আধুনিক সময়ে ক্ষণিক আবেগেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে। কোন সমগ্র ভাবের অনুসরণ ও অনুশীলন কদাচিৎ লক্ষিত

হয়। সাহিত্যের যে একটা জাতীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহার বোধ অল্প লেখকেরই দেখা যায়। অনেকেই আত্মচারতার্থতাই সাহিত্য-চর্চ্চার প্রধান সফলতা মনে করেন; কিন্তু যে স্থলে পূর্ব্ব লেখকদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্বোধিত করিবার একাগ্র যত্ন লক্ষিত হয়—তৎ স্থলে আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে জাতীয় দোষের সমালোচনা ও বিদ্রূপই মাত্র দেখা যায়—আদর্শ গঠনের কোন উদ্যোগই দেখা যায় না। ইঁহারা ভাঙ্গিতেই ক্ষিপ্রহস্ত, কিন্তু গড়িতে উদাসীন।

(৪) **রুচি**—আধুনিক সময়ে রুচির অপকৃষ্টতা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়; কারণ গুরু বিষয় অপেক্ষা লঘু বিষয়েরই প্রতি অধিক অভিনিবেশ দেখা যায়। এই জন্যই রচনার পল্লবিততাই অধিক আদরণীয় হইয়াছে—গল্প ও বর্ণনারই আকর্ষণ বাড়িয়াছে।

সহৃদয়তার অভাব হওয়াতে দোষানুসন্ধান প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়াছে। ইহাতে আলোচনা অপেক্ষা সমালোচনাতেই অধিক প্রীতি দেখা যাইতেছে। আধুনিক বিদ্বেষ প্রসূত সমালোচনার ইহাই মূল।

(৫) **উপায় বিধান**—আমরা প্রথমেই বলিয়াছি বঙ্গ-সাহিত্যের এখন নেতা নাই— বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতেই বঙ্গ-সাহিত্য অনাথ হইয়াছে। তিনি রচনায় ও সমালোচনায় সাহিত্যের নিয়ন্তা ছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে উন্নত সাহিত্য-সমাজ গঠিত করিয়া তদ্দ্বারা বিপুল সাহিত্য-রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারীকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতেন না; সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধনকারীকেও তিনি উৎসাহ প্রদান করিতে ও আদর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বঙ্কিমবাবু একা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে দশ জনেও কেন তাহা পারিবেন না। আমরা দেখিতেছি, এই কয়েক বৎসরে মাসিক পত্রিকার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বাড়িয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, বিশেষ বিচারপূর্ব্বক প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিলে অন্ততঃ কয়েকখানি মাসিক পত্র সুপরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং প্রবন্ধ-গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম করা উচিত। পক্ষান্তরে প্রবন্ধ-লেখককে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দানে উৎসাহ প্রদান করাও কর্ত্তব্য। এই প্রকারে একটী মাসিক পত্রের বা সংবাদ পত্রেরও যদি উচ্চ গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে লিখিয়া কৃতিত্ব লাভের জন্য সকলেই লালায়িত হইবে। অথচ উক্তরূপ সম্ভ্রম অর্জ্জন দ্বারা পত্রিকার প্রচার ও আদরও যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

নিরপেক্ষ ও সহৃদয় সমালোচনা দ্বারাও সাহিত্য কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যের দর্শন, বিজ্ঞানের সমুচিত চর্চ্চা হইতেছে না। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা এখনও বঙ্গ-সাহিত্যের নিকট অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। বিশেষ প্রলোভন ব্যতীত এ সকল ব্যয় ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইবে না। তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তি স্থাপন একান্ত আবশ্যক। বাবু জয়গোপাল বসু মল্লিক বেদান্তের

চর্চ্চার জন্য যে বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন—তাহারই ফল স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন রূপ গ্রন্থাবলী বঙ্গ সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে। বঙ্গের ধনী সন্তানেরা মল্লিক মহোদয়ের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে তাঁহাদের অর্থের যেমন সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে, তেমনই বঙ্গ-সাহিত্যও কৃতার্থ হইতে পারে।

ভাওয়ালের ভূতপূর্ব্ব কুমার বাহাদুরের "সাহিত্য-সমালোচনী" সভার ন্যায় স্থানে স্থানে সভা স্থাপিত হইয়া যদি যোগ্য গ্রন্থকারদিগকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ ক্রয় দ্বারা বা পুরস্কার স্বরূপ দান দ্বারা উৎসাহিত করা হয়, তবে যোগ্য গ্রন্থকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে।

অবস্থা বিবেচনায় অভাবগ্রস্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বা লেখকদিগকে যদি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত ভাবে সাহিত্যানুশীলন পূর্ব্বক দেশের হিত সাধন করিতে পারেন।

এ স্থলে ত্রিপুরার মহারাজদিগের দ্বারা সাহিত্যসেবীদিগের পৃষ্ঠপোষকতার কথা কীর্ত্তন করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবিবর হেমচন্দ্রের শেষ বয়সের অভাবের সময় ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বৃত্তিই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এখনও মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তদীয় অক্ষয় কীর্ত্তি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক অমূল্য গ্রন্থ যে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বদান্যতার নিকটই চিরঋণী থাকিবেন।

এতৎ প্রসঙ্গে দুইটী দানকল্পতরুর কথা না বলিলে আমাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য হানি হইবে বলিয়া মনে করি। বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর ও কলিকাতার কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় আপনাদের বিপুল অর্থ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা—হিন্দুর পঞ্চম বেদ রূপ বেদব্যাসের মহাভারতের বিশুদ্ধ অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়াই মহাভারতের বঙ্গানুবাদ দ্বারা বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

সম্প্রতি কাশিমবাজারের দানব্রত মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বিরাট্—"সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ব্যাপারে যে রাজোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যে যেমন একটি বিশাল সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তেমনই তাঁহার নিজের অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভও সংস্থাপিত হইবে। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন উৎকৃষ্ট যোগ্য লেখকদিগকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিলে ইহাদের উপযোগিতা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। গ্রীক্ অলিম্পিক (Olympic) সম্মিলনে দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তানদিগকে গৌরব প্রদান করিবার যে

প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বতোমুখী গ্রীক্ প্রতিভার উন্মেষ ও তদ্দ্বারা গ্রীক্ দিগের পাশ্চাত্য সভ্যতার বরেণ্য গুরুপদ লাভের অন্যতম কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

দরিদ্র গ্রন্থকারদিগকে গ্রন্থ-প্রকাশে সাহায্য করিবার জন্য দেশে ধনী প্রকাশকের অভাব। ধনী প্রকাশকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরাজদিগের বিশিষ্ট প্রকাশকগণ বিচারপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করেন বলিয়া ইহাতে শিক্ষিত সমাজে যেমন তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে, তেমনই গ্রন্ধকারেরও প্রতিপত্তি হয়। এইরূপ গুণগ্রাহী প্রকাশকেরা নিজেরা যেমন সহজে লাভবান্ হ'ন তদ্রূপ গ্রন্থকারেরাও লাভবান্ হইয়া থাকেন।

দেশে বহুল পরিমাণে পাঠ-গোষ্ঠী প্রভৃতি স্থাপিত হইলেও গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা গ্রন্থকারদিগের আদর বাড়িতে পারে।

সমবেত চেষ্টার দ্বারা বিলাতী-গ্রন্থাবলীর ন্যায় সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ বিভাগে গ্রন্থাবলী প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ উপযুক্ত লেখক সকল নিযুক্ত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি ও প্রভূত বল বৃদ্ধি হইতে পারে এবং লোকদিগের মধ্যেও সহযোগিতার ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে।

এই সকল উপায়ে সাহিত্য সম্মান-জনক ও লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইলেই সাহিত্যের আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধিসম্ভাবিত হইবে। তখন সাহিত্য-সেবার জন্য স্বতঃই ঐকান্তিকতা উদ্বোধিত হইবে এবং এই ঐকান্তিকতা হইলে একপ্রাণতার উৎপত্তি হইয়া সাহিত্যে এক মহতী শক্তি জাগরিত করিবে। ইহারই বলে সাহিত্য এক মহৎ জাতীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

সাহিত্য-প্রচারের সুপথ

শ্রী যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি ঃ কিছুকাল পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের নাম বঙ্গদেশের বহির্দ্দেশে অতি অল্পই শ্রুত ছিল, এমন কি বাঙ্গালা দেশের মধ্যেও যাহার সহিত অতি অল্প বাঙ্গালীরই পরিচয় ছিল, এখন তাহা ক্রমোন্নতি সহকারে বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের যশস্বী বৈষ্ণব-কবিগণের নিকট যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অতীত পরিচয় পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র যে ভাষার স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে সুদৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক মনীষীবর্গের সহযোগে যে নব-গঠিত বঙ্গ-ভাষাকে সুসৌষ্ঠব সাহিত্যে পরিণতি প্রদান করিয়াছেন. সৌভাগ্যবলে আজ বঙ্গভাষা সাহিত্যের উচ্চাসনে গৌরবান্বিত পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা অবশ্য-পাঠ্য বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে---অতি সুদূর প্রদেশে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা এবং বিবিধ ভাষায় বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ হইতেছে; এমন কি বিশ্ব রাজ্যের সর্ব্ব স্থানে সমুন্নত দেশসমূহে বঙ্গ-সাহিত্য সানন্দে সমাদৃত হইতেছে; সর্ব্বোপরি কবীন্দ্র রবীন্দ্রের আজীবন কঠোর সাধনা-ফলে অজ্ঞাতনামা, দীনা বঙ্গ-সাহিত্য সাহিত্য-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসভাক্ষেত্রে মহা সম্মানসূচক গৌরব-মুকুট অর্জ্জন করিয়া সাহিত্য-রাজ্ঞী পদে অভিষিক্তা হইয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব-রবি প্রাচীদেশ অতিক্রম করিয়া জগতের শিরোপরি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া জগতকে উজ্জ্বল নবালোকে উদ্ভাষিত করিবে—ইহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যের এই গৌরবের দিনে তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও সুবিস্তারের সুব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং সাহিত্যসেবীমাত্রেরই সে বিষয়ে সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া সাধ্যমত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী ও যত্নবান হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

সাহিত্য-প্রচার ব্যবস্থা—পাঠাগার ঃ সাহিত্য-প্রচারের জন্য পাঠাগার (Library) একটী প্রকৃষ্ট পন্থা। পাঠাগারের সাহায্যে সাহিত্য সুন্দরভাবে বহুল বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। শুধু নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী স্থানে অথবা উচ্চ-শিক্ষিত জনকয়েকের মধ্যেই সাহিত্য-

চর্চা সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার সুপ্রতিষ্ঠা ও প্রচার সম্ভব নহে। যাহাতে দেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে তাহার বিস্তৃতি লাভ হয়, যাহাতে সাহিত্য-সেবায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই আকাঙক্ষা জন্মে, সেজন্য চেষ্টা না করিলে সাহিত্যের প্রকৃতপক্ষে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করাই হইল না। আমাদের দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই অল্পশিক্ষিত এবং পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকে; অতএব সাহিত্য-সেবা শুধু সুশোভন নগর মধ্যে অল্পসংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত করিতে হইবে। যাহাতে অল্পশিক্ষিত পল্লীবাসিগণও সাহিত্যানুশীলনের অবসর ও সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই মহদ্দেশ্য সাধনে পল্লী-পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করা দেশবাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় আমাদের দেশে অনেক স্থানেই সে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত হইয়াছে এবং চারিদিকেই জ্ঞানোন্নতি বিধানে যত্ন ও উদ্যম লক্ষিত হইতেছে।

পল্লী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ঃ কি উপায়ে সহজ অথচ সুন্দরভাবে প্রতি পল্লীগ্রামে, অন্ততঃ প্রত্যেক গণ্ডগ্রামে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, কি উপায়ে তাহার পরিচালনা ও উন্নতিবিধান করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক বা অনুপযোগী হইবে না। পল্লীগ্রামে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে যে সকল গ্রামেই এক সময়ে পল্লী-পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে, তাহা মনে হয় না, বোধ হয় সে প্রয়োজনও তত বেশী নহে। যেখানে সম্ভব সেখানেও যে অধিক সংখ্যক লোক শিক্ষানুরাগী হইয়া পাঠাগারের স্থাপনায় যত্নবান হইবে, সে আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। তবে যাঁহারা নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার মধুরতা উপভোগ করিয়াছেন, যাঁহারা সবিবেচনা ও সুবুদ্ধিবলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যে মহাত্মগণ, জ্ঞান-মহাধনে-বঞ্চিত প্রকৃত দরিদ্রগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—জ্ঞান দান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মহৎ উদ্দেশ্যের বিজয়-পতাকাতলে একত্র হইয়া সম্মিলিত বর্দ্ধিতবলে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। সম্মিলিত শক্তি এক স্বর্গীয় মহাশক্তি। এক উচ্চাশা হৃদয়ে রাখিয়া সকলে মিলিত হইলে এবং প্রত্যেকের সাধ্যমত সাহায্য, শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করিলে সংকল্পিত কর্ম্মের সফলতা অবশ্যম্ভাবী; ভগবান উদ্যোগী পুরুষগণের মহদ্দেশ্য সাধনে নিয়ত সহায়ক থাকেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ঃ প্রথমে গ্রামস্থ উদ্যোগী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন দ্বারা একটী 'কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি' গঠন করিয়া সভ্যগণের পরামর্শ ও সদ্বিবেচনা-প্রসূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পাঠাগারের গৃহ ঃ পাঠাগারের গৃহ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর এবং সকলের সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। পার্শ্বে সভা-সমিতির জন্য কিছু উন্মুক্ত স্থান থাকিলে ভাল হয়।

পাঠাগারের আসবাবপত্র ঃ পল্লীগ্রামে অধিকাংশ স্থলে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অব্যবহৃত সুবৃহৎ বহির্বাটী, বৈঠকখানা বা পূজার দালানে বিনা খরচে পাঠাগারের স্থান লাভ হইতে পারে। উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী নগরের সুপ্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীগুলির জাঁকজমকশালী আসবাবপত্র দেখিয়া দরিদ্র পল্লীগ্রামেও তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করা ক্ষতিকর ও অন্যায়। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, আলমারি, সেল্‌ফ, র‍্যাক, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি যতদূর সম্ভব গ্রামবাসিগণের নিকট হইতেই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। চেয়ার টেবিলের পরিবর্ত্তে মাদুরেও কর্ম্ম চলিতে পারে। তবে লাইব্রেরী গৃহে উত্তম উত্তম ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ (motto) এবং মহাত্মাগণের জীবনালেখ্য ও সুন্দর সুন্দর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক দৃশ্য সমন্বিত ছবি রাখা বিশেষ উপকারী।

পুস্তকই লাইব্রেরীর প্রধান উপকরণ—দেহস্বরূপ জীবের দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর যেমন সকল প্রকার উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করে, সেইরূপ লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা ও গুণাগুণের উপর লাইব্রেরীর উন্নতি নির্ভর করে। পুস্তকের সহিত লাইব্রেরীর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, সাধারণতঃ, পুস্তক সমষ্টিকেই লাইব্রেরী বলিয়া অভিহিত করা হয়। (Library is a collection of books)

পাঠাগারের পুস্তক-সংগ্রহ ঃ আজকাল প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহস্থের বাটীতেই যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তক সংগৃহীত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে সকল গৃহ হইতে গৃহ-লাইব্রেরীর সঞ্চিত পুস্তকগুলি সাধারণ লাইব্রেরীর জন্য সংগৃহীত ও একত্র করা কর্ত্তব্য, তাহাতে বিনা অর্থব্যয়ে প্রথমতঃ বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। লাইব্রেরীর বেশী ব্যয় না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু সেই সমস্ত পুস্তকেই লাইব্রেরীটি বেশ চলিতে পারে। অবশ্য ক্রমে লাইব্রেরীর অর্থের স্বাচ্ছল্য হইতে থাকিলে প্রয়োজনমত নূতন নূতন পুস্তকগুলি ক্রমে ক্রমে ক্রয় করা যাইতে পারে। সুবিধা হইলে পুরাতন পুস্তক ক্রয় করা ভাল, তাহাতে অল্প ব্যয়ে অধিক পুস্তক পাওয়া যাইতে পারে। বেশী গ্রাহক না হওয়া পর্য্যন্ত পুস্তক বাঁধাইয়া অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন নাই। পুস্তক-নির্ব্বাচনে যে সমস্ত পুস্তকে স্থানীয় লোকে আনন্দ ও উপকার পাইতে পারে, সেইরূপ পুস্তকেরই প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অল্পসংখ্যক সুনির্ব্বাচিত উত্তম পুস্তক, সহস্র অপ্রয়োজনীয় পুস্তকের সমষ্টি অপেক্ষা অধিক উপকারী, পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সদ্‌গ্রন্থাবলী ব্যতীত পাঠাগারে বহুসংখ্যক মাসিক সাহিত্য সাময়িক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র রাখা কর্ত্তব্য; ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহীভাবে উপকারী জ্ঞান এবং দেশের ও জগতের বর্ত্তমান সংবাদ পাওয়া যায়।

এগুলি সকল শ্রেণীর পাঠকদিগেরই সমানভাবে প্রয়োজনীয়, অথচ বিশেষ চিত্তাকর্ষকভাবে উপকার সাধন করে।

লাইব্রেরীর পাঠক : পাঠকই লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর পাঠকই যাহাতে নিজ নিজ প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী পুস্তক পাইতে পারে, সকলেই যাহাতে সমধিক অনুরাগ ও আনন্দ অনুভব করিয়া লাইব্রেরীতে যোগদান করে, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান : পাঠাগারগুলিকে যথার্থ দেশের পক্ষে উপকারী করিয়া তাহার সফলতা সাধন করিতে হইলে শুধু পুস্তক আদান প্রদান করিলেই চলিবে না, তাহার সহিত আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাঠ-গৃহ : যাহাতে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা পাঠাগার খোলা থাকে এবং পাঠ-গৃহে (reading room) সর্ব্বসাধারণে বিনা-ব্যয়ে সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাগুলি এবং সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পাঠ করিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাঠকের ব্যবহারের জন্য পাঠ-গৃহে বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপে লোকের পাঠে আনুরক্তি জন্মে এবং পাঠ-গৃহ হইতে পুস্তক পাঠে প্রবৃত্তি জন্মে।

নৈশ-বিদ্যালয় : নিরক্ষর শ্রমজীবীদিগকে অবকাশ সময়ে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য এবং যাহারা কিছু বর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য নৈশ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য, নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া সর্ব্ব বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত ও প্রভূত হিতসাধন করা যাইতে পারে। ইহাতে লোকশিক্ষা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন ত হয়ই, উপরন্তু লাইব্রেরীর পক্ষে একটী নূতন শ্রেণীর পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ও পরে এই নৈশ-বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইলে শ্রমজীবীদিগের দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া বিদ্যালয়ে আসিবার সুবিধা হয় এবং অবৈতনিক শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগের ও আফিসের কর্ম্মচারিগণের ইহাতে যোগদান করিবার সুবিধা হয়।

ছাত্র-সম্মিলনী : ছাত্রদিগের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য, শারীরিক ব্যায়ামের জন্য, বিবিধ-হিতকরী বিষয়ের তর্ক আলোচনার (debate) জন্য, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সহকার্য্যকারিতা (Co-operation) বৃদ্ধির জন্য "ছাত্র-সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা করাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনোরম, সদুপদেশপূর্ণ পুস্তকাদি পাঠ ও মধ্যে মধ্যে আনন্দবর্দ্ধক ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকিলে বালকেরা সহজেই আকৃষ্ট হইবে এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত পাঠাগারের পাঠক ও পোষাক হইয়া উঠিবে। তাহাদিগের দ্বারা লাইব্রেরীর পরিচালনা কার্য্যেরও অনেক সাহায্য হইতে পারিবে।

সাধারণ সভা ঃ মধ্যে মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া জনহিতকর বিষয়ে আলোচনা এবং সহজবোধ্য ভাষায় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহাতে নিরক্ষর ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সহজে প্রদান করা যাইতে পারে এবং লাইব্রেরীর উপকারিতা সকলের হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে। এখনও পুরাণ পাঠ ও কথকতা সম্বন্ধে দেশের লোকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে এবং বস্তুতই তদ্দ্বারা নীতিজ্ঞান ও ধৰ্ম্মভাবের সহজে উত্তমরূপে উন্মেষ হইয়া থাকে। লাইব্রেরী সম্পর্কে ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশবাসীর হৃদয় বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যাইতে পারে এবং সকলের লাইব্রেরীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা দেশেরও যে যথেষ্ট আভ্যন্তরিক উন্নতি ও সমাজের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা লাইব্রেরীর সহিত সকল লোকের ঘনিষ্ঠতা, উহার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়া লাইব্রেরীর উন্নতির পথ প্রসার করিয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত পল্লীভূমির নিস্তব্ধ পাঠাগারের মধ্যে জীবন-চাঞ্চল্য সঞ্চার করিয়া তাহাকে কৰ্ম্ম-কোলাহলে মুখরিত করিয়া রাখে।

পল্লী-পাঠাগার প্রসার ঃ এইরূপে অবৈতনিক পাঠগৃহ (free reading rooms), নৈশ-বিদ্যালয়, ছাত্র-সম্মিলনী, সাধারণ সভা-সমিতি দ্বারা নিজ গ্রামে পল্লীপাঠাগারের প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের দ্বারা সেই সেই গ্রামে এইরূপ লাইব্রেরী স্থাপনার চেষ্টা করা উচিত।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমালা (itinerant bookshelf) ঃ এইরূপে যখন নিকটবর্ত্তী গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপিত হইবে, তখন পরস্পরের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রমে লাইব্রেরীগুলি সংখ্যায় অধিক ও উন্নতিশালী হইলে প্রত্যেক লাইব্রেরীর একটী করিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমালা থাকিবে, যাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ব্যবহৃত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যাগত পুস্তকাবলীর স্থানে অপর নূতন পুস্তকসমূহ স্থাপিত হইয়া পূর্ব্বপ্রথানুরূপ বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। এইরূপে সকল লাইব্রেরীর পুস্তকের সুবিধা প্রত্যেক লাইব্রেরী পাইবে, বস্তুত সকল লাইব্রেরীর গ্রন্থসমষ্টির প্রত্যেক লাইব্রেরী ব্যবহার-স্বত্ব পাইবে এবং অল্প ব্যয়ে ও সহজভাবে বহু গ্রন্থের সদ্ব্যবহার বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে হইতে পারিবে।

সংযোগ ও পরিচালক সমিতি ঃ এইরূপ পরস্পর সংযুক্ত লাইব্রেরীগুলির (Associated Libraries) মধ্যে সদ্ভাব সংযোগ ও সাহচর্য রক্ষা করিয়া সুনিয়মে কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ঐ সমস্ত লাইব্রেরীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত একটী পরিচালক সমিতি থাকিবে। এই পরিচালক-সমিতির অধীনতায় সমস্ত সংযুক্ত

লাইব্রেরীর পাঠক ও সভ্যগণের মধ্যে বার্ষিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা বা বার্ষিক অধিবেশনে (anniversary meeting)

বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলন : সকলের একত্র মিলনের এবং সেই সময়ে একটী সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা দ্বারা সকলের যথেষ্ট উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এবং সকলের সম্মিলিত সাহায্যে একখানি মাসিক বা সাময়িক পত্রিকা পরিচালনার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাতে লেখক ও সভ্যগণের উৎসাহবৃদ্ধি এবং দেশের হিতসাধনের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীব একটী নূতন আয়ের পথ হইতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্যিক ও দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য : ইদানীং নানা স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপিত হইতেছে। এইরূপে প্রতি জেলায় পরিষদের শাখা স্থাপিত হইলে, জেলার শাখা পরিষদকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তদন্তর্ভুক্ত গ্রামে গ্রামে এইরূপ পল্লী পাঠাগার স্থাপিত হইতে পারিবে। এইরূপে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় লোক-শিক্ষার (mass education) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে আমাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার যেরূপ নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহির্গত হয়। স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই জ্ঞান দান দ্বারা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার সাধন করা এবং অজ্ঞানান্ধতা দূর করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই প্রকারে লোকশিক্ষা ও সাহিত্য-প্রচারের ব্যবস্থা করিলে অচিরে জ্ঞানলোক অপরিচিত, অজ্ঞাত পল্লী-কুটীরে প্রবেশলাভ করিলে তাহা উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে এবং শিক্ষাসমন্বিত, জ্ঞানোন্নত সন্তানগণ বিবিধ বিধানে বঙ্গ জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়া কৃতার্থ হইবে। এখন চাই দুর্দ্দশার উপলব্ধি, কর্ম্মে উৎসাহ, প্রতিবিধানে যত্ন, জাতীয় উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আর চাই. স্বার্থত্যাগী, দৃঢ়ব্রত পল্লীসেবক,—যাহাবা সকল দুঃখ-কষ্ট, বাধাবিঘ্ন অদম্যোৎসাহে সহাস্যবদনে অক্লেশে অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই স্বর্গীয়বলে বলীয়ান হইয়া, সঙ্কল্পিত ব্রতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিবে।

নিবেদন : মায়ের কৃতিসন্তানগণ, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ, আপনার সোৎসাহে কর্ত্তব্যজ্ঞানে লোকশিক্ষার পুণ্যবিধানে দৃঢ়ব্রত হউন, সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কবি আশ্বাষচ্ছলে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন!—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।"

মহর্ষিকুল গৌরব, মহাসাধক, কবীন্দ্র রবীন্দ্রের সত্য-ঘোষণা কি সফল না হইয়া থাকিতে পারে? আপনারা কি এ পুণ্যবাণীর সফলতা সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়া ধন্য হইতে যত্নবান হইবেন না? আপনাদিগের হৃদয় সান্দন লেখনী কর্ম্মশক্তির মসী সাহায্যে অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্ট ভবিষ্যতের প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে ইহার প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ করিবে। সেই উন্মুক্ত সত্য উত্তরের আশায় রহিলাম।

বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি ও অন্তরায়

শ্রী শশাঙ্কমোহন সেন

ভাষা কিংবা সাহিত্য-উন্নতির মূল কারণ প্রতিভা : প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক সাহিত্যোন্নতির মূল কারণ প্রতিভা। জাতির মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তির সংঘটনা ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তৃত্ব কিংবা করণের সাহায্যে যে সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে না, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই প্রতিভা স্বয়ং একটা অদৃষ্ট কারণ-জনিত সৌভাগ্য বই নয়। সুতরাং অদ্যকার সমালোচনায় আদিবন্ধেই একটা প্রবল সমস্যা আমাদের নেত্র সমক্ষে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় উত্থিত হইয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। যেহেতু, প্রতিভা কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত এবং অপরিচিত দেশে পরিচালন ব্যতীত যেমন সাহিত্যের, তেমন ভাষারও কোন উন্নতি সম্ভবপর নহে, সুতরাং আমাদিগকে আদিবন্ধেই নৈরাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয়তা এবং নিরুদ্ধমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিভার অপরিহার্য্য উপাদান সমূহ : কিন্তু এই প্রতীয়মান বাধার মধ্য দিয়াই পথ আছে, কারণ, কেবল প্রতিভা থাকিলেই যথেষ্ট হয় না; প্রতিভার আত্মনিষ্ঠা বা আপনাকে সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রযত্নে সফল করিয়া তোলার জন্য অদম্য উৎসাহ এবং অধ্যাত্ম-প্রেরণা চাই, উপযুক্ত ভাব এবং বস্তু উপার্জ্জনের জন্য প্রাণের জ্বালা চাই! স্বকীয় আদর্শের সাফল্যে উপনীত হইবার জন্য Infinite capacity of taking pains চাই! এই শেষোক্ত গুণটি সাহিত্যে এত অপরিহার্য্য যে, কোন কোন দার্শনিক (যেমন Emerson) উহাকেই প্রতিভার একমাত্র লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তদুপরি সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের জন্য যথোচিত ভাষা, আত্মসিদ্ধ style বা রীতিও অপরিহার্য্য! এই শেষোক্ত গুণ ব্যতীত—আত্মপ্রকাশের অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত—সাহিত্যে অনেক প্রতিভাই একেবারে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। তৎকল্পে মাতৃ-ভাষার অন্তরাত্মার সহিত ভাবের যোগ সাধনে অদম্য চেষ্টা, সর্ব্ব প্রযত্নে আত্মনিষ্ঠ হইয়া জগতের "অর্থ" সাধনা এবং একনিষ্ঠ ভাবে বাগ অর্থের 'প্রতিপত্তি সাধনা', এ সমস্ত ব্যতীত সাহিত্যে কোন প্রতিভা কখনও সফল হইতে পারে না।

এই শেষোক্ত কথাটিই আমাদিগকে অদ্যকার বিশেষ বক্তব্যের সমক্ষে উপনীত করিতেছে। বাগ্ অর্থের প্রতিপত্তি আমরা জানি, উহা ব্যতীত কোনও প্রতিভা সাহিত্য ক্ষেত্রে ফল ফলাইতে পারে না, কবি বা লেখক মাত্রেরই প্রধান উপকরণ তাঁহাদের হৃদয়ের প্রবল অকথিত আকাঙ্ক্ষা এই শব্দার্থের সম্মিলন বা জগত তত্ত্বের শিব শক্তির

সম্যক সম্মিলন। মহাকবি তাই রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই সকল সাহিত্য সাধকের—অন্তরাত্মার কথাটাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্য প্রতিভার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন ঃ কিন্তু "বাগ্ অর্থের প্রতিপত্তি"! উহা ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রত্যেককে উপার্জ্জন করিতে হয়। দেশের পূর্ব্বাপর সারস্বত-ক্ষেত্র হইতে শব্দশক্তি অর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। প্রতিভার বিকাশ হইতে স্বদেশ এবং স্ব-সমাজের তরফ হইতে এই বিদ্যা দান করা এবং প্রতিভার পক্ষে উহা গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। প্রতিভাবান ব্যক্তি স্বয়ং নিজের ভাষার শক্তি সামর্থ্যকেও স্বকীয় কার্য্যের ফলে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া যান সত্য,—নব নব শব্দশক্তির আবিষ্কার পূর্ব্বক নব নব অর্থের সঙ্গে উহার যোগ সাধনে স্বজাতির নেত্র সমক্ষে অভিনব প্রসঙ্গের প্রণালীও উদ্ভাবিত করিয়া যান; কিন্তু উহা সৃষ্টির ক্ষেত্র নহে; আবিষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্র; ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে ঐ আবিষ্ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা না থাকিলেই চলে না, সুতরাং এই ভাষার ক্ষেত্রেই সমাজের পক্ষে প্রতিভার সাহায্য করার কথা উৎপন্ন হইতেছে।

ভাষার পূর্ণাঙ্গতা ঃ অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রতিভা নামক অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা ব্যতীত যেমন সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব, তেমন সমাজের পক্ষেও সাহিত্যের ভাষাটিকে যথাসাধ্য উচ্চাঙ্গের প্রতিভার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে প্রতিভার জন্য প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হওয়াও নানাদিকে অসম্ভব। যেহেতু ভাষাকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে, সুপ্রস্তুত ভাবে প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সাহিত্য আত্মপ্রকাশের জন্য সর্ব্ব প্রধান অস্ত্রটিই লাভ করে, নচেৎ উহাকে ঐদিকে অযথা শক্তির ব্যয় পূর্ব্বক ক্লান্ত হইতে হয়; অনেক স্থলে নিষ্ফল হইতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বঙ্গে ভাষার শক্তিসাধক প্রতিভার অল্পতা ঃ এখন আমাদের দেশে বিশিষ্ট-পথসেবী প্রতিভা যে নাই তাহা নহে; কিন্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ভাষার প্রতিভা যে আর একটিও জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহা বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না। এ কয়েক জনের কার্য্য যে পর্য্যাপ্ত নহে, উহা বোধ হয় অন্ততঃ সাহিত্যসেবিগণের সমক্ষে দৃষ্টান্ত সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে না। আমরা সকলে ইহাদিগের উপার্জ্জিত ভাষাভাব এবং রীতির পথেই ন্যূনাধিক চলিতেছি! শত শত সিদ্ধ লেখনীর ক্রিয়াচেষ্টা ব্যতীত একটা ভাষার প্রকৃত সামর্থ্য কখনও প্রকটিত হইতে পারে না। অনেকে বঙ্গভাষা শিক্ষা না করিয়াই আসরে নামিয়াছি বলিয়া, আমাদের রচনার মধ্যে বঙ্গভাষার চিত্তটি যেমন বিকাশ লাভ করিতেছে না; তেমন আমাদের চিত্তও ভাষার অভ্যন্তরে কোনরূপ প্রতিভা দেখাইতে পারিতেছে না।

সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা ঃ বঙ্গ-সাহিত্যের বাক্যসম্পত্তির বৃদ্ধি এবং প্রকাশ রীতির প্রসার এবং ভাবের সাধনার সমতলে উন্নয়ন ব্যতীত কদাপি সম্ভবপর নহে, নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলেই দেখিব এক্ষেত্রেই সাহিত্য-সম্মিলনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য

আছে সেই কর্ত্তব্য কি? এবং আমরা কোন্ উপায়ে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি?

শব্দশক্তি বিষয়ে খাঁটি বাঙ্গালার অযোগ্যতা ঃ এইস্থানে একরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিব। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃত অভাব কি? উহা কি কেবল প্রতিভার অভাব? না প্রতিভার জন্য উপযুক্ত শব্দ উপকরণ এবং পরিবেশ ঘটনার অভাব? ইহার উত্তরে নিঃসঙ্কোচে বলিব আমাদের ভাষার প্রকৃত বাক্যশক্তি এখনও সুসিদ্ধ হয় নাই; আমাদের ভাষা মনুষ্য মনের সমস্ত ভাব এবং চিন্তা প্রকাশ করিবার জন্য ঋজু শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় অভাব এই যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত সাহিত্যের আদর্শ-জ্ঞান আদপেই নাই। এই দুইটি অভাবের মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ নিহিত রহিয়াছে।

গুরুর অভাব ঃ আমাদের ভাষাকে এখনও গদ্যে কিম্বা পদ্যে প্রতিভার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র রূপে পরিণত করিতে পারি নাই, অন্যদিকে স্থায়ী উচ্চ কিম্বা মহৎ সাহিত্য কি তদ্বিষয়ে আমরা প্রায় সকলেই অনুনেত্র হইয়া চলিতেছি। সরল ভাবে বলিতে হইলে কথাটি এই দাঁড়ায় যে—আমরা স্থায়ী সাহিত্য অর্জ্জন করিতে পারিতেছি না—উহার প্রধান কারণ স্থায়ী সাহিত্য কি, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি না এবং তজ্জন্যে অনেকের ভাষাজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের অনেকেরই যে, কোন না কোন দিকে বিশিষ্টতা উপার্জ্জনের ক্ষমতা আছে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতেছি। এমন লোক আছেন—ইচ্ছা করিলেই আমাদের সাহিত্যের অনেক অভাব দূর করিতে পারেন। কিন্তু প্রথমতঃ আমাদের দেশে সমালোচনা নাই; বিশ্ব-সাহিত্যের প্রকাণ্ডতায় জ্ঞানশীল এবং মহৎ বিষয়ে দীক্ষা দান করিবার উপযুক্ত বিচারক নাই। কথায় কার্য্যে সাহিত্যের সুপথ অপথ দেখাইয়া দিবার জন্য কেহ নাই। কার্য্যে দেখাইতে হইলে, প্রকৃত সফল ভাবে দেখাইতে হইলে, কেবল দুইটি মাত্র পথ আছে।

দৃষ্টান্তের অভাব ঃ প্রথমতঃ স্বয়ং উন্নত সাহিত্যের সৃজন, দ্বিতীয় ভিন্ন ভাষার বরেণ্য সাহিত্য-ফলকে দৃষ্টি সমক্ষে উপস্থাপন। আমরা—এই ক্ষেত্রে উচিত সহায়তার অভাবে অনেক দিকে পঙ্গু। ইংরাজীতে উন্নত সাহিত্য আছে এবং আমরা ইংরাজীতে উহার পরিচয় লাভ করিতেছি বলিলে কিছুমাত্র অজুহাত হয় না; ইংরাজীর মধ্য হইতে যে পর্য্যন্ত কোন সমর্থ ব্যক্তি উহাকে আমাদের মাতৃভাষার মধ্যে আনিয়া প্রত্যক্ষ না করাইবেন, সে পর্য্যন্ত মনোবিজ্ঞানের নিয়মবশে আমরা অন্ধ থাকিতেই বাধ্য। মনোবিজ্ঞানের একটা নির্দ্দয় নিয়ম এই যে, কোন অর্থকে মাতৃ-ভাষার মধ্যেও প্রাপ্তিই প্রকৃত প্রাপ্তি, সাহিত্যের Style বা শিল্পকলার মূর্ত্তিও (Technique) এমন পদার্থ যে, যে পর্য্যন্ত উহা মাতৃভাষার মধ্যে জাজ্বল্যমান না হয়, সে পর্য্যন্ত বিজাতীয় ভাষার অধ্যয়ন কিম্বা প্রভাব কিছুমাত্র ফল দেখে না। এই ক্ষেত্রে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের

ইতিহাসই উহার সাক্ষ্য দিবে। মনে করুন, গদ্য রচনা আধুনিক সাহিত্য সমূহের একটা নব জাগ্রত শক্তি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত রামমোহন রায় বা পরে পরে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের উদ্ভব হয় নাই, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরাজী সংসর্গ প্রাবল্য লাভ করার একশত বৎসরের মধ্যেও বাঙ্গালীর মন মহিমান্বিত ইংরাজী গদ্যকে বঙ্গভাষার ধারণা করিতে পারে নাই। কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা প্রবল শক্তি।

কিন্তু যে পর্য্যন্ত মধুসূদন দত্ত বঙ্গ-সাহিত্যে জন্মেন নাই, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেড় শত বৎসর বাঙ্গালীর মন মিল্‌টনের সঙ্গ-লাভ করিয়াও, বঙ্গভাষার রুদ্ধ দ্বারকে ঐ দিকে অবারিত করিতে পারে নাই। মধুসূদনের পর বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য যে শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার মূলের পরিচয় মধুসূদনের মধ্যে খুঁজিতে না জানিলে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির ইতিহাসের কিছুমাত্র পরিচয় পাইব না। সেইরূপে হেম, নবীন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নিঃসঙ্কোচে বলিতে হয় যে—এই সমস্ত কৃতি সন্তান অনুকরণ অনুবক্তৃতা অথবা স্বাধীনতার পথে আমাদের মাতৃভাষার শক্তি, ও ভাব অথবা রীতিতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি যে যে দিকে অবারিত করিয়া দিয়াছেন, আমরা সাধারণগণ কেবল সেই দিকেই দৃষ্টি ব্যবহার করিতে পারিতেছি বই নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য-উপার্জ্জনশীল অথবা শিল্প উপার্জ্জনশীল প্রতিভার বিষয়ে পরবর্ত্তীর ঋণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি বা অন্তরায় প্রভৃতি কিছুই প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারিব না।

বঙ্গভাষার অল্প কয়েক জন মাত্র লেখকের কার্য্যই বর্ত্তমানের সার সম্পদ : তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে ইয়োরোপের Revival of Learning-এর ন্যায় সংস্কৃত এবং ইংরাজী অনুকরণের একটা প্রবাহ যে আরম্ভ হয় নাই এমন নহে, তবে উহা সবিশেষ শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক কালে রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার ও কালীপ্রসন্নের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিকে বঙ্গভাষার আর্য্য-প্রকৃতির মধ্যে ধারণা করিবার জন্য একটা উচ্চ আদর্শ কার্য্য করিয়া গিয়াছে, অন্য দিকে টেকচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই ভাষার মধ্যে দেশীয় শব্দশক্তির জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তবে সংস্কৃত ক্ষেত্রে কেবল তথ্য এবং ঘটনার বিশেষ সাধনাতেই যে কিছু কার্য্য! প্রকৃত প্রতিভাবান সাধকের সংখ্যা অভাবে বঙ্গভাষার শক্তি যে কোন দিকে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই, তাহা আমরা ইংরাজী সাধারণ সাহিত্যের অর্থ এবং রীতিকে ধারণা করিতে বসিলেই বুঝিতে পারিতেছি। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন প্রভৃতি ফরাসীর সপ্ত-তারার ন্যায় উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়াই বঙ্গভূমির Lingua Rustica কে একদিকে আর্য্য-গৌরবে দীক্ষিত করিতে, অন্যদিকে পরিমার্জ্জনা পূর্ব্বক সাধুতার প্রতিষ্ঠা দান করিতেও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য এখনও পূর্ণাঙ্গ হইতে

পারে নাই। তবে বলিতে পারা যায় যে, বিদ্যাসাগর ও হেমচন্দ্র প্রভৃতির সমসূত্রে বঙ্গে সমুন্নত Classic প্রতিভার সংঘটনা না থাকিলেও বঙ্গ-সাহিত্য অন্যদিকে অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সমসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণের কার্য্য অনেক দিকে ফরাসী সপ্ত-তারার সমধর্ম্মী! কিন্তু বঁস্যার্দ্দে প্রভৃতি যে স্থলে ফরাসী ভাষার Classicism প্রচলিত করিতে চাহিয়া ছিলেন, ইঁহারা সে স্থলে প্রাদেশিকতাই প্রচলিত করিতে চাহিতেছেন। কলিকাতার কথিত ভাষাই বঙ্গভাষা, এবং উহাই বঙ্গ-সাহিত্যের পুঁথির ভাষা হওয়া উচিত; এই আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা চলিতেছেন। উহাতে একদিকে বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গোঁড়া সংস্কৃত আদর্শের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এবং নব নব প্রাকৃত শব্দসম্পৎ আয়ত্ত করিয়া যেমন উপকার করিতেছে, তেমন অন্যদিকেও গোঁড়ামী দেখাইয়া কেবল Lingua Rustica কেই বাঙ্গালী আর্য্যের ভাষা বলিয়া স্থির করিতে চাহিতেছে। এ ঘটনা বর্ত্তমানে অবশ্যম্ভাবী; তবে ভবিষ্যতে উহার সমস্ত অতিরিক্ততা কাটিয়া গিয়া বঙ্গভাষার পক্ষে লাভ উদ্ধৃত্ত করিতে পারিবে বলিয়াই আশা হয়।

উচ্চ আদর্শ ধারণার অভাব ঃ এ ত গেল কেবল বঙ্গভাষার যোগ্যতা বিষয়ক কথা! সাহিত্যের উচ্চ আদর্শের ধারণা সম্বন্ধেও আমরা প্রতিপদে দৈন্য প্রদর্শন করিতেছি। আমরা সাহিত্য রচনা করিতে বসিয়া নিজের অলসদৃষ্টি সমক্ষে কেবল যাহা অনায়াসে উপস্থিত হয়, তাহাই যেমন রচনা করি, সমালোচনা করিতে বসিয়াও কেবল নিজের ভাল লাগিল কি মন্দ লাগিল তাহাই প্রকাশ করিয়া বসি। সেইরূপ, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে কিংবা সমাজ দর্শন বা ইতিহাসের ক্ষেত্রেও আমরা কোনও রূপ তপস্যার বা তপঃ-ক্ষমতার পরিচয় দিতেই পারিতেছি না। এ সকল বিষয়ে আমাদের অনেকের আদর্শ, ধারণা এত সংকীর্ণ যে, আমরা কখন তুলনামূলক কিংবা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাগ্রত ভাবে মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা সমূহের অধ্যয়ন চেষ্টা যে একেবারেই করি নাই, আমাদের সাহিত্যের শতকরা নিরানব্বই জন ব্যক্তির সহিত আলাপেই এ ধারণা বদ্ধমূল হইবে! এই স্থানেই বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে নিদানের অন্তরায় এবং সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব। এত সঙ্কীর্ণতা, অশিক্ষা, এবং কুশিক্ষার মধ্যে সরস্বতীর অনুগ্রহ! সাহিত্যের উন্নতি! এ অবস্থায় কেবল ব্যক্তিগত আদর্শের নক্সা, গীতি কবিতা অথবা গল্প-কথা ব্যতিরিক্ত, Local colouring এবং স্থানীয় মাহাত্ম্য ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পথে যে জাতীয় সাহিত্য-আত্ম বিকাশ লাভ করিতে পারে না, উহা স্বতঃসিদ্ধ কথা বলিয়াই ধরিয়া লইবেন! যেহেতু, সাহিত্যের সৃষ্টি অথবা উপভোগের রহস্যও কেবল সহানুভূতি বা আত্মার সম্প্রসারণের উপরেই বিশেষ নির্ভর করে।

সুতরাং সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে বঙ্গ-ভাষার প্রকৃতিকে আয়ত্ত না করিলে যেমন চলিবে না, তেমন সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতিকে বিস্তারিত বিশ্ব-আদর্শের তুলনায় বুঝিতে না পারিলেও চলিবে না। সাহিত্যে আদর্শের শক্তি অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যে উন্নত আদর্শ প্রচলনের ফলবত্তা এই যে, উহা যেমন সাধকগণকে একদিকে সমুন্নত আদর্শের অনুসরণ করিতে অথবা উন্নতকে আরও উন্নততর ক্ষেত্রে অনুধাবন করিতে প্রণোদিত করে, তেমন নিষেধের দিক হইতেও উহা মিতাচার শিক্ষা দেয়; অযোগ্যগণকে নিবৃত্তি এবং নীরবতা শিক্ষা দেয়। বর্ত্তমান সাহিত্যে মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলনের গতিকে একটা প্রধান দুর্যোগ অযোগ্যগণের অযথা কোলাহল।

আমাদের কর্ত্তব্য ঃ আমাদের মধ্যে যখন উন্নত সাহিত্য-ঘটনার জন্য অথবা ভাষার শক্তিবর্দ্ধনের জন্য কোন স্বতঃসম্ভবী প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে না, তখন আমাদের মনকে উন্নত আদর্শের সম্মুখীন করা ব্যতীত উদ্ধার-পথে আর কি কার্য্য আছে? এ ক্ষেত্রে বিদেশীয় উচ্চ সাহিত্যের সম্মুখীন হইয়া উহার ভাবচর্য্যা ব্যতীত, উহা হইতে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায় আছে কি? আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

প্রত্যেক সভ্য-সাহিত্যের ইতিহাসেই এ দৃষ্টান্ত আছে যে, শক্তিশালী এমন কি মৌলিক প্রতিভাশালী লেখকগণও বিজাতীয় ভাষার ঐশ্বর্য্যকে মাতৃভাষার অঙ্কগত করিবার জন্য লেখনী নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। উহার ফলে তাঁহাদের নিজের শক্তি ও মাতৃভাষার শব্দপ্রবৃত্তি ও যোগ্যতা যুগপৎ প্রসারিত হইয়া সময় সময় অভাবনীয় মৌলিক পন্থায় জাতীয় হৃদয়কে পরিচালিত করিয়া গিয়াছে। বিদেশীর নিকট হইতে প্রাথমিক দীক্ষালাভ ব্যতীত, ঐরূপে নেত্র উন্মীলিত হওয়া ব্যতীত জাতিবিশেষ নিজের বিশিষ্ট অধিকার এবং স্বভাবসিদ্ধ শক্তির বিষয়ে পর্য্যন্ত আত্ম-জাগরণ লাভ করিতেও পারে নাই—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিবিশেষের মনও অনেক সময় এমন অন্ধতাগ্রস্ত হইয়া অবস্থান করে যে, যাহা তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজসিদ্ধ বা অন্তরঙ্গ পদার্থ, তাহার বিষয়েও হয় ত দীর্ঘকাল বিমূঢ় থাকিয়াই চলিয়া আসে; গুরুপরিচয়ের পূর্ব্বে তাহার মধ্যে ঐ শক্তিসংস্থানের রেখা-পরিচয়মাত্রও হয় ত প্রকট হইতে পারে না। অথচ যেই তাহার নেত্র খুলিয়া যায়, দেশময় যেন একটা নবজীবনের সাড়া পড়ে। শত শত হৃদয় জড়নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক দিকে দিকে অভাবনীয় ভাবে অভিযান করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাতক্ষেত্রে অধিকার-পতাকা বহন করিয়া লয়; বিশ্ব-দরবারে নিজের মাহাত্ম্যপরিখা দখল করিয়া বসে। সাহিত্যক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পদার্থই হইতেছে গুরু-পরিচয়। সাহিত্যে এরূপ গুরুদীক্ষা এবং জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবার পর শিষ্যকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দিগ্বিজয়ের দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগত কিম্বা জাতিগত হিসাবেও দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

অনুবাদ, উহার অর্থ ঃ জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কার নামক কথাটার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু অন্তর্লোকের আবিষ্কারগুলির মাহাত্ম্যও কোন অংশে কম নয়। মনুষ্য পূর্ব্বকাল হইতে সহস্র সহস্র বৎসর এই পাঞ্চভৌতিক সত্তায় জীবন-মরণের ক্রীড়া করিয়া গিয়াছে, জগত-ব্যাপারের জ্ঞান বিষয়ে পরস্পর সাহায্য করিতে এবং কৃত আবিষ্কারের ফলভোগ করিতে প্রাচীন মনুষ্য অনেক অস্বস্তি ভোগ করিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতার এবং বর্ত্তমানকালে জন্মগ্রহণ করার প্রধান সুফল সভ্যদেশ মাত্রেই সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবদীয় বিভাগেই মনুষ্যের পরস্পর ঋণসম্বন্ধ। এই ঋণসম্বন্ধ হইতেই উত্তরোত্তর ধীর-প্রবাহী উন্নতির স্রোতে চলিয়া বর্ত্তমান ইয়োরোপের সাহিত্যে ও বিজ্ঞান প্রভৃতি গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই ইয়োরোপকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-জাতি-ধাত্রী-রূপে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছে। ইংরাজি সংসর্গের সৌভাগ্যফলে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যও ইয়োরোপীয় সাহিত্য-সভ্যতার সমতল লাভ করিয়া কৌলিন্য অর্জ্জনের স্বত্ব লাভ করিয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্রে কি ভাবে অগ্রসর হইতে পারি ইহার একমাত্র সদুত্তর অনুবাদ। বিদেশী ভাষার ভাব এবং অর্থ-সমৃদ্ধিশালী জটীল নীতির গ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালায় আনয়ন। কেবল মর্ম্ম অনুবাদ নহে—যেমন বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের জন্য আমরা হ্যামলেট নাটকের যে অনুবাদ করিয়াছি; উহা অপেক্ষা অগৌরবের দৃষ্টান্ত আর কিছুই হইতে পারে না। পরকীয় অর্থকে তাহারই রীতি, গতি এবং শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্গভাষার প্রতিকৃত করিবার চেষ্টা। আমাদের ভাষার দৈন্য অথবা স্বকীয় শব্দার্থ-জ্ঞানের অভাব গতিকেই আমরা স্বাধীন-রচনার সময়ে অর্থের সমৃদ্ধি এবং গৌরব পরিহার করিয়া যাই, অর্ব্বাচীনের ন্যায় বাক্য-বিন্যাস করি। আমাদের মনকে জোর করিয়া ইংরাজী অর্থের সম্মুখীন করা ব্যতীত আমাদের রচনা ইংরাজি অর্থের ঘনতা, জটীলতা কিম্বা আভিজাত্যের সংসর্গী হইতে চাহিবে না। উন্নত সাহিত্য, দর্শন, সমালোচনা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির বাক্যের প্রকৃতি এবং অর্থের প্রতিকৃতি প্রাণপণে বঙ্গীয় বাক্যে ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা করিতে বসিলেই প্রতিশব্দ এবং প্রতিবাক্য খুঁজিতে গিয়া আমাদের চক্ষে মাতৃভাষার শক্তি-দৈন্য যেমন প্রকট হইতে থাকিবে, তেমনি উহার অপনোদনে কার্য্য আরম্ভ হইবে। বঙ্গভাষায় আর্য্য এবং প্রাদেশিক প্রকৃতি উভয়েই এই কার্য্যে আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিকাশ করিতে পারিবে। পুনর্ব্বার বলিব, এই সম্মিলনের পক্ষে সমবেত চেষ্টায় অথবা সম্মিলিত অর্থের সাহায্যে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা বিশিষ্ট সাহিত্যের প্রোক্ত মতে অনুবাদ ব্যতীত এবং ঐ অনুবাদকে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য্য করা ব্যতীত, অপর কোন মহত্তর কর্ত্তব্য নাই।

তিনটি গ্রন্থের অভাব পূরণ ঃ বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সম্মিলিত সাহায্যে তিনখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করা অপরিহার্য্য;—প্রথম বিশ্ব সাহিত্যের দর্শন—

অর্থাৎ মনুষ্যজাতির সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিভাবান লেখকগণকে অগ্রণী করিয়া কোন্ কোন্ বিশিষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; পরিশেষে এই বিংশ-শতাব্দীতে উপনীত হইয়া ধারাসম্মিলন করিয়াছে, বিশ্বের সাহিত্য-সভ্যতার সমতল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার যথাযথ ধারণামূলক সমালোচনা-গ্রন্থ। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগস্থ বিকাশের আদর্শ, গতি এবং পরিণতির বিচারক দর্শন-গ্রন্থ।

দ্বিতীয়—বিশ্বসভ্যতার দর্শন।—সভ্যতা নামক সংজ্ঞা শব্দটা কি এবং পূর্ব্বকাল হইতে বিভিন্ন মনুষ্য-সংঘের মধ্যে উহা কি ভাবে কোন্ কোন্ বিভাগে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে এবং পরিশেষে বর্ত্তমান কালে আসিয়া কি ভাবে সম্মিলিত মানব-সভ্যতার আদর্শ খাড়া করিয়া তুলিয়াছে; কোন্ জাতি, কোন্ সমাজ, কোন্ দিকে, কোন্ বিশেষ আবিষ্কারের উপস্থাপনে তাহার সাহায্য করিয়াছে এবং উহা ভবিষ্যতের কোন্ পরিণতির অভিমুখে চলিয়াছে তাহার যথাযথ দর্শনাত্মক গ্রন্থ। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রকারান্তরে মনুষ্য জাতি কর্ত্তৃক সমবেত মনুষ্যত্ব সাধনার ইতিবৃত্ত বই অন্য কিছুই নহে।

তৃতীয়—বিশ্বসমাজ দর্শন।—এই গ্রন্থ কোন কোন অংশে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের বিষয় অবলম্বন করিলেও উহার স্বাতন্ত্র্য, এবং আবশ্যকতা আমাদের বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্য-সমাজের অতীত এবং বর্ত্তমানের গতির প্রকৃত জ্ঞানাভাবে আমরা ভারতীয় সমাজের মনুষ্যগণ নানাদিকে একেবারে অন্ধের ন্যায় চলিতেই বাধ্য হইতেছি। এই ক্ষেত্রে প্রকৃতের জ্ঞান ব্যতীত আমাদের সাহিত্য, শিল্প, প্রভৃতি, এমন কি জীবনের কোন বিভাগের কোন চেষ্টাই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য সমাজ প্রাচীন কালের clan গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক আদর্শ হইতে কোন্ দেশ কি ভাবে বিকাশলাভ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কোন্ আদর্শে চালতেছে? মনুষ্যজাতির সাধারণ নিয়ম কি? জীবতত্ত্ব মানবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের উন্নত বিজ্ঞানবিদ্যার সাহায্যে এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক আমাদের নেত্রসমক্ষে উপস্থিত করা ব্যতীত আমাদের কোন কালেও স্বস্তি নাই।

বলা বাহুল্য উক্ত তিনখানি গ্রন্থই বিশেষভাবে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অভিব্যক্ত আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এবং উন্নত সাহিত্যের ভাষা, রীতি এবং আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই রচনা করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ভারতীয় সমাজ সভ্যতা এবং সাহিত্যের আদর্শকে প্রতিপদে এই বিশ্ব-আদর্শের পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা পূর্ব্বক আমাদের জাতীয় আদর্শের দোষগুণ উভয়ই উজ্জ্বল করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। ভারতীয় ধর্ম্মাধিকৃত সমাজাদর্শে উহার বর্ণাশ্রম-বন্ধনযুক্ত ধর্ম্মের আদর্শ—সাহিত্য, সমাজ, এবং সভ্যতার অভিব্যক্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিভাগে এই বিশ্ব-আদর্শে—ফল

ও বল, গুণ ও দোষ ইত্যাদি আলোচনা। বিশেষ ভাবে ভারতীয় Stand Point বা দৃষ্টিভূমি হইতে ইয়োরোপীয় সাহিত্য সমাজ এবং সভ্যতার আলোচনা। সুতরাং ইয়োরোপীয় বিভাগে উহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুবাদের এবং ভারতীয় বিভাগে বহু পরিমাণে স্বাধীন গবেষণার কার্য্যই হইবে। ইয়োরোপে বিশেষতঃ ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মাণ সাহিত্যে এই তিন বিভাগেই ন্যূনাধিক উন্নত ও বিখ্যাত গ্রন্থাদি রহিয়াছে। তবে ঐ সমস্ত ভারতীয় দৃষ্টিস্থান হইতে রচিত নহে। উহাদের দ্বারা ইউয়োরোপের সভ্যতা, সমাজ এবং সাহিত্যের আদর্শ কিম্বা গতির নির্দ্ধারণে ন্যূনাধিক সুবিধা হইবে। সুতরাং উহাদের প্রতিপাদ্যকে ভারতীয় নেত্রে দর্শন করিতে বসিলেই আমাদের নেত্রসমক্ষে অনেক অজ্ঞাত এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব সত্য এবং তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের আত্মজ্ঞান লাভে সবিশেষ সাহায্য করিবে। পুনরুক্তি করিয়াও বলিব, এরূপ তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত আমাদের কোনকালে কোন দিকে মঙ্গল নাই। ঐতিহাসিক প্রণালীতেই পূর্ব্বাপর বিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের ধারণা পূর্ব্বক আধুনিকতার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক সমাজ এবং আধুনিক সভ্যতার প্রকৃত অবস্থার পরিজ্ঞান—এই বিশ্ব-জ্ঞানই আমাদের পক্ষে আত্মজ্ঞান। উহা ব্যতীত কোন দিকে কোন কালে শ্রেয় নাই। "আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়া"।

বাঙ্গালা সাহিত্য
উহার অভাব ও তন্নিবারণের উপায়
শ্রী বিজয়লাল দত্ত

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন ঃ সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের প্রতিকৃতি বা চিত্রপট। উহা জাতীয় জীবনের আদর্শ; উহারই পূর্ণ বিকাশে জাতীয় জীবন পূর্ণ বিকশিত, সমুন্নত ও গৌরবান্বিত হয়। উহা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় জাতীয় উন্নতি, অবনতি, উত্থান, পতন, উৎসব ও বিষাদ সুস্পষ্টরূপে জনসাধারণের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে। সাহিত্যে যেমন জাতীয় হৃদয়ের প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই উহাতে জাতীয় অভ্যুদয় ও অধঃপতন, অস্তিত্ব ও বিলয়ের প্রকৃত বিবরণ জানা যায়। যে জাতির হৃদয় যখন যে ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, সেই জাতির সাহিত্যে তাহার আলেখ্য তখন সেই ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—একের বিকাশে অপরের উন্নতি, একের অবনতিতে অপরের অধঃপতন অনিবার্য্য। যে দেশের লোকদিগের জাতীয় জীবন যে পরিমাণে সমুন্নত, তাহাদের গতি ও লক্ষ্য তাহাদের জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে সেই পরিমাণে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্বাবস্থা ঃ বঙ্গ-সাহিত্যের আদিম অবস্থার কাল নির্ণয় করা কঠিন হইলেও উহার প্রাচীন ইতিহাস ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে জানা যায় যে, উহার প্রথম অবস্থাতে কবিতাই উহার জীবন এবং ছন্দময় কাব্যগ্রন্থই উহার ভূষণ ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ তৎকালে প্রচলিত মৈথিলী ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণে যে সকল মধুর কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ঝঙ্কারে বঙ্গভূমি দীর্ঘকাল মুখরিত হইয়াছিল। জয়দেব, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি ভক্ত সাধক কবিগণ আদিরসের তরল তরঙ্গে এক সুরে, এক তানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গানে বাঙ্গালীর চিত্ত দীর্ঘকাল বিভোর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গবাসিগণের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। উল্লিখিত বৈষ্ণব কবিগণের হৃদয়োন্মাদক মধুর পদাবলী সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের সূচনায় এক অভিনব ভাব আনিয়াছিল। উহার কিছুকাল পরেই নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে তিনি ও তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যগণ যে মধুর সংকীর্ত্তনে পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর তটবর্ত্তী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, ক্রমে অনন্ত প্রসারিত দিগন্ত প্রধাবিত সুনীল গভীর মহাসমুদ্রের বিপুল তরঙ্গরাজি চুম্বিত পুণ্যতীর্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রে সমস্ত বাঙ্গালী ও

উড়িয়াদিগকে সমানভাবে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন, সেই গানের সুতীব্র ঝঙ্কারে বাঙ্গালা ও সাহিত্যের গতি এক নূতন পথে পরিচালিত হইয়াছিল। একদিকে প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব কবিগণের মধুর পদাবলীর স্বপ্নময় ঘুমন্ত ভাব, অপর দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্তগণের গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ মধুময় সংকীর্ত্তন! এই সকল ভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ লেখকদিগের গ্রন্থাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় উহার যথেষ্ট অঙ্গপুষ্টি-সাধন ও গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব ঃ মহাকবি কৃত্তিবাস ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লেখনী-প্রসূত বাঙ্গালা রামায়ণ কোন্ সময় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন হইলেও ইহা স্থির নিশ্চয় যে, বাঙ্গালা রামায়ণ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মহাকাব্য। উহা তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। উহার ভাষা কবিকঙ্কণের ভাষার ন্যায় শ্রুতিমধুর অথবা কালিদাসের ভাষার ন্যায় পরিমার্জ্জিত ও তেজস্বী না হইলেও তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যে উহার প্রভাব সম্যকরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসের পর পদ্য মহাভারত-প্রণেতা কালিদাস বাঙ্গালা দেশে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাভারতের ন্যায় আর একখানি কাব্যগ্রন্থ তৎসময়ের বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ উপাদানে উহা পরিগঠিত হইয়া দীর্ঘকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের বিপুল শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত উভয় সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয়ের বিষয় ও ভাব অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ হইলেও উহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস, কালিদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণের পর কিছুকাল পদ্যগ্রন্থ প্রণয়নে কেহ কেহ যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু রচনার পারিপাট্য ও ভাবের সুশ্লীলতা অভাবে ঐ সকল পুস্তক ভদ্রজন সমাজে আদর লাভে সমর্থ হয় নাই এবং তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যেরও কোন উপকার সাধিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রভাব ঃ বঙ্গমাতারা ক্ষণজন্মা সুখন্তান মহাত্মা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা পদ্যের কথঞ্চিৎ সংস্কার পূর্ব্বক গ্রন্থ রচনায় বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হন। তাঁহার রচনায় জন-সাধারণের প্রবৃত্তি ও মনের গতির কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থগুলি কিছুকাল তাঁহার ভক্তজন-সমাজে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ গদ্যগ্রন্থ রচনায় অধিকতর পরিমাণে মনোনিবেশ করেন। ঐ সকল রচনা বহুল পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ থাকায় তাহা জনসাধারণের নিকট আদরণীয় ও সুপ্রচলিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঃ মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের পর সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা ভাষাকে অধিকতর পরিমার্জ্জিত এবং সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বরপূর্ণ প্রভাব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত করিয়া সাহিত্যের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বিবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে সুশোভিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে প্রচারিত হয়। সুলেখক দত্ত মহাশয় দ্বাদশ বর্ষকাল একান্ত দক্ষতার সহিত উক্ত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্যভার পরিচালন পূর্ব্বক বিবিধ সার-গর্ভ প্রবন্ধে উহার প্রতিপত্তি বিস্তার ও বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষার দীনতা উপলব্ধি করিয়া সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে অপূর্ব্ব ভাব, ছায়া ও আলোক লইয়া পরিমার্জ্জিত ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্য-সংগঠনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ কতিপয় বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনূদিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়াছিল। ইঁহাদের উভয়ের পুস্তক প্রথমতঃ কিছুকাল সংস্কৃতমূলক কঠিন শব্দ ও সুদীর্ঘ সমাসে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমে ঐ সকল গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে সংস্করণের পর সংস্করণে অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইয়া শিক্ষক এবং ছাত্রগণের প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। এই দুই ক্ষমতাশালী লেখকের তেজস্বিনী রচনা সাধারণের নিকট সম্যক আদর লাভে সমর্থ না হইলেও উহাদের উভয়ের রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকে বাঙ্গালা সাহিত্য যে বিশেষ উৎকর্ষ ও সম্মান লাভ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইঁহাদের লিখিত কোন কোন পুস্তক তৎকালে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজে আদর ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কাল ঃ বলা বাহুল্য যে অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে মাতৃভাষার প্রতি এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোকের অনুরাগ ও যত্ন ছিল না। তৎকালে সংস্কৃত-শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইংরাজী শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যায় বিমুখ হইয়া কেবল মাত্র ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনে রত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতৃভাষার প্রতি প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক সময় ইংরাজি ভাষায় পুস্তক লিখিয়া আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি

ও সহৃদয়তার পরিচয় দান করিতেন! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখন আর সেদিন নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর সুশিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে বাঙ্গালীর চৈতন্য হইয়াছে। স্বদেশানুরাগী সুশিক্ষিত ও সহৃদয় লোকগণের পরিচর্য্যায় বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য অতি অল্পকাল মধ্যে সমধিক উৎকর্ষ ও উন্নতিলাভে শিক্ষিত জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। পৃথিবীর কোন সভ্যজাতির সাহিত্য কখনও এত অল্প সময়ের মধ্যেও দ্রুতবেগে এরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হয় নাই। নানা কারণে আমরা অতি দীনহীন ও দুর্ব্বল হইলেও ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমরা দিব্যজ্ঞানে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের মাতৃভাষার পরিপোষণ ও সমুন্নতির উপর আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের কীর্ত্তি ঃ যে সকল সুকৃতিশালী মহাত্মাগণ বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধনে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, পরলোকগত মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ও পারসী ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার লিখিত বিবিধ বিষয়ক বিস্তর সারগর্ভ প্রবন্ধ কলিকাতা রিভিউ, হরকরা, ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দান করিত। তদানীন্তন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইয়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীগণ আগ্রহের সহিত ঐ সকল সুপাঠ্য প্রবন্ধ পাঠে একান্ত প্রীত হইতেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ইংরাজি ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া বিপুল মান সম্ভ্রম লাভে ইয়ুরোপীয় সমাজে সমাদৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই! মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। উহার দীনতা, দুর্গতি ও অভাব দেখিয়া তাঁহারা অন্তর ব্যাকুল হইত। এই জন্য তিনি উহার পরিচর্য্যায়, জাতীয় সাহিত্য সংগঠনে ও উহার উৎকর্ষ সাধনে একাগ্রচিত্তে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গালাভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন, তখন বাঙ্গালাদেশে দুইটী সম্পূর্ণ পৃথকভাষা প্রচলিত ছিল। একটি সাধুভাষা, যাহা প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় ব্যবহৃত হইত; অপরটী সরল ভাষা;— চলিত, যাহা কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত। যখন সহৃদয় প্যারীচাঁদ বুঝিলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন সহজ উপায় অবলম্বন করিলেন না, তখন তিনি তাহাকে সংস্কৃতমূলক শ্রুতিকঠোর শব্দাড়ম্বরপূর্ণ সমাসের ঘনঘটা হইতে মুক্ত করিয়া সরল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালাভাষার অনুশীলন ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যা যে কত সুখের, সম্মানের ও গৌরবের বিষয়, উক্ত সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন পরিগঠনের পক্ষে যে কত অনুকূল ও উপযোগী, বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ-পুষ্টিসাধন

ও উহার শোভা সম্পদ সংবর্দ্ধনে বাঙ্গালীর হৃদয়ের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ সুশিক্ষিত ও সহৃদয় বাঙ্গালীর পক্ষে কিরূপ পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত নতুন পথ অবলম্বনে উহাতে অভিনব প্রাণ ও নবীন আলোক ঢালিয়া দিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও গৌরব বর্দ্ধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত মাসিক পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী ঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা প্যারীচাঁদ তদীয় বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহিত আগ্রহ সহকারে তৎকালের উপযোগী বিবিধ বিষয়পূর্ণ সহজ ভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। উহার নাম "মাসিকপত্রিকা" প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবলম্বিত ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী পণ্ডিতগণের তীব্র সমালোচনার বাণবিদ্ধ হইবে। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উক্ত মাসিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে দীর্ঘকায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; —"এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিত হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রবন্ধ সকলের রচনা হইবে। বিজ্ঞপণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য এই পত্রিকা লিখিত হইতেছে না।"

আলালের ঘরের দুলাল ঃ উক্ত পত্রিকার প্রথমখণ্ড হইতেই প্যারীচাঁদের সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে প্যারীচাঁদ স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গভীর অন্ধকারের পর যেমন উষার আলোক পথভ্রান্ত পথিককে আস্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া তাহার গন্তব্যপথ প্রদর্শন করে, সহৃদয় প্যারীচাঁদ-প্রবর্ত্তিত তরল অথচ আবেগময়ী ভাষা ও অভিনব ভাব তেমনই সন্দেহাকুল সাহিত্যসেবীগণের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব আলোক আনয়ন পূর্ব্বক সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণে বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা দান করিল। এই সময় "আলালের ঘরের দুলালের" ভাষা লইয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ও কতিপয় ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির মধ্যে তুমুল আন্দোলন ও বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। সুপাঠ্য পুস্তক রচনার পক্ষে প্যারীচাঁদ-প্রবর্ত্তিত সরল বেগবতী ভাষা, অথবা সংস্কৃতানুসারিণী গম্ভীর জমকাল ভাষা প্রকৃষ্ট ও আদরণীয়, এই সমস্যা মীমাংসার জন্য নানাস্থানে সভাসমিতি, খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের সম্মিলন স্থলে বিস্তর বাদানুবাদ ও তর্কবির্তক চলিয়াছিল। এই উপলক্ষে কত সমালোচনা, কত উপহাস ও বিদ্রূপ অবাধে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। নির্ভীক প্যারীচাঁদ উহাতে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আলালী ভাষার প্রভাব ঃ ক্রমে প্যারীচাঁদের সরল ও সরস ভাষা সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বোধ্য শব্দ ও আড়ম্বরপূর্ণ কঠিন সমাসের অবরোধ মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী বেগবতী তরঙ্গিনীর ন্যায় তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব শোভা, সম্পদ ও উন্নতি সম্পাদনের সূচনা করিল। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী বিস্তর সহৃদয় লেখক ও পাঠক তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যের ন্যায় উক্ত সহজ ভাষার পক্ষপাতী হইলেন। দেখিতে দেখিতে উহা বঙ্গ-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন ও গৌরব-বর্দ্ধনের এক নবযুগ আনয়ন করিল। উহার প্রভাব দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ প্যারীচাঁদের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে সুতীক্ষ্ণ উপহাস ও বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি তৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" প্যারীচাঁদের ভাষাকে "আলালী ভাষা" নাম দিয়া উহার প্রতি কীরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত প্রবন্ধের পাঠকগণ বিশেষ রূপে জানেন। নির্ভীক প্যারীচাঁদ সাধারণভাবে উক্ত সমালোচকদিগের মতের প্রতিবাদ পূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাষা; সংস্কৃত; ভাষা কখনই উহার জননী নহে; উহা কিয়ৎ পরিমাণে উহার ধাত্রীর কার্য্য করিলেও উহার মাতৃভাবের প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর নিপতিত হইলে উহার প্রসারণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনে বিস্তর বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ কূপোদক অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী আবেগময়ী স্রোতস্বতীর জল যেমন নরনারীর স্বাস্থ্যের উপযোগী, সংস্কৃত ভাষার কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য শব্দের নাগপাশ-বদ্ধ প্রাণহীন গতিহীন জমকাল ভাষা অপেক্ষা মধুব ভাব ও তরল তরঙ্গপূর্ণ বেগবতী সরল বাঙ্গালা ভাষা তেমনই বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় জীবনের অনুকূল।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কাল ও উন্নতির সূচনার আলোচনায় আমি মহাত্মা প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত রূপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি ইহা সহৃদয় মহাশয়গণের অপ্রীতিকর হইবে না। প্যারীচাঁদের সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা অনেক বিষয়ে, নিরাভরণ হইলেও উহা হইতে যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক "আলালের ঘরের দুলাল" হইতেই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রোত উপযুক্ত পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের পরে প্যারীচাঁদ আরও কতকগুলি সুনীতিপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ও কীর্ত্তি ঃ প্যারীচাঁদের পরম ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচর্য্যার্থে ষোড়শোপচারে অনন্ত গৌরবময়ী বঙ্গ-ভারতীর পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমির সুসন্তান সহৃদয়

বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বদেশ-বৎসল মহাত্মা প্যারীচাঁদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইতে যে উৎসাহ ও একাগ্রতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে আত্মোৎসর্গ করেন। প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত "মাসিক পত্রিকার" ন্যায় তিনি "বঙ্গদর্শন" ও "প্রচারে" সাধারণের বোধগম্য সহজ ও পরিমার্জ্জিত ভাষায় বিবিধ বিষয়ক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রভৃতির অবতারণায় বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদের পরলোক-গমনের কিছুকাল পরে তদীয় পুত্রগণের যত্নে ও উৎসাহে তৎপ্রণীত বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থাবলী কলেজস্ট্রীটের ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হইয়া "লুপ্ত রত্নোদ্ধার" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের অসাধারণ কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রাণের ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেই সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিবেন বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য প্যারীচাঁদের নিকট কি পরিমাণে ঋণী। মহাপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের সহৃদয়তার পরিচয় জন্য এস্থলে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ

"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। .... দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য ও সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করেন, এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে।............ প্যারীচাঁদ আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ; ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহাই প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।"

প্যারীচাঁদ যে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পরিমার্জ্জিত ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাহার সম্যক্ গৌরব বর্দ্ধনে অমরতা

লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতা প্রভাবে পূর্ব্বপ্রচলিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ শ্রুতিকঠোর রচনা-প্রণালী পরিহার পূর্ব্বক প্যারীচাঁদের প্রাঞ্জল অলঙ্কারবিহীন রচনাপ্রণালীকে অধিকতর পরিমার্জ্জিত করিয়া জগতে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক "বঙ্গদর্শনের" সহায়তায় তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে বিবিধ রত্ন-রাজি সঞ্চয় পূর্ব্বক উহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনে ও সম্পদবর্দ্ধনে প্রভূত যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শন" প্রচারিত হইলে কত সুশিক্ষিত লোকে দলে দলে তাঁহার ভক্ত মন্ত্রশিষ্যরূপে তাঁহারা প্রতিভা ও সহৃদয়তার পূজা করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন নানা বিষয়ে বিবিধ সার-গর্ভ প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিতেন, তাঁহার অনুযাত্রীগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা লেখকও তেমনই অনেক সুপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এক একখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের এক একখানি উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ। তিনি বাণীর বরপুত্রের ন্যায় প্রকৃতির রম্য কাননে যথেচ্ছ বিচরণে সদ্য প্রস্ফুটিত বিবিধ সুরভি কুসুম চয়ন পূর্ব্বক বিস্তর মনোমুগ্ধকর মালা গাঁথিয়া প্রাণগত ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রেমভরে কণ্ঠে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি সাহিত্য সম্রাটরূপে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ ও পবিপুষ্টি সাধন ও গৌরববর্দ্ধনে জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের যে অপূর্ব্ব সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত ও কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তজ্জন্য চিরদিন প্রাণগত বক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি দানে তাঁহার মধুর স্মৃতির পূজা করিবে।

বিদেশীয়ের নিকট বঙ্গসাহিত্যের সম্মান ঃ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক সুবিখ্যাত দার্শনিক টেন্ সাহেবের ন্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফ্রেজার সাহেব ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। সহৃদয় ফ্রেজার সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলীর সমালোচনা স্থলে বলিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও উহা সর্ব্বথা প্রাচ্য ভাবাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র নববঙ্গের সৃষ্টিকরী প্রতিভার অধীশ্বর।" ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিদুষী শ্রীমতী নাইট ইংরাজী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষ-বৃক্ষে"র অনুবাদ করেন। সুবিখ্যাত "Light of Asia" নামক গ্রন্থের সহৃদয় লেখক শ্রীযুক্ত এডউইন্ আরনল্ড সাহেব উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থের যে একটী হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত প্রতিভাশালী; তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তি ও প্রাণগত উদ্দেশ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যুগে বিপুল উৎকর্ষের সূচনা করিতেছে।"

বঙ্গ-সাহিত্যে অন্যান্য মাসিকপত্র-সম্পাদক ও গ্রন্থকারগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঃ 'বঙ্গ-দর্শনের' ন্যায় "আর্য্য-দর্শন", "বান্ধব", "ভারতী" ও "নব্য-ভারত" প্রভৃতি কতিপয় মাসিক-পত্রিকা কৃতবিদ্য ও উপযুক্ত ক্ষমতাশালী সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিস্তর কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। এই সময়

অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারে স্থায়ী ভাবে স্থান পাইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরলোক গমনের পর প্রতিভাশালী মহাকবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিহারীলাল ও স্বনামধন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিপুল সাধনা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে বাঙ্গালা কাব্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উল্লিখিত সাহিত্য-সেবী মহাত্মাগণের সহযাত্রী ও অনুযাত্রী সুলোকগণের আন্তরিক যত্ন ও সাধনাপ্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির স্রোত তর তর প্রভাবে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, দিন দিন অনেক সহৃদয় চিন্তাশীল লেখক উহার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। আজি যদি কোন অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে মহাত্মা প্যারীচাঁদ ও মহাপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগত মুক্ত আত্মা ক্ষণকালের জন্য দিব্যধাম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এই প্রশান্ত সভাস্থলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জাতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত শত শত সহৃদয় সাহিত্যানুরাগীর জ্বলন্ত উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখিয়া ইহা ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিবেন যে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে বঙ্গ-জননীর অনেক সুসন্তান চির-উপেক্ষিত মাতৃ-ভাষার পরিচর্য্যা এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হইয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আশা ঃ বিগত ৫০ বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, উহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল আলোকময় এবং বিশেষ আশাপ্রদ। উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সমুন্নতি সাধনে উহাকে সভ্য-জগতে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ সাহিত্যে পরিণত করিতে বর্ত্তমান সময়ের জাতীয় সাহিত্যানুরাগী স্বদেশ-প্রেমিক মহাশয়গণ নিঃসন্দেহে প্রকৃতি মহা-সাধনায় দীক্ষিত হইবেন। যে দেশে সাধারণতঃ কোন গ্রন্থ শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট না হইলে বাজারে বিক্রয় হয় না এবং সাধারণের উৎসাহ ও প্রবৃত্তি অভাবে যে দেশে অনেক সদগ্রন্থ অনাদরে উপেক্ষিত হয়, সেই হতভাগ্য দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের প্রাণগত যত্ন ও সাধনার বিষয় চিন্তা করিলে প্রাণে স্বভাবতঃ এই আশা জন্মে যে, উপযুক্ত সাধনাপ্রভাবে বঙ্গা-সাহিত্যের বিপুল গৌরবে বঙ্গজননী একদিন সমগ্র অবনীর ললাট-মণিরূপে সম্মান লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রাণগত যত্ন ও পরিশ্রমে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান সমস্ত অভাব নিবারিত এবং উহার সকল বিষয়ে অনির্ব্বচনীয় উন্নতি সাধিত হইবে। এতক্ষণ আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অবস্থা হইতে উহার বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা উহার অভাব ও তাহা নিবারণের উপায় আলোচনা প্রবৃত্ত হইব।

পনের বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যা ব্যক্তিগত-ভাবে নিবদ্ধ ছিল। উহার উপাসক-সম্প্রদায় এতদিন আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভানুসারে উহার গঠন ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-সংগঠন ব্যক্তিগত প্রতিভা, ধ্যান, ধারণা ও একাগ্রতা পূর্ণ সাধনার আয়ত্ত হইলেও উহার প্রকৃতি নির্ণয়, অভাব নিরূপণ ও উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ, দূরদর্শী ও উদ্ভাবনী-শক্তিশালী ব্যক্তির সমবেত যত্ন ও সহায়তার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রতিভাশালী সুলেখক ও বহুদর্শী সমালোচকগণের সম্মিলিত চেষ্টায় যাহাতে নূতন সহজবোধ্য শব্দ-সংগঠন, ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য্য সংরক্ষণ, লেখার প্রণালী ও ভঙ্গিমার উৎকর্ষ বিধান, সুরুচির সমর্থন এবং পারিভাষিক শব্দ সৃজনে ভাষার পরিপোষণ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত অভাব মোচন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের হয়, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিগণ দীর্ঘকাল বিস্তর আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। প্যারিসের বিখ্যাত "একাডেমী অফ্ লিটারেচার" যে মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহার দ্বারা ফরাসী ভাষা ও ফরাসী সাহিত্যের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার আদর্শে বাঙ্গালাদেশে একটী সাহিত্য-সমিতি সংস্থাপনের আবশ্যকতা অনেকে অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ, উৎসাহশীল সাহিত্যানুরাগী মহাশয়ের যত্ন, উদ্যম ও সহায়তায় বিগত ১৮৯৯ সনে শুভদিনে শুভক্ষণে জাতীয় সাহিত্যের সমুন্নতি সাধন জন্য কলিকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদের গত কয়েক বৎসরের চেষ্টা কোন কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহে সফল হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রচলিত শব্দের অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন, পুরাতন লুপ্তপ্রায় কোন কোন গ্রন্থের উদ্ধার, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, সাহিত্যসেবী সুকৃতি সন্তানগণের উৎসাহ বর্দ্ধন, এবং বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সাহিত্য-সেবকের অনুরাগ ও সহানুভূতি আকর্ষণে পরস্পরের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাব ও গৌরব বিস্তার প্রভৃতি কার্য্য এই পঞ্চদশ বৎসরের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বঙ্গ-সাহিত্যের অভাবমোচনে সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা ও সাধনার আবশ্যকতা ঃ সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নানা বিভাগে বিভক্ত থাকিলেও উহার দ্বারা একাল পর্য্যন্ত কতিপয় অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে কোন রূপ সুব্যবস্থা হয় নাই। অতঃপর যাহাতে সর্ব্বাগ্রে পরিষদের সর্ব্ববাদী-সম্মত সন্তোষজনক প্রকৃতি, পদ্ধতি ও ক্ষমতা নিরূপিত হয়, তৎপক্ষে উপযুক্ত সুব্যবস্থা একান্ত প্রার্থনীয়। উহার প্রকৃতি ও ক্ষমতা স্থিরীকৃত হইলে যাহাতে বাঙ্গালাভাষায় লিখিত অসার ও অশ্লীল পুস্তক প্রশ্রয় না পায়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যাহাতে উপযুক্ত সহজ সরল চলিত কথা সংকলন

এবং সাধারণের বোধগম্য উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ সংগঠনে ভাষার দীনতা নিবারিত ও অঙ্গসৌষ্ঠব সংসাধিত হয় এবং বঙ্গভাষায় লিখিত প্রকৃত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান, শিল্প, পদার্থবিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিবিধ অত্যাবশ্যক বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের চির-অভাব নিবারিত হয় এবং সর্ব্বোপরি যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মৌলিক চিন্তা ও অনুসন্ধানের উন্মেষে প্রকৃত কল্যাণকর গ্রন্থ রচনার আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে সাহিত্য পরিষদের সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উল্লিখিত অভাব নিবারণের জন্য পরিষদের কঠোর সাধনা আবশ্যক। উক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বঙ্গজননীর অনেক কৃতবিদ্য সুসন্তানকে ধ্যানরত কর্ম্মযোগীর ন্যায় সুসংযত ভাবে জাতীয়-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য অত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের যে সকল সৌভাগ্যশালী মহাশয়গণের প্রতি মা-লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে, জাতীয় অভাব নিবারণের জন্য তাঁহাদিগকেও উল্লিখিত গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য দান করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহাতে দুরবস্থাপন্ন অসহায় গ্রন্থকারগণের সদগ্রন্থ জনসমাজে বহুল প্রচারিত হয়, যাহাতে ঐ সকল হিতকর পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থে পুস্তকপ্রণেতৃগণের অন্নসংস্থান ও উৎসাহবর্দ্ধন হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ভাবিতে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের সাহিত্যের যে এত উন্নতি হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট প্রতিভা ও গুণের যথাযোগ্য আদর ও সম্মান আছে। ঐ সকল দেশের নরনারীর জ্ঞানপিপাসা এতই প্রবল যে, তথায় কোন সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়; এবং তাহার কিছুকাল পরেই সংস্করণের পর তাহা সমস্ত দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ সকল সভ্য দেশে সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া কাহাকেও কখনও অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যাকুল হইতে হয় না।

বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের উপায় : উপযুক্ত শব্দ-সংকলন ও সংগঠনে বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধন ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন কথার আবশ্যক হয়। তৎকালে ধীরভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানে নূতন শব্দ সংকলনেও যত্নবান হওয়া বিধেয়। হিন্দী, পারসী, আরবী, উর্দ্দু কিম্বা অপর কোন ভাষার যে সকল শব্দ দীর্ঘকাল হইতে এ দেশে অবাধে চলিয়া আসিতেছে এবং যে সকল শব্দ সহজে সাধারণের বোধগম্য ও যাহার দ্বারা মনের ভাব সহজে সুন্দররূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপ শব্দ বা কথা সতর্কতার সহিত বাছিয়া লইয়া বাঙ্গালাভাষায় যোগদান করিলে তাহাতে লাভ ভিন্ন কিছুমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিছুকাল হইতে ভাষায় অপ্রচলিত কথা ব্যবহার এবং নূতন কথা সৃজন

ও সংকলন সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ চলিতেছে। কেহ কেহ কোন নিয়মের বাঁধাবাঁধি না মানিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শব্দ সংগ্রহ ও গঠন পূর্ব্বক ভাষার পুষ্টিসাধনে যত্নবান। কেহ বা চির প্রচলিত সংস্কৃত-মূলক শব্দগুলিকে সযত্নে বাঙ্গালাভাষা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া চলিত সহজ কথায় এবং আবশ্যকতা বোধে গ্রাম্য-কথা-মিশ্রিত কদর্য্য প্রণালীতে প্রবন্ধ রচনার পক্ষপাতী। ভাষা যতই সাধারণের সহজে বোধগম্য হয়, ততই উহার গৌরবের বিষয়। কিন্তু উহাকে সরল ও সুবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যে যথেচ্ছাচার প্রদর্শন কাহারও অনুমোদনীয় হইতে পারে না। নূতন কথা গঠনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে অথবা ভাষান্তর হইতে কোন অপ্রচলিত কথা লইয়া সুস্পষ্টরূপে মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে যাহাতে ঐ সকল কথা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাষায় স্থান পায়, যাহাতে সহজ কথার সহিত ইতর গ্রাম্যভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া ভাষার রসভঙ্গ, অঙ্গবিকৃত অথবা কোনরূপে উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। সংস্কৃত-ভাষা দীর্ঘকাল হইতে বাঙ্গালাভাষার ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া চিরপ্রচলিত সহজ, সুকোমল ও শ্রুতিমধুর সংস্কৃতমূলক শব্দগুলিকে পরিহার না করিয়া সাদরে বাঙ্গালাভাষায় স্থান দিতে হইবে। তেমনই অন্যান্য ভাষা হইতে যে সকল সহজ সহজ কথা বহুকাল হইতে বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত হইয়াছে তাহাদিগকেও নিষ্ঠুর ভাবে বর্জ্জন করিলে চলিবে না। বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণের এই শুভ সম্মিলনে যিনি সগৌরবে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় মহাশয় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' "নূতন কথা গড়া" ও "বাঙ্গালাভাষা" শীর্ষক দুইটী সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধে নূতন শব্দ সংকলন ও সংগঠনে বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধন এবং উহার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ ও গৌরববর্দ্ধন সম্বন্ধে যে উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার বিশ্বাস এই যে ধীরভাবে সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে অনেকে উক্ত মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ১২৮৮ সনের 'বঙ্গদর্শনে' সুবিজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত প্রবন্ধ দুইটী লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আদরের সহিত গ্রহণের উপযুক্ত; বাঙ্গালাদেশে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গালাভাষার আদি ও প্রকৃতি অভিজ্ঞ এবং উহার গতি ও উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ-শীল বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী বহুদর্শী সুনিপুণ বাঙ্গালা লেখক অতি অল্পই আছেন।

ব্যাকরণ অমান্য করিয়া প্রবন্ধ রচনা ঃ বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন ক্ষমতাশালী লেখক ব্যাকরণের অনুশাসন অমান্য করিয়া যথেচ্ছভাবে প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ দান করিতেছেন। তাঁহারা হয় ত মনে করেন যে, তাঁহারা প্রবন্ধ বা গ্রন্থরচনায় ব্যাকরণের চিরপ্রচলিত নিয়মের বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলিতে বাধ্য নহেন; ওরূপ স্থলে ব্যাকরণ স্বয়ং

তাঁহাদের রচনার প্রণালী অনুসারে তাহার সূত্র সংশোধন করিয়া লইবে! ইহা কতদূর সুসঙ্গত তাহা সহৃদয় সাহিত্যসেবী মহাশয়গণ ধীরভাবে বিবেচনা করিবেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণা এই যে, ভাষার স্বাধীনতা-বর্দ্ধন জন্য ওরূপ যথেচ্ছাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক জোর করিয়া কোন প্রথা চালাইতে গেলে তাহার ফল কখনই শুভজনক হইবে না। ভাষার সৌন্দর্য্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতেই হইবে। কথোপকথনের ভাষায় উক্ত নিয়ম পালন করা আবশ্যক না হইলেও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্য্যাদা ও বিমলতা রক্ষার জন্য ব্যাকরণকে আগ্রাহ্য করিলে চলিবে না।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির পথে বিঘ্ন বাধার আশঙ্কা ঃ দীর্ঘকাল হইতে বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয়সমূহে যে সকল পুস্তক পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেক পুস্তক বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিস্তর ক্ষতি করিতেছে। যে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ক্লাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য অনুশীলনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই শুভদিনে অযুত নরনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই বলিয়া ধন্যবাদ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অনুগ্রহে ও উৎসাহে এতদিনের পর কলেজের উচ্চশ্রেণীতে বাঙ্গালাসাহিত্য শিক্ষার নিয়ম প্রচলনে উহার উন্নতির পথ সম্যক্‌রূপে প্রসারিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির উদাসীনতায় আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ হইতেছে না। পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন সমিতির (Text-Book Committee) রাশি রাশি ব্যাকরণদুষ্ট, আবর্জ্জনাপূর্ণ অসার পুস্তক পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলনের অনুমোদন না করিলে এতদিন উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের অভাব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত। দুঃখের বিষয় এই যে, বি.এ. ক্লাসে বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষায় উপযুক্ত সুপাঠ্য পুস্তকের অভাব আজিও ঘুচিল না। এখনকার কোন গ্রন্থকারকে ক্ষমতাশালী বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার কষাঘাতকে ভয় করিয়া চলিতে হয় না; 'হিতবাদীর' ভূতপূর্ব্ব ব্যঙ্গ-পরিহাসনিপুণ সুযোগ্য সম্পাদক কাব্য-বিশারদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইবারও ভয় নাই। "সাহিত্যের" সম্পাদক একাকী অপ্রিয় কার্য্যে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বদেশানুরাগী সুশিক্ষিত ক্ষমতাশালী সদস্যগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা না করিলে উল্লিখিত বিস্তর কদর্য্য গ্রন্থ স্কুল ও কলেজে বাঙ্গালা-সাহিত্যশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পথ বন্ধ হইবে না।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিপদের আশঙ্কা ঃ কিছুকাল হইতে বাঙ্গলায় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা গঠন ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যাইতেছে। একদল শিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার পক্ষপাতী। আর একদল উহাকে সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের উপযুক্ত করিয়া পরিগঠনে উৎসাহশীল। উক্ত

সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী, তাঁহারা কোনরূপ ভেদনীতির অনুমোদন করেন না। তাঁহারা জানেন ও বুঝেন যে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও এক দেশজননীর সন্তান;—উভয়ে এক দেশের জলবায়ু ও ফল শস্যে পুরিপুষ্ট ও এক প্রকৃতিতে পরিগঠিত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রভেদ থাকিলেও ভাষাগত কোন প্রভেদ নাই। বাঙ্গালাভাষা বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায় বাঙ্গালার মুসলমানেরও মাতৃভাষা। বঙ্গবিভাগের পর পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমান পরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষার পরিবর্ত্তে বিস্তর আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দু ও নিকৃষ্ট গ্রাম্য শব্দপূর্ণ এক অপূর্ব্ব মিশ্র ভাষার প্রচলনের বিশেষ উদ্যোগ চলিয়াছিল। ভারতভূমির ভাগ্য-বিধাতৃগণের বিশেষতঃ সহৃদয় মহানুভব লর্ড হার্ডিং মহোদয়ের একান্ত যত্নে বঙ্গবিভাগ রহিত না হইলে এতদিন পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে একটী নূতন ধরণের বিকৃত বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত হইত। কিছুকাল হইতে ঢাকায় একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা হইলে তথায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষা অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান থাকে তজ্জন্য চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৫ম অধিবেশন গবর্ণমেন্টের নিকট বিনীতভাবে আবেদনের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। অনেকগুলি সুশিক্ষিত মুসলমান উহার সমর্থন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা লইয়া যে বিরোধের আশঙ্কা ছিল, এখনও তাহা দূর হয় নাই। আনন্দের বিষয় এই যে বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী মুনসি আব্দুল করিম ও নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রোসন আলী প্রমুখ সুশিক্ষিত মুসলমানগণ বাঙ্গালাভাষার বর্ত্তমান প্রণালীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া এইরূপ মতের পোষণ করেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার যে সকল সহজ শব্দ বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং যাহা সকলের সহজে বোধগম্য, তাহা হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় সংযোগ করিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষাগত ভবিষ্যৎ-কল্পিত বিরোধজনিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনিষ্টের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই সময় হইতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তজ্জন্য যাহাতে মুসলমান-সম্প্রদায় হইতে অধিক পরিমাণে সুশিক্ষিত ও সহৃদয় বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন, তাহার চেষ্টা আবশ্যক।

কবিতায় এবং কাব্যগ্রন্থে স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার প্রয়োজন ঃ কবিতা-রচনা ও কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে যাহাতে অনুকরণের প্রবৃত্তি শিথিল হইয়া কবি-হৃদয়-জাত স্বাধীন-চিন্তা ও কল্পনাপূর্ণ স্বাভাবিক ভাবনিচয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে রচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তৎপ্রতি খণ্ডকবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রচয়িতার সর্ব্বদা অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক; অন্যথা

সহৃদয় প্রতিভাশালী লেখকের রচনায় স্বতন্ত্রতা ও স্বচ্ছন্দতা বিকাশ পাইবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক উন্নতি ও উদার ভাবনিচয় সুন্দর-রূপে উন্মেষিত হইবে না। কবি-গুরু বাল্মিকী যখন রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই; মহাকবি হোমার যখন বীররসে মাতোয়ারা হইয়া মেঘমন্দ্রে বীরগাথা গানে জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছুই ধার করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই স্বভাবের সযত্ন প্রতিপালিত সরল কবির ন্যায় গভীর ভাবে বিভোর হইয়া একমনে একপ্রাণে আপন আপন অন্তর্নিহিত অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দানে অমর হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের খ্যাতনামা কবিদিগের মধ্যে অনেকের সেরূপ সুকৃতি নাই। তাঁহারা স্বভাবের সদা-উন্মুক্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনভাবে বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহ না করিয়া পূর্ব্বতন কবিসম্প্রদায় এবং বিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের সঙ্কীর্ণ ভাণ্ডার হইতে প্রচুর পরিমাণে ভাব ও মাধুরী সঞ্চয় পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। কল্পনা ও ভাবের মৌলিকতা ও স্বচ্ছন্দতাই কবিতা ও কাব্যের প্রকৃত সম্পদ ও গৌরব।

মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের আবশ্যকতা : গত ৪০ বৎসরের মধ্যে কতিপয় সুপাঠ্য কাব্য উপন্যাস, নাটক ও জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙ্গালা-সাহিত্যের আশাতীত দ্রুত উন্নতি সাধিত হইলেও এখনও উহার প্রকৃত উন্নতির দিন বহুদূরে; এখনও উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রকৃত উন্নতি সাধনের উপযুক্ত উপাদানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। যাহাতে বাঙ্গালাভাষায় মৌলিক চিন্তা ও প্রকৃত অনুসন্ধানপূর্ণ বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শিল্প, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যনীতি, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যা, প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণকর বিষয়ে গভীর আলোচনার সহিত উপযুক্ত সদগ্রন্থ প্রণয়নে প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য লেখকগণ ব্রতী হন, অনতিবিলম্বে তাহার সুব্যবস্থা একান্ত প্রার্থনীয়। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মৌলিক চিন্তা-প্রসূত গবেষণা-পূর্ণ উল্লিখিত উপযুক্ত গ্রন্থ প্রচার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হইলে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা আছে। সাহিত্য-পরিষৎ মাঝে মাঝে বিস্তর টাকা ব্যয়ে অনেক প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আপাততঃ সেই সকল প্রাচীন পুঁথির অনুবাদ করিবার উপযুক্ত লোকাভাব। যে দু'চার জন ক্ষমতাশালী সুবিজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, সুতরাং তাঁহাদের সময়াভাব। এরূপ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য ঐরূপ পুঁথি ও প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহার্থে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ উপযুক্ত গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচার জন্য যথাযোগ্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রকৃত মহৎ অভাব নিবারণের উপায় বিহিত হইবে। যে সকল সদ্‌গ্রন্থ প্রভাবে বিবিধ শিল্প ও বাণিজ্যের

বিস্তার, দরিদ্র বাঙ্গালীর অর্থাভাব ও অন্নকষ্ট নিবারিত এবং স্বাস্থ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহার জাতীয় জীবন সমুন্নত হয়, সেই সকল কল্যাণকর পুস্তকের অভাব যতদিন বিমোচিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ হইবে না।

বিদেশীয় প্রধান প্রধান সদ্‌গ্রন্থ অনুবাদের আবশ্যকতা ঃ ভিন্ন ভিন্ন অত্যাবশ্যক বিষয়ে প্রকৃত মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ উপযুক্ত গ্রন্থ রচনার সুযোগ যতদিন না আসিবে, ততদিন ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণি প্রভৃতি ভাষার প্রধান প্রধান হিতকর গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা হইলে তদ্দ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন ভাষান্তর হইতে গ্রন্থানুবাদের ফল শুভজনক হয় না। তাঁহাদের বিবেচনায় উহাতে স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধানের উন্মেষ না হইয়া অনুকরণের প্রবৃত্তি ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের এরূপ আশঙ্কা সুসঙ্গত নহে। মূল গ্রন্থ হইতে কোন হিতকর বিষয়ের উপযুক্ত অনুবাদ হইলে এবং সেই অনুবাদে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের উন্নতির পথও প্রসারিত হইয়া থাকে। সকল সভ্য দেশের সাহিত্য-ভাণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বিস্তর সুবিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদে পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির যুগে বিশাল ভারতের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশে যে সকল শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সেই সকল শিল্পের প্রণালী ও সঙ্কেত কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল হিতকর প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা অনুবাদ করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন জন্য উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন বিহিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। জর্ম্মাণ ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষার সুবিখ্যাত পুস্তকের অনুবাদ করিতে হইলে উক্ত ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া উল্লিখিত গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনুবাদের অনুবাদ অথবা গ্রন্থের ছায়া মাত্র অবলম্বনে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইলে কোন সুফল লাভের আশা নাই। এক্ষণে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে যে যে বিষয়ের প্রধান অভাব সর্ব্বক্ষণ অনুভূত হইতেছে, সেই সকল বিষয় অপর কোন সভ্যজাতির সাহিত্য হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত অভাব মোচনে সকলে যত্নবান না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কবে শ্রীভগবান সুদিন দিবেন, কতদিনে তাঁহার কৃপায় উপযুক্ত কৃতবিদ্য ক্ষমতাশালী লেখক মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া জাতীয় অভাব মোচন করিবেন, এই আশায় নিশ্চেষ্টভাবে সময়ের প্রতীক্ষা করা উচিত নহে।

দেশের ধনশালী মহাশয়গণের উল্লিখিত গুরুতর অভাবগুলি নিবারণের জন্য সহায়তা ঃ উল্লিখিত প্রধান প্রধান অভাবগুলি সন্তোষজনকরূপে নিবারণ করিতে হইলে কমলার বরপুত্রগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ-সাহায্য সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কে বলে লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর একতা ও প্রীতির অভাব-

জনিত চিরবিরোধ? এই অসার কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা চিরদিন সারদার পূজার মন্দিরে কমলার প্রীতিপূর্ণ স্নেহদৃষ্টি ও গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছি। যে মাননীয় স্বদেশ-প্রেমিক মহাশয় এই জাতীয় বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সুযোগ্য সভাপতি, তাঁহার প্রতি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সস্নেহ দৃষ্টি সমানভাবে বিদ্যমান আছে। তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরম ভক্ত এবং স্বয়ং উহার পরিচর্য্যায় ব্রতী। যিনি তাঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক কবিতা ও প্রবন্ধ আদি পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার উদারতা ও স্বদেশানুরাগের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশিমবাজারের সুশিক্ষিত ও সম্মানিত মহারাজা এবং জগদ্বিখ্যাত পুণ্যবতী রাণী ভবানীর বংশধর পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণের স্বদেশভক্তি ও জাতীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর প্রীতির বিষয় কে না জানেন? ইঁহাদের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধনশালী সুশিক্ষিত মহাশয়গণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচর্য্যা ও পরিপোষণে ব্রতী হইয়াছেন ও হইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় নহে। যে দেশের শিক্ষা বিভাগে সমুন্নত প্রণালীতে বিজ্ঞান ও মৌলিক অনুসন্ধানপূর্ণ বিষয় শিক্ষার জন্য বঙ্গ-জননীর পরলোকগত সুসন্তান স্যার তারকনাথ পালিত ও মহাপ্রাণ ডাক্তার সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে তাঁহারদের পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থের প্রচুর অংশ অকাতরে দান করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, সে দেশের জাতীয়-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কখনই দীর্ঘকাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উল্লিখিত মহাশয়দ্বয়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে বাঙ্গালা দেশের জমিদার, রাজা ও মহারাজগণের মধ্য হইতে কোন কোন সাহিত্যানুরাগী মহাশয় অবিলম্বে বাঙ্গালা-ভাষার মৌলিক চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ উপযুক্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বাঙ্গালী জাতির মহৎ অভাব মোচন ও উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইবেন। তাঁহাদের সুব্যবস্থায় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপযুক্ত গ্রন্থ প্রচারিত হইলে বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অভাব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে। বিবিধ শিল্প ও বাণিজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উন্নতি সাধনে জাতীয়-জীবন সমুন্নত করিতে হইলে উহা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তকের অভাব সর্ব্বাগ্রে মোচন করিতে হইবে। আমাদের দেশে কি ছিল, এবং উপযুক্ত সাধনা ও সহায়তা অভাবে কোন্ কোন্ শিল্প বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা জানিয়া তাহার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হইলে দেশের জনসাধারণের অন্নকষ্ট এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা স্থানে দুর্নীতিপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল স্বদেশ-দ্রোহীদলের কলঙ্কিত অপকার্য্য অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে।

শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ঃ যিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য দেশীয় ও বিদেশীয় বিবিধ-শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ধন-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব যে পরিমাণে নিবারণের উপায় বিধান করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইবেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এ দেশীয় লোকদিগের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোনরূপ উন্নতি হইতেছে না। জাতীয়-সাহিত্যে এই মহৎ অভাব নিবারণের ব্যবস্থা না থাকিলে উহা জাতীয়-জীবনের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শক হইবে না।

উপসংহার ঃ বাঙ্গালা দেশের সহৃদয় ধনশালী মহাশয়গণ কত দিকে কত অর্থ অকাতরে মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকেন। তাঁহারা জাতীয়-কল্যাণকর বিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিলে তাঁহাদের অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইবে। তাঁহাদের সহায়তায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রকৃত অভাব মোচনের সুব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। জন্মভূমির গৌরবে তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণ গৌরবান্বিত হইবেন। বঙ্গভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সুশিক্ষিত স্বদেশানুরাগী ধনশালী মহাশয়গণের উৎসাহ ও সহায়তায় গত কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে এই যে সম্মিলিত ভাবে সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হইয়াছে, পরম মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদে অচিরে তাহার শুভফল জন্মিবে। সমবেত সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ, আজিকার এই পুণ্যময় কার্য্য-ক্ষেত্রে আমরা করুণাময় বিশ্বনাথের পবিত্র চরণে আমাদের হৃদয় লুটাইয়া প্রগাঢ় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে একাগ্রতার সহিত এই প্রার্থনা করি যে, তিনি এই জাতীয়-সাহিত্য-সাধনায় অজস্র ধারে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। তিনি সকল উন্নতির নিদান; তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমরা স্ব স্ব শক্তি সামর্থ্য অনুসারে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে আমাদের সাধনা বিফল হইবে না।

সাহিত্য ও তাহার সম্পদ্

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তন্নিবারণের উপায়

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য অর্থে আমরা কি বুঝি, এক কথায় তাহা বলিয়া উঠা একটু শক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র ও সেই গানই সাহিত্য।" অপিচ, 'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।' অর্থাৎ বাহিরের বস্তুর জ্ঞান এবং মানুষের নিজের অন্তঃপ্রবৃত্তি—এ উভয়ের সংমিশ্রণে যে সমুদয় ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই অন্যের মনে প্রবাহিত করিবার যে চেষ্টা ভাষায় প্রকাশ পায়, মোটামুটি তাহাকেই সাহিত্য বলা যাইতে পারে। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা যদি কেবল তাঁহার পত্নীবিয়োগের সংবাদটী আমাদিগকে প্রদান করিতেন তবে উহাকে সাহিত্য বলিতাম না; কিন্তু পত্নীবিয়োগজনিত তাঁহার উদ্বেল শোকসাগরের প্রত্যেক লহরী প্রবলবেগে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে বলিয়াই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' সাহিত্য-স্থানীয়।

একমাত্র ব্যাকরণশুদ্ধ বাক্য রচনা দ্বারা ভাব জাগান চলে না; এইখানে ভাষাকে অলঙ্কারে, চিত্রে, সঙ্গীতে সাজাইয়া তুলিতে হয়। সাহিত্য ললিতকলা; লালিত্যে, সৌন্দর্য্যে এবং ভাবের প্রাচুর্য্যেই তাহার জীবন। সাহিত্য বলিতে কাজেই আমরা কলাকৌশলপূর্ণ, ভাববহুল ভাষারচনা বুঝি।

কিন্তু এই সংজ্ঞায় একটু সংকীর্ণতা আছে। ইহাতে কেবল নাটক, উপন্যাস, কাব্য ও গান ছাড়া আর কিছু আটকান যায় কি না সন্দেহ। সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা, এমন কি সাহিত্যের ইতিহাসকেও এই সংজ্ঞা অনুসারে সাহিত্য হইতে বাদ দিতে হয়।

সাহিত্যকে যখন একটা জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে বিচার করা হয়, তখন ইহাকে কেবল ছড়া, পাঁচালী বা গানের সমষ্টিমাত্র মনে করা চলে না। ছড়া পাঁচালীতে যথেষ্ট ভাবসম্পদ্ থাকিতে পারে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কি না বিবেচ্য। যখন কোনও জাতির সাহিত্যের বিচার করিতে বসি, তখন আমরা উহাতে যে কেবল কলাকৌশল, কেবল সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিই খুঁজি এমন নহে; আমরা উহাতে জাতির মানস-গতির পূরা ইতিহাসটীই আশা করিয়া থাকি। কর্ম্মরাজ্যে জাতির যে ক্রিয়াকলাপ বিকাশ পায়,—গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে জাতি যে সমস্ত কাজ করে, মনোরাজ্যে, জাতির চিন্তনে ও অনুভূতিতে তাহার ছায়া থাকে; এবং সেই জন্যই

সাহিত্যেও তাহার পরিচয় থাকা উচিত; কারণ, সাহিত্য জাতির মনোরাজ্যের প্রকাশক। মনের স্তরে স্তরে যে সমস্ত ভাব ও জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ চেষ্টা একদিকে যেমন কর্ম্মে, অন্যদিকে তেমনই সাহিত্যে সাফল্য-লাভ করে। কেবল তাই নয়। বরং, সাহিত্যের প্রকাশ-ক্ষমতা বেশী। সমাজবদ্ধ মানবের কর্ম্মক্ষেত্র চিরকালই কমবেশী সীমাবদ্ধ কিন্তু সাহিত্যের পরিসর কর্ম্মের পরিসরের চেয়ে অনেক বেশী। বিশেষতঃ ভাবের দিক্‌টা সাহিত্যে যেমন প্রকাশ পাইতে পারে, কর্ম্মে তেমন হয় না। সুতরাং জাতির সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান ও ভাবের সমষ্টিকে যে ভাষা প্রকাশিত করে, একটু বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করিলে তাহাই সাহিত্য।

একটী সমগ্র জাতি কখনই কেবল কবিতার ভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না; তেমনই, কেবল কবিতায় একটী সমগ্র সাহিত্য হইতে পারে না। একটী পরিপূর্ণ ব্যক্তি বলিতে কেহই একটী মাত্র ভাব বা চিন্তা বুঝে না; পরস্পর-সম্বন্ধ বহুবিধ ভাব ও চিন্তার ঐক্যকেই আমরা ব্যক্তি বলিয়া থাকি। সেইরূপ একটী জাতি বলিতেও আমরা একই ভাবের প্রবাহে প্রবাহিত অথবা একই ক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র বুঝি না; বিভিন্ন চিন্তার আধার, বিভিন্ন ভাবে পরিপূর্ণ ও বিভিন্ন ক্রিয়ায় ক্রিয়াবান্‌ মানব সমষ্টিকেই জাতি বলিয়া জানি। সুতরাং একটী জাতির সাধারণ সম্পত্তি যে সাহিত্য, তাহাতে যদি কেবল একই গানের সুর বাজে, অথবা একই ভাব প্রকাশ পায়, তবে নিশ্চয়ই জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে ইহাকে অপরিপুষ্ট বলিতে হইবে। একটী সমগ্র, সতেজ, জাগ্রত জাতি বলিতে যখন আমরা বহু ভাবে ভাবুক, বিভিন্ন ক্রিয়ায় সক্রিয় মানব-সমষ্টি বুঝি, তখন সাহিত্য বলিতেও এই বিভিন্ন ভাবের ও জ্ঞানের প্রকাশক ভাষা-রচনাই বুঝা উচিত।

কেহ হয় ত মনে করিবেন, আমরা এখানে ভাষা ও সাহিত্যের পার্থক্যটী ভুলিয়া যাইতেছি। জ্ঞানের কথা, ক্রিয়ার ইতিহাস, ভাষায় থাকিবে বটে, কিন্তু তাহাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা ভুল; 'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।' আমরা ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু এই মাত্র বলিতে চাই যে, ভাবের ও জ্ঞানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল তুলিয়া সীমানা ঠিক করিয়া দেওয়া চলে না। ভাবকে লইয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, জ্ঞানের তথায় স্থান হইবে না,—ইহা অসম্ভব কথা। সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ যদি হইতে হয়, তবে ভাব-বৈচিত্র্য চিরকালই জ্ঞানের বিপুলতার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং যদি একটী সমগ্র সাহিত্যের সম্পদের ইয়ত্তা করিতে চাই, তবে তাহাকে কেবল ভাবের মাপ-কাটিতে দেখিলে চলিবে না, জ্ঞানের গাম্ভীর্য্যও তখন বিবেচ্য হইয়া উঠিবে। ভাবেরও আবার তুলনা হয়; ভাবেরও তারতম্য আছে, প্রকারভেদ ও মূল্যভেদ আছে; কিন্তু এই ভেদের বিচার ভাবের মূলস্থিত জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া করা চলে না। অন্ধকারে যে ভয় হয়, সেটাও একটা ভাব; আর,

বিশ্ব মানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ফল শূন্যে পরিণত হইবে, ইহা ভাবিতে যে ভয় হয়, সেটাও একটা ভাব; কিন্তু এ উভয়ের কি কোন তফাৎ নাই? থাকিলে, সে তফাৎ ওজন করিবার উপায় কি? শিশু যে তাহার পুতুলটীকে ভালবাসে সেটাও ভালবাসা, আর পৃথিবীশুদ্ধ লোককে যে মহাত্মারা ভালবাসিয়াছেন সেটাও ভালবাসা। উভয়টীই ভাব; উভয়কেই ভাষায়, ছন্দে প্রকাশ করা যায়; উভয়ই সাহিত্যের উপাদান হইতে পারে এবং হইয়াছেও; কিন্তু এই উভয়ের মূলস্থিত জ্ঞানটুকু ছাঁটিয়া ফেলিলে, ইহাদের—প্রকারভেদ লোপ পাইবে, ইহাদের বৈচিত্র্যও দূরীভূত হইবে।

সাহিত্যকে প্রকৃতির মত বৈচিত্র্যময়, প্রকৃতির মত লতায় পাতায়, সৌরভে সঙ্গীতে, সুন্দরে মহতে পরিবৃত,—প্রকৃতিরই মত একত্বমূলক বহুত্বেপরিব্যক্ত দেখিলে তবে বলিতে পারি, 'ইহা একটী সমগ্র, পুষ্টদেহ সাহিত্য।' ভাবের বন্ধনহীন, সীমাহীন বৈচিত্র্যের বিকাশ হইতে হইলে, জ্ঞানকেও তেমনই হাওয়ার মত উন্মুক্ত, দিগন্তব্যাপী করিয়া দিতে হইবে। দোকানের বা আফিসের সংকীর্ণতার মধ্যে সুস্থ, সবল সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে কি না জানি না। মুক্ত আকাশ যে দেখে নাই, প্রকৃতির বিশাল রাজ্য যাহার নিকট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, জানি না, সাহিত্যে সে কি ভাবসম্পদ্ উপহার দিতে পারে! বিশ্বের বিশাল বস্তুসমষ্টির জ্ঞান যাহার নাই, তাহার নিকট ভাব-বৈচিত্র্য প্রত্যাশা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মত।

সাহিত্যের ভিতরেই যখন শ্রেণীভেদ করা হয়, তখন রসাত্মক, চলিত ভাষা-বিন্যাসকেই মাত্র সাহিত্য বলা হয়, একথা আমরা স্বীকার করি; এবং এ সাহিত্যের যে প্রধান অবলম্বন ভাবের বিষয়, তাহাও স্বীকার্য্য; কিন্তু ভাব এইখানেও একমাত্র অবলম্বন নয়; অপ্রধান হইলেও জ্ঞান যে এখানেও একটী অবলম্বন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অন্য অর্থে, সাহিত্য জাতির সমগ্র চিন্তা ও ভাবরাজ্যের প্রতিচিত্র। অভাবের কথা যখন তুলি, তখনই বুঝিতে হইবে যে সাহিত্যে অনেক জিনিসই থাকা দরকার, সবগুলি আছে কি না তাহাই জানিতে চাই। এই অনেক সামগ্রী আর কিছুই নয়—নানাবিধ, বিচিত্র ভাবের সমাবেশ এবং এই ভাব উৎপাদন করিতে পারে এইরূপ বহুবিধ জ্ঞান-রত্ন।

বীর্য্যবান্ যে সাহিত্য তাহাতে একটা অদম্য প্রকাশ-চেষ্টা থাকিবে। পৃথিবীর উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি যে জাতি আপন করিয়াছে, তাহার সাহিত্যেও তাহার স্থান হইবে। সুতরাং বহুবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র ভাব যে সাহিত্যে প্রকাশ না পায়, সে সাহিত্যকে উন্নত মনে করিতে পারি না। সাহিত্য পাঠ করিয়া যদি বহু জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয়, যদি বহু ভাবের অনুভূতি হয়—এক কথায়, যদি একটা বিশালতার ভাব মনে জাগে, তবেই বলিব সাহিত্য সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। চরম উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, এই সৌষ্ঠব সাহিত্যমাত্রেরই হইতে পারে।

এক্ষণে, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সৌষ্ঠব আছে কি না তাহাই বিচার্য্য। বাঙ্গালা যে কোন কোন বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমূহের সমকক্ষ, রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার পর আর কেহই সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু এইখানে একটু বিশেষত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তিতে এই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি কতকগুলি ভাবসম্পদ্ পৃথিবীকে দান করিয়াছেন;—সৌভাগ্যক্রমে, সেইগুলি বাঙ্গালায়ই প্রথম প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে এ কথা প্রমাণিত হয় নাই। বরং সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অঙ্গ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে।

বাঙ্গালীর যেমন কেমন একঘেয়ে উদ্দেশ্যবিহীন জীবন, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তেমনই কেমন একটা উদ্দেশ্যবিহীন স্রোত চলিয়াছে। জীবনে যাহার একটা স্থির উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সহস্র কাজের ঘূর্ণার ভিতর দিয়াও সে তাহার উপর দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া থাকে; এবং তাহার সমস্ত কার্য্যই পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ,সমস্তই চরম উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র। আর, যাহার সে রূপ কোন স্থির উদ্দেশ্য নাই, বাত্যাহত তৃণের ন্যায় সে জীবনের কর্ম্মের ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়া মরে। বাঙ্গালা সাহিত্যেও কতকটা অপস্মার রোগীর অঙ্গবিক্ষেপের ন্যায় ইতস্ততঃ কতকগুলি সাহিত্যিক-চেষ্টা ছড়াইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু নিতান্তই সাময়িক সংকোচ ও বিস্তার ভিন্ন ইহাতে স্থির, পরস্পর-সম্বন্ধ, পূর্ণাবয়ব, সংযত আকার এখনও ভাল করিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের ক্ষীণাবস্থায় যেমন প্রত্যেক অঙ্গই অল্পবিস্তর স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সমস্তের ভিতর একটা দৃঢ় ঐক্যবন্ধন অনুভূত হয় না, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তেমনই চারিদিকেই অল্পবিস্তর চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তেমন দৃঢ় বন্ধন, তেমন পূর্ব্বাপরসংলগ্ন, সংযত অথচ সবল জীবনের অস্তিত্ব বড় দেখা যায় না। সকলেই আপন মনে সাধনা করিতেছেন; এমারতের অন্যান্য অংশে যাহারা কার্য্য করিতেছেন, তাহাদের প্রতি যে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে এমন বোধ হয় না। অবশ্য বছর বছর যে এইরূপ সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তদ্বারা ঐক্যসম্পাদনের যথেষ্ট সহায়তা হইতেছে সন্দেহ নাই; তথাপি এখনও সাহিত্যের ভাষাটাই যে ভাল করিয়া ঠিক হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে বন্ধন খুব পাকা হয় নাই।

এমন অনেক সাহিত্যসেবী আছেন যাঁহারা সংস্কৃত বা অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণে অসমর্থ, অথচ শব্দ নির্ম্মাণেও অপটু; তাঁহারা একটু আধটু লিখেন বলিয়াই এমন কি সাতখুন মাপের অধিকারী হইলেন যে, যে কোন দুর্ব্বোধ্য প্রাদেশিক শব্দ দ্বারা ভাষাটাকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া ফেলিতে পারেন? অথচ, এইরূপ লোকের অভাব নাই। বিশেষতঃ কলিকাতায় যাদের নিবাস তাঁরা ভাবেন যে, যেহেতু কলিকাতায় তাঁদের বাড়ী, তাঁদের ঝি-চাকরের ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে। লণ্ডনের বিলিংস্-গেটের ভাষাকে

ইংরেজের সাহিত্যে তুলিয়া দিলে, ইংরেজ কি বলিবে জানি না। কিন্তু সাহিত্যটা কাহারও নিজস্ব নয়; ইহার ভাষা যথাসম্ভব সার্ব্বজনীন হওয়া উচিত। আমরা অস্বীকার করি না যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দোষের অনেক উপশম হইয়াছে; তথাপি, এখনও প্রচুর বাকী।

ভাষাগত এই দোষ ছাড়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটা দোষ আছে, যাহার কথা বলিতে একটু সংকোচ বোধ হয়; কারণ, এ দোষ নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করা শক্ত। সে রোগটী আর কিছু নয়,—আমাদের সর্ব্বত্রই যেন কেমন 'আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট' ভাব। ইহাতে নিতান্তই জীবনের হীনতা ও দৈন্য প্রকাশ পায়। অবশ্য, আমরা ছোট নই মনে করায় আত্মপ্রতারণা আছে; কিন্তু সাহিত্যে এ ভাবটা একেবারে ছড়াইয়া পড়িলে মনে হইবে, এটা বুঝি চিরন্তন সত্য—বুঝি আমরা ছোট থাকিবার জন্যই ছোট হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি—বুঝি বড় হওয়া আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই মোলায়েম ভাবটীকে উপহাস করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গায়িয়াছিলেন যে, ভারতের অন্য জাতি যেখানে 'জয় সীতা-রাম' বলিবে, বাঙ্গালী সেইখানে বলিবে 'শ্রীরাধিকে! চারটী ভিক্ষে পাই গো?' এই দৈন্যভাব যে একেবারেই অহেতুক এমন বলি না; কিন্তু ইহার সর্ব্বত্র বিস্তারেরও কোন হেতু নাই। অথচ এ ভাবটী যে সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িতেছে, তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ, আমাদের নিজের বিচারশক্তিতে একান্ত অবিশ্বাস। ইউরোপীয় নজীর না পাইলে আমাদের একটা কিছু বলিতে বড় ভরসা হয় না; আমাদের পাণ্ডিত্য অর্থ নজীরের বোঝা। ফলে, এমন অনেক প্রবন্ধ রচিত হয় যেখানে গাত্র অপেক্ষা অলঙ্কারের বোঝা ভারি,—প্রবন্ধ হইতে তাহার পাদটীকা বড়।

আমরা যে বুদ্ধিটুকুও পরের দুয়ারে বিকাইয়াছি ইহাই দুঃখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বকর্ম্মা দিবারাত্র খাটিয়া যে নিগড় তৈয়ার করিতেছেন, তাহাদ্বারা সমস্ত দেশের বুদ্ধিটাকে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। চিরকালই পণ্ডিতমণ্ডলীর একটা সংসদ্ হইয়া আসিতেছে;—নৈমিষ্যারণ্যে তাহা ছিল, নালন্দায় তাহা ছিল। এখনও সব দেশে, জর্ম্মেনীতে বিশেষতঃ, বিশিষ্ট পণ্ডিতদের ক্রিয়াস্থল বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং কলিকাতায় যে তাহা হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। কিন্তু আমাদের কেমন বিক্রীত, শৃঙ্খলিত অস্তিত্ব। আমাদিগকে অন্যদেশ হইতে কেহ না বলিয়া দিলে কোনটাকেই নির্দ্ধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এই যে সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যাচার্য্য' (ডি, লিট্) উপাধি দিলেন, ইহাতে কি সেই শৃঙ্খলিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব্বেও চিনিতেন; রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া নূতন বিশেষ কিছুই লেখেন নাই; বরং, পুরাণ লেখাই ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া ইউরোপকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু, অদৃষ্টের ফের! এই

অনুবাদের জোরেই তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পাইলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তখন বুঝিলেন, তবে ইনি বড় কবি বটেন! সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসিবামাত্র গরম গরম ডি, লিট্ তাঁহার লভ্য হইল! অবশ্যই একথা কেহ অস্বীকার করিবে না যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে ক্রিয়া আমাদের কতকটা শৃঙ্খলিত থাকিবেই; কিন্তু যেখানে বুঝি কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য, সেখানেও অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে হয় এই যা দুঃখ।

তবুও যা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের আইন-কানুন অনুসারে, তাহারই গণ্ডীর ভিতরে, আলোচনা ও গবেষণা কতকটা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যে তাহাও আছে, এমন বোধ হয় না। এক জাতীয় গবেষণা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে চলিতেছে, তাহার কথা পরে বলিব; কিন্তু বাস্তবিক সারবান্ চিন্তাশীলতা যে খুব বেশী আছে, একথা বুকে হাত দিয়া বলা চলে না। বরং, ইংরেজীতে যিনি দুই ছত্র লিখিতে তিনবার ব্যাকরণের কথা, অলঙ্কারের কথা ভাবিবেন, বাঙ্গালা এতই অনুকম্পার পাত্র যে, বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে ব্যাকরণের কথা দূরে থাকুক, অর্থের কথাও সব সময় ভাবিতে হয় না। বাঙ্গালায় ব্যাকরণের কথা শুনিলে অনেকেরই নাসিকা কুঞ্চিত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালা লেখায় যে একটা নিয়ম ও সংযম থাকিতে পারে, এ কথাটা অনেকে আদৌ বিশ্বাস করিতে চান না। বাঙ্গালায় অনেক লেখকেরই লেখা সমালোচনা দূরে থাকুক, সান্বয় পদ-নির্ব্বাচন করিতে গেলেই চুরমার হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা লিখিত আরম্ভ করিলেই অনেকে আপনাদিগকে একেবারে প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়া ফেলেন, এবং তাঁদের যে কোন নিয়ম মানা উচিত, এ কথা মনে স্থান দেন না। কারণ, বাঙ্গালা যিনি লিখেন, তিনি নিরঙ্কুশ, এবং প্রায়শঃই কবি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ইংরেজী পড়ি, জানি না বাঙ্গালার ক'খানা বই সেই ভাবে পড়া যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার তত উচ্চ আসন হইতে পারে না; বাহিরে বাঙ্গালা মত্তহস্তীর পদানত কদলীবন। শাসন আমরা সর্ব্বত্রই মানিয়া আসিতেছি; সাহিত্যে আমাদের হওয়া উচিত সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন; কিন্তু পরম দুঃখের কথা এই যে, এইখানে আমরা সকলেই দুঃ-শাসন।

ইংরেজী বিদেশী ভাষা; সব সময় আমরা তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ না করিতে পারি; কিন্তু চিন্তাটা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব; এই চিন্তাকে গোছাইয়া ইংরেজীতে প্রকাশের চেষ্টা করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যাইবেন, বাঙ্গালায় অনেক সময় তিনি প্রতিভার দাবী করেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। প্রকাশের তারতম্য ধরিতেছি না; চিন্তার যে সামঞ্জস্য ইংরেজীর বেলায় অভাবে গণ্য, বাঙ্গালার বেলা তাহা কোথা হইতে আসে জানি না। আসল কথা, বাঙ্গালা মাতৃভাষা বলিয়া শব্দের উপর কতকটা আধিপত্য আছে; সুতরাং ভাব হউক বা না হউক, অমনই তাহা প্রকাশ করিতে বসি, এবং ফলে,

এমনই এক শব্দচ্ছটা রচনা করিয়া ফেলি যে, 'নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝবে কি তা অন্যে।' এক নবীন কবি একবার বর্ত্তমান লেখককে তাঁহার একখানা কাব্য পড়িতে দেন; একাধিকবার পড়িয়া তাহার একটা মানে দাঁড় করাইয়া কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল 'আপনার কি এই মানে'? কবি উত্তরে বলেন, 'এ মানেও হয় বটে, তবে আমার মানে একটু স্বতন্ত্র।' 'এ মানেও হয় বটে'—ইহার মধ্যে একটা গূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। কবিরা ভাবেন, এমন করিয়া লিখিব যে যদি আদৌ কোন মানে হয়, তবে যে কোন মানেই হইবে; এক একটী কবিতা যেন বিশ্বরূপ ভাগবান্, যাহার যেরূপ ইচ্ছা উপাসনা করুক।

কোথা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এক গবেষণার তুফান উঠিয়াছে, যাহার মত্ত ক্রীড়ায় সাহিত্যের অভাব পূরণ না হইয়া আবর্জ্জনাই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিহাসেই এই অনুসন্ধিৎসার একান্ত—বিকাশ নহে, বিকার দেখা যায়। চারিদিকে নানা জেলার, নানা পরগণার, নানা সহরের ইতিহাস বাহির হইতেছে; অবশেষে হয় ত দেখিব প্রত্যেক লেখকই নিজের গ্রামের, নিজের পরিবারের এবং ঐতিহাসিকতার চরম অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, নিজেরই ইতিহাস লিখিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন। কিন্তু ইতিহাসে যে কি থাকা উচিত, তাহাই এখন পর্য্যন্ত অনেক লেখক ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই। রোম একটী সহর মাত্র; তাহার যখন অত বড় ইতিহাস হইতে পারে, তখন অনেকে মনে করেন, আমার সব্‌ডিবিসন্ সহরটী বা আমার পরগণাটীর ইতিহাস হইবে না কেন? কালে হয় ত দেখিব কেহ সুন্দরবনের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে কিছু লিখিতে হয়; পৃথিবীতে যখন আমার সহরটীর লোক কিছুই করে নাই, তখন কি লিখিয়া ইহার ইতিহাস ভরিব? না, ক'খানা ঠিকা গাড়ী, কয়টী ডাকঘর, কয়টী থানা ইত্যাদি। আমবা একটী ইতিহাসেব সূচীপত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি;—"একাদশ অধ্যায়। মৎস্য, পশু, পক্ষী; সরীসৃপ, প্রভৃতি।" আর ঐ অধ্যায় হইতে দুই ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—"পদ্মার ঢাইন ও ইলিশ মৎস্য এবং ধলেশ্বরীর ইলিশ মৎস্য সুস্বাদু।" অপিচ, 'শিশুকের তৈল বাতরোগের অমোঘ ঔষধ।' রোম গ্রীসের ইতিহাস মানুষের ইতিহাস; মাছের ইতিহাস বোধ হয় এই প্রথম আরম্ভ। আর একটী অধ্যায়ের নমুনা দেখাইতেছি;—"উনবিংশ অধ্যায়। মিউনিসিপালিটী, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো; ঠিকাগাড়ী; জেলাবোর্ড; লোকাল বোর্ড; গুদারা; পাউণ্ড; পাগলাগারদ; টাকশাল; হাঁসপাতাল; রেল; ষ্টীমার; গহেনা; ডাক।" এবং এই অধ্যায়ের গভীর প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় কোন্ স্থান হইতে গহেনা কতবার ছাড়ে এবং কোথায় কত ভাড়া ইত্যাদি। অতঃপর, 'গুপ্তপ্রেশ' পঞ্জিকার পীঠস্থানের ভাড়ার হিসাবটী কেন বোড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীতে স্থান পাইবে না, কেহ বলিতে পারেন কি?

আর একজন ঐতিহাসিক তাঁহার পরগণার ইতিহাস লিখিতে গিয়া অনেক গবেষণার পর এক লুপ্ত-রত্ন উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেটী আর কিছু নয়,—সে পরগণার স্ত্রীলোকেরা কীরূপে শোকপ্রকাশ করে। অনেকে হয় ত জানিতে না পারেন যে, সেখানের স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়াই শোক প্রকাশ করে; এবং বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, তারা চীৎকার করিয়া কাঁদে। গ্রন্থকার এই সংবাদ দিয়া মন্তব্য করিতেছেন যে, চীৎকার করিয়া কাঁদায় সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, কারণ পরিবারের ছেলেরা শিশুকাল হইতেই চীৎকারের ধ্বনিতে মৃত্যুকে ভয় করিতে শিখে। বীরোচিত মন্তব্য বটে!

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া কিছু লাভ নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে দু'একখানা ছাড়া ইতিহাস নামের উপযোগী গ্রন্থ এখনও নাই। কিসে যে ইতিহাস হয়, আর কিসে হয় না, একথাটাই এখনও অনেক গবেষণাশীল মস্তিষ্কে ঢুকে নাই। অশোকের প্রস্তরলিপি হইতে ভারতের ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড অধ্যায় রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যেখানেই একটা ভাঙ্গা নষ্টপ্রায় ইট বা পাথরে দুই একটা অস্পষ্ট অক্ষরের টান দেখা যাইবে, সেখানটাকেই যদি একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক-ক্ষেত্র কল্পনা করা হয়, আর প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ডিকেন্‌সের পিক্‌উইকের আর অপরাধ ছিল কি? ঐতিহাসিক বাক্‌ল্ ইতিহাসের যে আদর্শ ধরিয়াছেন, সে অনুসারে তাঁরই মতে তাঁর সময়ে সমস্ত ইউরোপের সাহিত্যে তিনখানা কি চারিখানার বেশী মৌলিক ইতিহাস ছিল না। আমরা অতবড় দাবী করি না; কিন্তু বাঙ্গালী লেখক যাহাতে না মনে করেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা ছাপিয়া দিবেন, তাহাই আমরা সাদরে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিব, এইটা আমরা চাই।

এ সমস্ত একটা উদ্দাম, অসংযত ভাবের ফল। ইতিহাসে আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে; কিন্তু এগুলি দ্বারা সে অভাব বিশেষ মোচন হইতেছে, এমন বোধ হয় না। নিজের দেশের ইতিহাস ত সাহিত্যে থাকিবেই; কিন্তু তার অর্থ দেশের প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস নয়। তেমন খ্যাতনামা যাঁরা আছেন, তাঁদের জীবনী হইতে পারে; আর দেশের ইতিহাসে তিনি যাহা করেন, সে ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখ থাকিবে। জমীদারদের দাঙ্গাহাঙ্গামা বা জীবনী ছাড়া অন্য রকম ইতিহাসের আমাদের দরকার বেশী। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রের খুব বড়াই শোনা যায়, কিন্তু তার কোন ইতিহাস আছে কি? হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিরই ভাল ইতিহাস কোথায়? হিন্দুর রসায়নের ইতিহাসই বা বাঙ্গালায় কোথায়?

ইতিহাস ছাড়া, দর্শন, বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েরও বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্ট অভাব। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে যে এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান নাই, তা নয়। জ্ঞান যথেষ্টই আছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহা প্রকাশ পায় না। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ অথবা

যাঁহাদের কিছু বলিবার আছে তাঁহারা ইংরেজীতে বলাই শ্রেয়ঃ মনে করেন, কারণ তাহা হইলে একটী বৃহত্তর জগতের কাছে বলা হয়। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর বিচারশক্তির উপর বাঙ্গালীরই আস্থা কম। কিন্তু আসল কথা, আমাদের জীবনে কোন সমস্যা নাই, কোন প্রশ্ন নাই। সারবান্ সাহিত্যের প্রত্যেক গ্রন্থেই যে নূতন কথা থাকিবে, এমন নয়; পুরাণ কথারও ত আলোচনা করিতে হয়, নূতন করিয়া বলিতে হয়। আমাদের যে তাহাও হয় না, তাহার কারণ আমরা কোন সমস্যার ধার ধারি না। পরীক্ষার জন্য যাহা দরকার ছিল, তাহা জানিয়াছি, এবং ঐখানেই আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে একটা জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রশ্নগুলিকে আপন করিয়া জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। অস্বাভাবিক কৌশলে ইহার সৃষ্টি হয় না। যেমন অর্থনীতি;—অর্থনীতি সম্বন্ধে একটা সারবান্ সাহিত্যের জন্ম হইতে হইলে সমাজে অর্থোৎপাদনের যে সমস্ত উপায় আছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা চাই,—কিসে অর্থ উপার্জ্জন হয়, কিসে সেটা সমাজের সকল স্তরে বিতরিত হয়, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন আমাদের মনে উঠা চাই। এ সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা ভাবিতে না চাই, তবে কেহ বলিবে না, বলিলেও কেহ শুনিবে না। আমাদের অর্থোপার্জ্জনের যে একমাত্র পন্থা আছে অর্থাৎ চাকরী, তাহাতে দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যের আবশ্যক করে না।

দর্শনেও তেমনই;—আমাদের মনে যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিজস্ব কোন প্রশ্ন উদিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের দার্শনিক সাহিত্য অজ্ঞাত থাকিবে। ইচ্ছা করিলে আমরা অন্য ভাষা হইতে পুস্তকের অনুবাদ করিতে পারি; কিন্তু কেবল তাহা দ্বারা একটা সাহিত্য করাও যাহা, কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া কেবল ভোজ্য পেয় দ্বারা উৎসব সম্পন্ন করাও তাহাই। কেহ যদি না ভাবে, একটা আলোচনা যদি না হয়, তবে শুধু অন্যের মত জানিবার জন্য অনুবাদেরও আবশ্যক করে না; কারণ, যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা অন্ততঃ ইংরেজীভাষায় অভিজ্ঞ।

অনুবাদের একটা উপকারিতা আছে, স্বীকার করি। তাহাতে অন্যের চিন্তা অন্ততঃ সেই ভাষায় প্রায় অনভিজ্ঞদের মনে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলি যদি আমাদের নিজেরও প্রশ্ন না হয়, তবে তাহা দ্বারা একটা নিজস্ব সাহিত্য হইতে পারে না। আর, দর্শনশাস্ত্রে অন্ততঃ বাঙ্গালী যে কেন অনুবাদের প্রতীক্ষা করিবে, বুঝি না। দর্শনের প্রশ্ন চিরন্তন প্রশ্ন—ভারতবাসীর তাহা অতি পুরাতন জিজ্ঞাসা। প্রত্যেক যুগেই নূতন করিয়া, জীবনের নূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মিল করিয়া, সেগুলির নূতন আলোচনা করিতে হয়। দর্শনের সমস্যা কখনও মৃত হইতে পারে না। মানুষ যতদিন চিন্তা করিবে, ভোজনাদি নিত্য ব্যাপারের বাহিরে যতদিন মানুষের বুদ্ধি খেলিবে, ততদিন দর্শনের আয়ু। ইহা সত্ত্বেও, আমাদের দেশে মাসিক সাহিত্যের বাহিরে যে দর্শনের বড় চর্চ্চা নাই, ইহাতে আমাদের জীবনেরই হীনতা স-প্রমাণ হয়।

দর্শনের ন্যায়, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়েও বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র। ধর্ম সম্বন্ধে অনেক রকম সভা সমিতি, অনেক আশ্রম, অনেক সমাজ, এদেশে আছে, বটে; তবে অধিকাংশ স্থলেই এ সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রচারের চেষ্টার রূপান্তর মাত্র। সম্প্রদায় বিশেষের মত-প্রচারের চেষ্টাও একটা জিনিস বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। সাহিত্যসৃষ্টি করিতে হইলে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে স্বাধীন অথচ সংযত ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হয়; ইহাতে চিন্তা চাই, সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা চাই, প্রচারের চেয়ে জানার চেষ্টা বেশী চাই। জানিতে হইলেই আলোচনা দরকার, অন্যের মতের প্রতি সম্মান দেখান দরকার। অবশ্য, নিজের মতও পরকে বলিতে হয়; কিন্তু এই মতগঠনের মূলে যুক্তি থাকা উচিত, স্বার্থ বা সুবিধা নহে। আমাদের দেশে যেমন ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা ছিল না, তেমন তাহার জোয়ার আসিয়াছে। এমন স্থান খুব কম দেখিয়াছি যেখানে অমুক সভা বা অমুক আশ্রম না আছে; কিন্তু তথাপি বাঙ্গালাসাহিত্য ধর্ম্মতত্ত্বে দরিদ্র কেন? না, আমরা ধরিয়া লইয়াছি সত্য আর আমাদের বুঝিবার বাকী নাই এখন প্রচারই যা দরকার। কোন প্রশ্ন আমাদের নাই, কোন মীমাংসাও আমাদের করিতে হয় না; কতকগুলি কথা কেবল মুখে আওড়াই মাত্র। অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি আমরা বাহিরে আড়ম্বর-পূর্ণ, ভিতরে ফাঁকা।

সমাজসংস্কারের জন্য বছরে যে কত সভা হয়, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তার একটা প্রকাণ্ড অংশ দখল করিয়া আছে যে সমাজতত্ত্ব, সে বিষয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য এত দরিদ্র কেন? তাহার কারণ, একটু বক্তৃতা করিয়া যত সহজে যত বেশী পরিচিত হওয়া যায়, একখানা বই লিখিয়া তত সহজে তাহা হয় না; আর, বই লিখিতে হইলে যত ভাবনা চিন্তার আবশ্যক, বক্তৃতায় তত দরকার হয় না। আসল কথা, আমরা সকলেই 'বেশ আছি' কোন প্রশ্ন আমাদের মনকে উৎপীড়িত করে না, কোন চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষয় করিতেছে না; তুমি আমি মিলিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে একটা আলোচনা ও পরামর্শ করিব এমন কোন বিষয় আমাদের নাই; মাঝে মাঝে একটা কিছু লইয়া হৈ চৈ করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি মাত্র। আর সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়া আমরা করিব কি? প্রশ্ন যদি কিছু থাকে, সে ত গবর্ণমেন্টের বিচার্য্য, আমাদের কি?

একটা জাতির সাহিত্যে দুই প্রকার সম্পদ্ থাকে, এক ভাবসম্পদ্, আর জ্ঞানসম্পদ্। কোন্ সম্পদে আমরা কত হীন, উপরের কয়েকটী নামেই তাহা বুঝা যাইবে। ভাবসম্পদে আমাদের সাহিত্য একদিকে খুব পুষ্ট, এ কথা মানিতেই হইবে। কাব্যের যা প্রধান অবলম্বন,—সৌন্দর্য্য ও প্রেম, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত যে মানবচিত্তের নৈকট্য ও সহানুভূতি, তাহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে যথোচিত আছে। কিন্তু জ্ঞানের দিক্‌টী অপুষ্ট থাকায়, গভীর তত্ত্বের অনুসন্ধানে

যে ভাব মনে উপস্থিত হয়, তাহার অভাব এখনও রহিয়াছে। বাঙ্গালার উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা উপলব্ধি না হইয়া পারে না। আমাদেব উপন্যাসের ভিতর এক স্ত্রী-পুরুষের প্রেম ছাড়া আর কিছু খুব কম পাওয়া যায়। অবশ্য, যে জাতির চরম উদ্দেশ্য ডেপুটি-গিরি, তাহার জীবন বর্ণনা করিতে হইলে ক্রিয়াবৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্য পাওয়াও দুষ্কর। কিন্তু কল্পনাকে বাস্তবের পূরণে নিযুক্ত করাই উচিত; প্রকৃতপক্ষে যাহা নাই, অথচ যাহা হওয়া উচিত, কল্পনায় তাহার বর্ণনা থাকা উচিত; এবং তাহা হইলে, জাতিরও জীবন সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত ধারণা হয়, এবং ফলে, জীবনটাও একটু পরিসর লাভ করিতে পারে। এই শ্রেণীর উপন্যাসেরও মূল্য আছে। সংসারে কিছুই মূল্যহীন নহে; কিন্তু কেবল ইহা দ্বারা একটা পুষ্ট কল্পনা-সাহিত্য রচিত হয় না।

আবার, যেখানেই কেহ বাস্তব জীবন ছাড়িয়া যান, সেখানেই কল্পনার রশ্মি একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঈসপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র বা আরব্য-উপন্যাস-জাতীয় কল্পনা-সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকৃষ্ট উপাদান, এরূপ মনে করিতে পারি না। ডিকেন্‌স্, জর্জ্জ ঈলিয়ট বা ভিক্টর হিউগো প্রভৃতির উপন্যাসে যেরূপ জ্ঞান ও ভাব পাওয়া যায়, বাঙ্গালার উপন্যাসে কদাচিৎ তাহা মিলে। উপন্যাসেও কত আদর্শ, ধর্ম্মসমাজ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত জ্ঞান লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়; 'টম কাকার কুটীর' পৃথিবীর কম উপকার করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ চেষ্টা বিরল।

উপন্যাসে যেমন, নাটকেও তেমনই আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ। রঙ্গমঞ্চের করতালি ব্যতীত এ দেশের নাটকের অন্য কোন উদ্দেশ্য কম দেখা যায়।

প্রবীণ জ্ঞান ও গভীর ভাবের কথা ছাড়া বাঙ্গালার আর একটা অভাব আছে, যাহার কথা সে দিন 'প্রবাসী' সম্পাদক উল্লেখ করিয়াছেন। "আমাদের বনের কাঠুরিয়া, সুন্দরবনের ও নদীচরের চাষী, আমাদের পদ্মা মেঘনার মাঝি মাল্লা, আমাদের সমুদ্রগামী লস্কর, ইহাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে এখনও স্থান পায় নাই।" বাঙ্গালার জাতীয়-জীবন খুব ঘটনা-বহুল নহে, তথাপি যা কিছু ঘটনা হয়, তাহাও ত সাহিত্যে স্থান পায় নাই। জাতিটাকে সম্পূর্ণরূপে,—তাহার বিবিধ ক্রিয়া ও ভাব, যে পর্য্যন্ত সাহিত্যে চিনিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যকে অপুষ্ট মনে করিতে হইবে।

জ্ঞানের দিকে আমাদের অভাব আছে। অনেকে মনে করেন অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ দ্বারা এ অভাব মোচন হইতে পারে। আমার মনে হয়, ইহা ঠিক স্বাভাবিক উপায় নয়। সাহিত্য মাত্রেই অনুবাদ অল্পবিস্তর আছে, কিন্তু কেবল তাহা দ্বারা কোন স্থায়ী উপকারের আশা কম। আমরা নিজেরা যদি একটু আধটু ভাবিতে চেষ্টা করি এবং যাহা ভাবি তাহা যদি দীনা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করি, তাহা হইলে যতটা উপকার হইবে, তেমন আর কিছুতেই হইবে না। এই বিষয়ে, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য আবশ্যক,

আর আবশ্যক বাঙ্গালী পাঠকদের একটু ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা। অনেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক দর্শন, বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁহারা গোড়ায়ই দাবী করিয়া বসেন যে প্রবন্ধ এমন করিতে হইবে যেন সকলই বুঝে। তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে সকলের সকল বিষয়ে অধিকার নাই। এ দেশে চিরকালই অধিকারী বিচার হইয়া আসিয়াছে, সাহিত্যে কেন তাহা হইবে না? তার পর, কোন গভীর বিষয় বুঝিতে হইলে পূর্ব্বেরও কিছু সঞ্চিত বিদ্যা চাই। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় সব সময় এ কথাটা মনে রাখা হয়, এমন বোধ হয় না। একদা একজন মাসিক-সাহিত্য সম্পাদক কোনও খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট হইতে এক দার্শনিক সম্প্রদায় বিশেষ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাইয়াও ছাপেন নাই; কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, প্রবন্ধটী ভাল হয় নাই। কিন্তু সেটী কি, কোন সম্প্রদায় না ব্যক্তিবিশেষেব দার্শনিক মতের আলোচনা, তাহাই তিনি জানিতেন না।

উপার্জ্জিত বিদ্যারূপ মূলধন বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে খাটিতেছে না। একটা সতেজ চিন্তাশীলতা ও বিশিষ্টদের উপার্জ্জিত জ্ঞান— এ দুইটী সাহিত্যসেবায় প্রচুর পবিমাণে নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্যের জ্ঞানসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে না। আর, পাঠকদেরও মনে রাখা উচিত যে, ইংবাজিতে যার কোন মানে হয় না, তাহারও মানে বুঝিবাব জন্য তাঁহারা যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালায় লিখিত বিষয়টী না পড়িতেই অর্থটী তাঁহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে, এ আশা করা অন্যায়। বাংলায়ও কঠিন—অর্থহীন নহে, গূঢ় অর্থপূর্ণ—বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে, একথা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত। পণ্ডিতেরা যদি বাঙ্গালাকে একটু অনুগ্রহ করেন, আর জ্ঞানপিপাসু পাঠকেরা যদি বাঙ্গালাকে একটু শ্রদ্ধা করেন, তবেই বাঙ্গালার জ্ঞানসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে।

দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানরাশি বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দেরও প্রয়োজন হইবে। কিন্তু সে জন্য প্রকাশযোগ্য কোন চিন্তা আমাদের মনে না জন্মিতেই কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করাও যা, ঘোড়াটাকে গাড়ীর পিছনে বাঁধিয়া গাড়ী টানানও তাই। কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা নাই, অথচ কোন্ দিন চেষ্টা হইবে এই ভরসায় শব্দ প্রণয়ন করা অজাতপুত্রের নামকরণ তুল্য। প্রকাশ করিতে চেষ্টা আগে হওয়া উঠিত; তারপর, দরকার মত বাধ্য হইয়াই শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং তাহা হইলে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটীও সমাজে চলিয়া যাইবে। অজাত ভাষার কেহ অভিধান তৈয়ার করিতে পারে না। আমার মনে হয়, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি সুধীমণ্ডলী যদি পরিভাষা সংগ্রহের ব্যবস্থা না করিয়া সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশের সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবের নিয়ম মানিয়া চলা হইত। বিলাতের অনেক কোম্পানী বিভিন্ন দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ছোট ছোট হস্ত-পুস্তিকা প্রকাশ

করিয়াছেন; তাহাতে ঐ সব বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি যদি তাহা করিতেন তবে বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি হইত; সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব বিষয় প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাটিও গঠিত হইয়া আসিত।

জ্ঞানসম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবসম্পদ্ কতকটা আপনা আপনি বৃদ্ধি পাইবে। আমার মনে হয় কেবল এক জাতীয় কাব্য দ্বারা তাহা হইতে পারে না। কবির সংখ্যা বাঙ্গালায় যত অধিক, প্রকৃতপক্ষে ওজস্বী কবির সংখ্যা তার অনুপাতে কিছুই নহে। দেখা গিয়াছে, অনেকে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভই করেন, কবিতা লইয়া। জানিনা সেটা কতদূর ঠিক। কেহ হঠাৎ কবি হইতে চেষ্টা না করিয়া উদীয়মান কবিরা যদি একটু ধীরে সুস্থিরে ভাবটীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তবে ভাল হয়। যাহা নিজস্ব নয়, তাহা কাহারও দানের অধিকার নাই। নীহার তুল্য ভাবটীকে একটু কাঠিন্য লাভ অবসর দেওয়া উচিত। কবিরা একটা ঐশ প্রেরণার অধিকারী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যদি মনে করেন যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের কলম চালাইয়া লইবেন, তবে তাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধীন হইবেন না, একথা বলিতে পারি না। নব্য কবিদের মধ্যে এরূপ কবির সংখ্যা কম নয় বলিয়াই কথাটা বলিতে হইল।

বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থার একটু বিশেষত্ব আছে। সেইজন্য আর একটা অভাবের এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও প্রধানতঃ হিন্দু-সাহিত্য। মুসলমান চিন্তা, মুসলমান ভাব ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সাহিত্য হইবে না। মুসলমানেরা যে কেন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর দাবী ছাড়িয়া দেন বুঝি না। হয়ত হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতে চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া অনেকটা দখল করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের ন্যায্য পাওনা সবটুকুই ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে সে বোধ হয়। হইতে পারে, বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের বিরোধী কথা আছে, কিন্তু ইউরোপের সব সাহিত্যেই কম বেশী পাওয়া যাইবে। ইউরোপের সাহিত্যের চর্চ্চা কেহ ছাড়েন না; তবে বাংলা কি অপরাধ করিল? আর হিন্দুদের বিরুদ্ধ কথাই কি বাঙ্গালায় নাই? হিন্দুরা ত বাঙ্গালা ছাড়েন না। এ ভাবে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা বিপদ নাই, এমন নহে। যদি বিরুদ্ধ কথা সম্প্রদায়বিশেষ দ্বারা কোন ভাষায় রচিত হইয়া থাকে তবে স্বপক্ষের কথাও সেই ভাষায়ই সেই পরিমাণে রচিত হওয়া উচিত; তবেই নিরপেক্ষ বিচারের সুবিধা হয়। তার পর, ভাষাটার কি দোষ? বাংলা ত হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মাতৃ-ভাষা, উভয়েরই সেবা আশা করিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন

বাঙ্গালা ভাষার প্রসার

শ্রী রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালা ভাষা যে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সমসাময়িক হইলে সকলের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবার জন্য স্ব স্ব হৃদয় প্রস্তুত করিয়া থাকে; এরূপ না করিয়া তাহাদের এককালে বাস করা দুঃসাধ্য! এই জন্য উহাদের মধ্যে কোন না কোন একটী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। প্রাকৃত ভাষা-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেশভেদে নানা ভাষার সৃষ্টি হইল। পালী, মারহাটী, মাগধী, ও বাঙ্গালা ভাষার অভ্যুদয় ঘটিল। তখন একে অন্যকে সমবয়স্ক ভাবিয়া প্রীতি ও প্রেমপূর্ণভাবে পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ে দানাদানের কার্য্য চলিতে লাগিল। এ ভাষাটী অন্য ভাষার শব্দ লইয়া আপনার গৃহটী বেশ সুসজ্জিত করিল। অন্য ভাষাটী বলিল, "ভাই! আমার সব ঠিক, কেবল ঐ কথাটী পাইলেই আমি একরূপ নিশ্চিন্তভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি!" অপর সমসাময়িক ভাষাটী যেন প্রতিবেশিনীর ন্যায় সাদর আপ্যায়নে তাঁহার অভাব পূর্ণ করিলেন। গৃহ উজ্জ্বল হইল, যিনি করিলেন তিনিও সুখী, আর যিনি লইলেন তিনি প্রতিবেশিনীর এই প্রীতিপূর্ণ দানে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন! পল্লী-প্রেমের অপূর্ব্ব ক্রীড়া সাংসারিক কর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়া এক অভিনব ভাবে ভাষা-জগতে ফুটাইয়া তুলিল।

এইরূপে বাঙ্গালা-ভাষায় ক্রমে ঐ সকল সমসাময়িক ভাষার—আরব্য, পারস্য, হিন্দী, ইংরাজী, পর্ত্তুগিজ প্রভৃতি, শব্দসকল স্থান লাভ করিল। শেষোক্ত ভাষাটীর অবশ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে আদান প্রদান ঘটে নাই; তবে উহারা ভিন্ন জাতির সহিত বঙ্গবাসীর সংস্পর্শতা হেতু আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া আপনি মিশিয়াছে। উহার জন্য বাঙ্গালা-ভাষাকে ইতিপূর্ব্বে কোন অভাবই বোধ করিতে হয় নাই। তবে ভারত, বিশেষ বঙ্গদেশ, অতিথি-সৎকার করিতে চির-অভ্যস্ত, সেই জন্য আগন্তুক ভাষাগুলিকে নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাদিগের ক্লেশ দূরপনয়নের জন্য সুবিমল বঙ্গ-সাহিত্য-কুঞ্জে আশ্রয় প্রদান করিয়া স্বীয় সুজনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন! উদার-হৃদয়ের অপূর্ব্ব-মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া সে পবিত্র মিলন-ক্ষেত্রে প্রেমের আদান-প্রদান সংঘটিত হইল।

এইরূপে বঙ্গভাষাভাণ্ডে উদার-হৃদয়ের অমূল্য রত্ন পুরস্কার স্বরূপ বহু শব্দ ভাষারত্ন-ভাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল! বঙ্গভাষা দাতা ছিল, কিন্তু দানের মর্য্যাদা বুঝিত না এমন দাতা নহে; সে পাত্র-জ্ঞান অনায়াসেই করিয়া লইতে পারিত এবং "যতই

করিবে দান তত যা'বে বেড়ে" এইরূপ উচ্চবাণী হৃদয়ে পোষণ করিত। এই উচ্চাদর্শের সহিত সে ইহাও জানিত যে, "ধনীরে করিলে দান কিবা ফল হয়? ঔষধ রোগীর পথ্য, নীরোগীর নয়!" এই মীমাংসার বলে সে উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া সেই উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত অর্থব্যঞ্জক বঙ্গের অমূল শব্দরত্ন প্রদান করিত!

এইরূপে ভাষা-জগতে কতকগুলি ভাষার সহিত বাঙ্গালা-ভাষার এমন আদান প্রদান ঘটিয়াছে যে, তাহাদের অবয়ব দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাও কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ ঐ সকল ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অবিচ্ছিন্নভাবে মিশ্রণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ঐ গুলির স্বরূপও এতৎসহ নির্ণীত হইবে।

অবিচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী	শব্দাবলীর স্বরূপ
১. উকীল, মোক্তার, দখল, মালিক, নজর, কাগজ, নকল, মফস্বল, ইত্যাদি	আরব্য শব্দ।
২. দোকান, গোমস্তা, নালিশ, বাজেয়াপ্ত, দারোগা, খরিদ, আমদানী, রপ্তানি, পোষাক, তীর, ইত্যাদি।	পারস্য শব্দ।
৩. বাপ, মা, বাগান, গাছ, বাণী, পাওনা, সরেশ, ভুশী, মালী, ফুল, সকাল, গাধা, ইত্যাদি।	হিন্দী শব্দ।
৪. গেলাস্, ষ্টকিং, ডাক্তার, রেলওয়ে, বাকস্, ব্রুস্, ষ্টীমার, পেন্সিল, বোতাম, শ্লেট, টিকিট ইত্যাদি।	ইংরাজী শব্দ।
৫. কেরাণী, গির্জ্জা, ইস্পাত, ইত্যাদি	পর্তুগিজ শব্দ।

আধুনা ইংরাজীর কতিপয় শব্দে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় অর্থ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য; এবং তজ্জন্য অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়া থাকে। যেমন—ষ্টীমারকে 'জলযান', রেলগাড়ীকে 'বাষ্পীয় পোত', বাক্সকে 'পেটিকা' বলিয়া অভিহিত করি, কিন্তু ঐ সকল যান, পোত বা পেটিকা অর্থে উহার আকার প্রকার নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত শকট, যান প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের আকার প্রকার ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে, এরূপ অবস্থায় উহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সুতরাং ঐ সকল শব্দ অবিকল বজায় রাখা ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার গত্যন্তর নাই।

আমরা এখন দেখিব, সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা-ভাষার সম্বন্ধ কিরূপ। এ কথা স্বীকার্য্য যে, বৈদিক ভাষা হইতে সংস্কৃত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে আমাদের শ্যামাবঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গালা-ভাষা যে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ও সম্পূর্ণ সংস্কৃতের করতলগত এমন প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন। যেহেতু বাঙ্গালাভাষাভাণ্ডে একদিকে যেমন সংস্কৃতমূলক শব্দের সমাবেশ, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতমূলক শব্দ ও বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন ভাষাজাত শব্দের যথেষ্ট সম্মিলন ঘটিয়াছে। তাহার ভাণ্ড পূর্ণ; সে ভাণ্ড কখনও অপূর্ণ রহিবেও না, বা হইবেও না, বরং উত্তরোত্তর পূর্ণত্বের আরও আতিশয্য ঘটিতে থাকিবে, আশা করা যায়।

এক্ষণে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অনেক সময় আমাদের সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়গণ বাঙ্গালা-ভাষার উপর ঐ দাবিটী করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভাষাতত্ত্বদর্শীর চক্ষে ও সূক্ষ্ম মীমাংসকের নিকট অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। আশা করি, তাঁহারা যেন সে প্রত্যাশা ত্যাগ করেন। তবে এমন কথা বলি না যে, বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃত-ভাষার নিকট ঋণী নহে; তাহা নহে। উহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছেই, তাহা মাতা ও কন্যার ন্যায় নহে; তাহা সোদর সম্বন্ধ—পরস্পর পরস্পরের ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা সোদরা—এই সম্বন্ধ এবং ইহাই বাঙ্গালা-সাহিত্যিকগণের অধিকতর বাঞ্ছনীয় বিষয় বলিয়া অনুভব করি। আশা করি, ঐ সম্বন্ধ যেন চিরদিন গঙ্গা যমুনার পুতধারার ন্যায় ভারতে চিরপবিত্র থাকে!

বাঙ্গালা-ভাষার প্রধান অবয়ব

বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তি, প্রসার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে; এক্ষণে আমরা দেখিব, এই ভাষা সৃষ্টির পর হইতে কিরূপ অবয়ব লইয়া শ্যামা শ্যামলা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালা-ভাষা এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতাভিজ্ঞের হস্তেই রহিয়া যায়, তবে মধ্যে মধ্যে দু'চারিজন গ্রাম্য-কবি তৎকালীন গ্রাম্য বা মিশ্রিত বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী প্রভৃতি যাবনিক শব্দ সমন্বিত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে এমনি দুর্ব্বোধ্য যে, বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ সকল শব্দের উৎপত্তি বা অর্থ নির্ণয় করা যায় না। সে স্থলে অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গতি নাই।

ঐ সকল বঙ্গ-কবি বা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে একটু একটু পদ উদ্ধার করিয়া দিলে সম্ভবতঃ সকলেই তৎকালীন বাঙ্গালা ভাষার গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১. প্রাচীন বাঙ্গালা যুগ

গ্রন্থকর্ত্তার বা গ্রন্থের নাম	পদ
১. কবিকঙ্কণ	"চালের ফাড়িয়া খড় জানিল আঁতুড়ি গোমুণ্ড দুয়ারে পূজে যষ্ঠী বুড়ি।।" "শাঁখাশাড়ী সুন্দর চন্দন পান গুয়া। নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভূয়া।" * "আর বাঙ্গাল বলে যে কহিতে বাসি লাজ। ইস্‌দপ্ত গেল মোর জীবনে কি কাজ!"

২. রামেশ্বরের শিবায়ণ

"ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলে বর দিলে আজা।
দিকপাল করি মোরে দিয়াইলে পূজা।।"

*

"আঁটুল বাঁটুল খেলে পসারিয়া পা।"
"ঝিয়ের আঁড়রা হাত জান নাহি তুমি।"

* * *

৩. ঘনরাম

"রাণী বলে তবু কি আঁখির আড় করি।"

*

" এই বনে বড় বৃক্ষে রাখে লুকাইয়া।
বাঘা যেন নাই দেখে আড়ি উড়ি দিয়া।।"
"পেরুতে আডুলি ভাঙ্গি পড়ে যেন জলে।"

* * *

৪. বিদ্যাপতি

"কি কহিব সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।"

*

"নাহি নাহি কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।"
"রোগী করয়ে যেন ঔষদ পান।"

* * *

৫. চণ্ডীদাস

"ফুয়ল করবী মোর, টুটল হার।
হাম অবুজ নারী তুহুঁত গোঙার।"

*

"তবল্লব ছাঁদে, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি।"

*

"শোষণ বাণেতে উপলে চাই
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই।"

*

"এক হাম্ বিদেশিনী, তাহে কুলকামিনী
ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।"

* * *

৬. ভারতচন্দ্র

"পাতসা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায়।।"

*

"টাকা পেয়ে মুঠ ভরা, হীরা পর ধন হরা,
বুঝলে এমন আজ বোঝ।।"
"আর রামা বলে সই এত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী-পতি বড় গুণি।

* * *

৭. কাশীরাম

"যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম জন্ম করিয়া গোবিন্দ লৈয়া কেলি।।"

*

"আমার বচনে যদি প্রত্যয় না মান।
পিতার জাঁয়তি পত্র করহ রচন।"

* * *

"মহাকায় মহাদেব মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে খেতি চরণের ভরে।।"

* * *

৮. কৃত্তিবাস

"খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমালা।"

স্ব

"ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বন উষ্মাকার।"

* * *

"উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান।"

* * *

৯. রামপ্রসাদ

"ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী।
ভোর হলে সে লুকাবেরে।"

*

"দিয়াছ তারা ছটা ইয়ার।
তারা আমায় কল্লে নাচার।।"

*

ফুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা দুটী হাত।"

* * *

১০. আজুগোঁসাই

"এই সংসার সুখের কুটী, যার যেমন মন
তেন্নি ধন, মনকে কর পরিপাটী।"

* * *

১১. নারায়ণদেব (পদ্মাপুরাণ)
"নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈল ভৈন অশক্য কথন।"

* * *

১২. রামমণি
"অনামুখ মিন্সেগুলার কিবা বুকের পাটা।
দেবীপূজা বন্ধ করে কুলে দেয় পাটা।।"

* * *

১৩. আলোয়াল (পদ্মাবতী)
"তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আভাস।
সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীরঃ প্রকাশ।।"

* * *

১৪. যদুনন্দন দাস
"যে জানে সে জানে হিয়া
সে রসে মজিলে ধিয়া।
এ যদুনন্দন ভণয়ে আজুলি,
ওই্ না গোকুল পিয়া।।"

* * *

১৫. দেবকীনন্দন দাস.
"দেবকীনন্দন বলে শুনগো আজুলি,
তুমি কি না জান গোর নাগর বনমালী।"

* * *

১৬. কেতকা ক্ষেমানন্দ দাস,
১. "' বেহুলা রন্ধন করি উলাইল ভাত।
গা তোল ভোজন কর ওহে প্রাণনাথ।"
২. "প্রথমে ত্রিবেণী বাহিয়া চৌদ্দডিঙ্গা।
গাঠ্যার গাবর বাহে বাজে রণঙ্গিনা।।"

* * *

১৭. খনা
"আষাঢ়ে কাড়ান্ নাম্‌কে।
শ্রাবণে কাড়ান্ বান্‌কে।।"

* * *

১৮. গোবিন্দদাস
"ধনী কানাড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী।
মন মালতী মাল তান্তি উপরি।"

* * *

১৯. নরহরিদাস
"প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী।"

* * *

২০. লোচনদাস

"বিশ্বম্ভর নির্ম্মঞ্ছন কর নারীগণ।
জয় জয় হুলাহুলি এ গীত নাচন।"

* *

২১. জ্ঞানদাস

"ফুয়ল কবরী উরে লোটায়।"

* * *

২২. কবিচন্দ্র

"এতদিনে বিপাকে ঠেকালে নারায়ণ!"

* * *

প্রাচীন গ্রন্থের নাম	পদ

১. ধর্ম্মমঙ্গল

"ক্ষেপা কালা হ'ল রাণী বুক নাহি বান্ধে।
ব্যাকুলি আদুড় চুলি শোকাকুলি কান্দে।"

*

"রন্ধন করিতে লবে নব শ্যামা হাঁড়ি।
রাত্রি মধ্যে রান্ধিলে অতিথি তোর বাড়ী।"

* * *

২. চৈতন্যমঙ্গল

"শুনি শচীদেবী আউদড় চুলে ধায়!"

*

৩. চৈতন্যভাগবত

"বিপ্রগণে পড়ে বেদ ভাটে রায়বার।
সাচিগৃহে হইল আনন্দ অবতার।"
"আজি আমি শুনিনু দেয়ানে সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌকা আইল হেথা!"

* *

"বিনা দীপে ঘর মোর
তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গাপায় কত মধু বরিষে।"

* * *

৪. ভক্তিরত্নাকর

বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওঠখানি হাস।"

* * *

৫. কৌতুকবিলাস

"রাজার হুকুম পেয়ে যত খানেজাদ।
উঠল বাজায়ে ভেরী করে ঘোর নাদ।।"
"যে গাভীর পঞ্চসের অগ্রে দুগ্ধ ছিল।
খেড়ো হয়ে ক্রমে তার এক পোয়া হইল।।'

৬. সারদামঙ্গল	"রতির খুলিয়ে খোপা আলুথালু কেশ!"
	* * *
৭. মনসামঙ্গল	"বাহ বাহ বলি ঘন ডাকিছে কাণ্ডারী।"
	* * *
৮. মাল-গান	"যে ছিল মোর প্রেমে বান্দা সে প্রেমে পেরাছে বাধা।'
	* * *

২. মধ্যযুগ

গ্রন্থকর্ত্তার বা গ্রন্থের নাম	পদ
২৩. ঈশ্বর গুপ্ত	"বিবিজান চলে যান লবেজান করে।" "ভাগ্যফলে রান্না সব ভাল হল যাঁর। ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা নাহি পড়ে তাঁর।" "দেশে বড় ডামাডোল উঠেছে এই রোল।" "কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।"
	* * *
২৪. দাশরথী	"একরত্তি বিষ নাই তার কুলোপানা চক্র।"
	* * *
২৫. কমলাকান্ত	"যার কালীনাম আপ্তসার কালের ভয় কি আছে তার।"
	* * *
২৬. বসন্তরায়	"পরাণ কেমন করে, মরম কহিনু তোরে, জীবন নীছান তুয়া পাশ।"
	* * *
২৭. শ্রীকর নন্দী	"গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদন্দ।"
	* * *
২৮. রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়	"খেম্‌টির ভাগ্যে মণিমতি জোটে নানা জাতি।" ইত্যাদি। "পুরুতের ভাগ্যে ঘসা পয়সা ইত্যাদি।" "বেঁটে পাঁচ হাতি।"

৩. সংস্কারক-যুগ

২৯. বঙ্কিমচন্দ্র

"ছিপীর কিরীটী শিরে, উঠিলিরে ধীরে ধীরে
যকৃত জননী।"
"গোলামের জাত শিখেছে গোলামী।"

* * *

৩০. হেমচন্দ্র

"হায় কি হল অকাল এল,
আবার ধ্বজা তুলে।"
"কেন বা হইবে আন, পুরুষের শতটান,
শস্ত্র, শাস্ত্র, সংগ্রাম, ভ্রমণ।"

* * *

৩১. দীনবন্ধু

"মোল্লারে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে।"

* * *

৩২. মাইকেল

"ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন কোলাহল"
ইত্যাদি।

৪. প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাষার আলোচনা, উন্নতি ও অবনতি

উপরিউক্ত পদগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অতীতকালে ভাষা মিশ্রিত ছিল, মধ্য-যুগে বা ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের আমলে ঐ সকল মিশ্রিত ভাষা অবিমিশ্রিত ভাবে দণ্ডায়মান হয় এবং বাঙ্গালার শ্যামলক্ষেত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কণকার্য্য দুরূহ ও ঐরূপ দুর্ব্বোধ্য ছিল; গুপ্ত মহাশয় তাহার পথ সুগম করিয়াছেন। কিন্তু তিনি রঙ্গ রহস্যপ্রিয় ছিলেন। এজন্য তাঁহার লেখার মধ্যে রহস্যপূর্ণ বহু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তৎপরবর্ত্তিগণও ঐ প্রথার অনুসরণ করেন। এ কথা স্বীকার্য্য যে, গুপ্ত মহাশয় কোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি ও উচ্চাকাঙ্খা রক্ষা করিবার জন্য প্রথম এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। দীনবন্ধু প্রভৃতি তাঁহারই শিষ্য।

স্বর্গীয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার রাজপুত-কাহিনী বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার লেখনী-প্রসূত রত্ন এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। হেমচন্দ্র প্রভৃতিকেও ঐ পথে বিশেষভাবে নীত হইতে দেখা যায়।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষাদাতা। তাঁহাদের নিকট সকল বঙ্গবাসীই ঋণী; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় যেমন সংস্কৃতবহুল শব্দ, অক্ষয়কুমারের ভাষায় তেমনি সহজগম্য ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষর-শিক্ষাদানের পথ সুগম করিয়া নানা ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ শ্রুতিমধুর বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া এ দেশের পাঠকবর্গকে নূতন রসের আস্বাদন প্রদান করেন। অক্ষয়বাবু এ দেশে প্রথম বিজ্ঞানশিক্ষা-দাতা।

মাইকেল এদেশের সাহিত্যে বীর্য্য ও তেজস্বিতা দানের গুরু। কঠিন হৃদয়ে তিনি অপূর্ব্ব প্রেমের সংবাদ দান করিয়াছেন। লোকে জানে, অসদাচারী প্রায়ই কঠিন-হৃদয়; কিন্তু তাহা নহে —রাবণের চরিত্র বিশ্লেষণ ও প্রমীলার চরিত্র, রাম ও সীতা চরিত্রের সহিত তুলনা করিলে উহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। মাতৃ-প্রেমও সে হৃদয়ে যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল।

বঙ্কিম আমাদের সর্ব্ব-সমন্বয়ের উপাদান স্বরূপ। তাঁহাতে সকল গুণই ছিল এবং সেই ক্ষমতায় তিনি তৎকালীন বাঙ্গালা-সাহিত্য দ্বারা ভাষাসংস্কারে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিকগণ এক এক বিষয়ে জ্ঞান ও গুরু ছিলেন।

এইরূপে তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণ বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলেই সহজে বুঝা যাইবে। তবে ইহা স্থির যে, তৎকালীন সাহিত্যিকগণের ভাবের সহিত আধুনিক এই সকল সাহিত্যিকের ভাব একরূপ নহে। যেহেতু কালের পরিবর্ত্তনের সহিত লোকের ভাবেরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; এবং লোকের ভাব-পরিবর্ত্তনের জন্য লেখককেও সেইরূপ হইতে হয়। সময় সংক্ষেপ ও নানা কার্য্যনিবন্ধন ঐ সকল বাঙ্গালা সাহিত্যিকের মূলবান কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল করিতে যে সক্ষম হইয়াছি, এমন মনে হয় না। তবে প্রমাণস্বরূপ কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়াছি এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, সকল বাঙ্গালা-সাহিত্যিকের কথা উদ্ধৃত করা এ স্থলে অসম্ভব বলিয়া---তাহা করি নাই। তজ্জন্য আপনারা ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

৫. বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা-ভাষার গতি

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা-ভাষায় আলোচনা করিতে যাওয়া আর স্বীয় সুস্থির চিত্তকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া শিয়াকুল গাছে চুল জড়াইয়া বিনাকলহে কলহ উপস্থিত করা, এই উভয়ই সমান। তাহার কারণ, বর্ত্তমান সময়ে এই ভাষার স্রোত উর্দ্ধগামী কি নিম্নগামী, তাহা নির্ণয় করাই দুরূহ। আমরা যদি ভাল করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিরীক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাইব এইখানে তিন দলের সৃষ্টি হইয়া আছে। একদল পূর্ব্বাপর সংস্কৃতভাষামোদী, আর একদল ঠিক ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান আছেন। এই উভয় দলের মধ্যে অহিনকুলবৎ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

প্রথম দলটী খাঁটি সংস্কৃতের সূত্রানুযায়ী বাঙ্গালা-ভাষাকে চালিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে, সংস্কৃত-ভাষা বাঙ্গালা-ভাষার জননী। সমাস, তদ্ধিত, সন্ধি, সকলই

সংস্কৃতপদরেণু সংযোগে ধন্য করাইতে বাঙ্গালা-সাহিত্যিকের উপর আদেশ দেন। শেষোক্ত দলটী তেমনই সংস্কৃতের নামে হাড়ে চটিয়া যান। তাঁহাদের মত, বাঙ্গালা-ভাষাকে যাহা খুসি তেমনই করিয়া লইয়া যাওয়া হউক; উহাতে ভাষা সহজ, সুগম ও উন্নতি-বিধায়ক হইবে। এই দুই দলের দুই মত। এই উভয় দল, উভয় দলের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এখন ঘোর-সংগ্রাম বাধাইয়া দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত দলই মধ্যপন্থী। তাঁহারা বাঙ্গালা-ভাষার বিভিন্ন শব্দ বা লিখন-পদ্ধতিকে একেবারে স্থাবর বা অস্থাবর বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহাদের মত, যাহা রুচিশুদ্ধ, সুশ্রাব্য, তাহা অবশ্যই বাঙ্গালা-ভাষার শোভা বৃদ্ধি করিবে; সে শোভা-বর্দ্ধনে বাধা দেওয়া নিতান্ত অরসিকের কর্ম্ম! এতদ্ব্যতীত বিষয়গুলি যে পরিত্যক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের মত, বাঙ্গালা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে হইলে উভয় দলের মধ্য হইতে যাহা বঙ্গীয়পিককুল-মুখরিত শ্যাম-কুঞ্জে শোভনযোগ্য, গন্ধযুক্ত, অথচ মনোহর, এমন কুসুমরাশি অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা এ নন্দন-কাননের শোভা ও সৌন্দর্য্য থাকিবে কোথায়? শুধু কেতকীতেও হইবে না আর কেবল 'আনন্দ'-পুষ্পেও সে কুঞ্জের শোভা বৃদ্ধি করিবে না। নয়নরঞ্জন, সৌগন্ধামোদিতে কুঞ্জবনের সৃষ্টি করিত হইলে ঐ কেতকী, ঐ আকন্দ, উভয়কেই যথাযথ স্থানে রাখিতে হইবে; আর তাহার মাঝে মাঝে দুই চারিটীগোলাপ, যুঁই, অশোক, করবী প্রভৃতিকেও রাখিতে হইবে, নতুবা সৌন্দর্য্য ও মধুরতা উভয়েরই স্বত্ব রক্ষিত হইবে কিরূপে? এরূপ বিধানে বোধ হয় মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না! যেহেতু—ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। যে যাহা চায়, সে তাহা পাইলেই তুষ্ট; এতদ্ব্যতিরেকেই গোলযোগের সম্ভাবনা, সে স্থলে 'কম্পাল্‌সন্‌' খাটে না!

তৃষ্ণার জল মধুর, উদরাময়ে বিল্বফল অমূল্য; কিন্তু তাহা বলিয়া সকলেই কেবল উদকপান বা বিল্বফল ভক্ষণ করিবে না। সময়বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মূল্যবান বিলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যিনি সুদক্ষা গৃহকর্ত্রী তিনি সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই ব্যয়ানুসারে পূর্ব্ব হইতে সংসারে সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সময় সময় গৃহিণীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের অল্পতাহেতু কর্ত্তাকেই এ ব্যবস্থা করিতে হয়। তাঁহারা কেবল বিল্বফল ও উদকের ব্যবস্থা করিয়া তৃষ্ণাতুরকে বিল্বফল বা উদারময় রোগীকে উদকপানের ব্যবস্থা করেন না। যদি কখনও এইরূপ অনুরোধ ঘটে, তবে তাহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়। আমারও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এই কথা কয়টীই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ পরে দেখান যাইবে; তবে অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহা সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য, তাহা অবশ্যই সুধীসমাজ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। কাহারও বিপক্ষে আমার কিছু বলিবার নাই; তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তাহাই উপস্থিত

ভদ্রমহোদয়গণ ও সাহিত্যিকগণের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা। অতএব কেহ যেন আমার এই কথা শুনিয়া আমার বিপক্ষে খড়্গধারণ না করেন, এই আমার প্রার্থনা!

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত তিন দল এখন বাঙ্গালা-ভাষার নায়ক, আর তন্মধ্যে আমাদের বঙ্গ-বাণীর অপূর্ব্ব-বীণাধ্বনি লহরে লহরে লয়তানের উৎস ছুটাইয়া শ্যামলকুঞ্জকে আনন্দে নাচাইয়া তুলিতেছে! দর্শক, শ্রাবক, সকলেরই প্রাণে আনন্দ! কিন্তু সাহিত্যিকের দিকে দৃষ্টি করিলে বাঙ্গালায় আমরা দেখিতে পাই, সাড়ে-পনের আনা লেখক ঔপন্যাসিক, সিকি ঐতিহাসিক ও বক্রী ষোল আনার মধ্যস্থিত সিকি লেখক বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক প্রভৃতি মিশ্রিত আলোচনাকারী।

এই সাড়ে পনের-আনা ঔপন্যাসিক ও লেখক আবার দুই প্রধানভাগে বিভক্ত-কবি ও নভেলিষ্ট। বিশ্ববাঙ্গালা জুড়িয়া এখন কবিতা লেখার একটী বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! তাহার ছন্দোবদ্ধ ও ভাষা মার্জ্জিত, শ্রুতিসুখকর হউক বা না হউক, জোড়েতাড়ে 'থাকা' 'সাজানর'মত সাজাইয়া তুলিলেই 'কবিতা' অব্যর্থ। তাহা লেখা চাই-ই। জোড়েতাড়ে 'তানা—নানা' করিয়া এই মহীয়সী কবিতার সৃজন না করিতে পারিলে আর আধুনিক-বাঙ্গালা সাহিত্যে গণ্যমান্য-ধন্য-বদান্য-লেখক বলিয়া গণ্য হইতে পারা যাইবে না—এখন ইহাই লেখকবৃন্দের ধারণা। সেই জন্য শীতকালে ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের দারুণ শীতে কম্পিত হইয়াও কবির অনুরোধ বসন্ত সমাগমের জন্য প্রাণ মাতোয়ারা 'কুহু'ধ্বনি না করিয়া পরিত্রাণ নাই! আষাঢ়-শ্রাবণের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলকেও বাধ্য হইয়া কবির পদ-রচনার সুবিধার জন্য বসন্তের অরুণোদয় ঘটাইতে হয়! কবির এমনই প্রতাপ! সেইজন্য আজ মাতৃস্তন্যপায়ী-শিশু হইতে অনন্তশয্যাশায়ী ব্যক্তি পর্য্যন্ত কবিত্বের কোদণ্ডে টঙ্কার দিতেছেন, বুঝি বা কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেবের পুনরাবির্ভাব ঘটে! যেরূপ কালের গতি হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ইহা আশা করা যায় যে, এমন ভাবে কবিত্বের স্রোত বাঙ্গালাভাষার উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে শিশু ক্ষুধা বোধ করিলে মাতার নিকট আর সরল ভাষায় খাদ্যের প্রার্থনা না করিয়া নন্দদুলালের ন্যায় নাচিতে নাচিতে গাইবে—'মাগো দে'মা আমার খাবার পেড়ে!'

আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের জ্ঞানও ক্ষুদ্র,—তাহা সসীম, এখনও অসীমত্বের মধ্যে পৌছায় নাই। সেইজন্য বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করি না। তবে যেরূপ কবিত্বের স্রোত দেখিতেছি—বঙ্গের কুমার, কুমারী হইতে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ এমন কি পাঠশালার পড়ুয়ারা পর্য্যন্ত পদ্যে এক একখানি কাব্য প্রণয়নে উদ্যত। অবশ্য ঐতিহাসিক মহাশয়েরাও যে এক্ষেত্রে নিরামিষভোজী, এমন কোথাও দেখি না, এতদ্ব্যতীত, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতিতে কুললক্ষ্মী, কুলকর্ত্তাদিগের ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা-মিশ্রিত কবিত্বপূর্ণ প্রীতি-উপহারগুলি যেরূপ সহজেই কবিত্ব-ঝঙ্কারে

কর্ণ-কুহর পবিত্র করে, তাহা দেখিলেই ভয় হয়—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রের কি দশা হইবে? হাঁ, যদি জানিতাম, ঐ সমুদ্রে ঝম্ফপ্রদান করিলে কোন অমূল্য মণির সন্ধান পাইব, তাহা হইলে অন্তত; লোভে পড়িয়াও না হয় উহাতে ঝম্ফপ্রদান করিতাম; কিন্তু উহা যে কেবল পঙ্কে পরিপূর্ণ! তাই ভয়, পাছে—লাভঃ পরং গোবধঃ হয়!

সারার্থ এই, ঐ সকল কবিতায় যদি নীরস প্রাণে সরসতা, ভাবুকতা, মনুষ্যের উপযুক্ত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করিত, তবে তাহা দেশের পক্ষে ভাল হইত; কিন্তু তাহা হওয়া দূরের কথা, তাহা অসার-কুৎসিত-প্রেম ও অশ্লীলতাময়! সদ্ভাব আনা দূরে থাকুক, চঞ্চল-মনের চাঞ্চল্য-সাধনই ঐ সকল কবিতার শ্রেষ্ঠতা। 'বর গুণ নাই অর গুণ আছে।' আজকাল যত কবিতা বাহির হইতেছে বা হইয়াছে, তাহার পনর-আনা সাড়েতিনপাই ঐরূপ সৌগন্ধে পরিপূর্ণ, বক্রী চলন্‌সই! ঐ সকল কবিত্বময়-বাঙ্গালা সাহিত্য-পুষ্পোদ্যানস্থ পুষ্পের সার সমন্বিত কাব্যগুলি যেমন অশ্লীলতাময়, তেমনই আবার ছন্দোবিহীন, শ্রবণভেদী বজ্রনির্ঘোষ—বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন বটে! এইরূপ অভাবনীয় কবিত্বের সৃষ্টিকারক প্রত্যেক কবিই মনে করেন, এ আমার বহুমূল্য মণি, বুঝি বা কহিনুর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে। বর্ত্তমান কবি-পঙ্থীদিগের এমনই বিচারশক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রাখর্য্য! হায়, এই জ্ঞান লইয়াই তাঁহারা আবার বাঙ্গালার-সাহিত্য-আসরে বাক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন! ধন্য কালের মহিমা!

ঔপন্যাসিক-ভাণ্ডারেও বাঙ্গালা নভেলগুলি ঠিক এই ছাঁচেই গঠিত হইতেছে। নায়ক-নায়িকার কুৎসিত-প্রেম ব্যতীত তাঁহাদের আর লেখা চলে না। গল্পলেখকের দলও ঐ পথের পথিক হইতেছেন। আধপাতা গল্পের মধ্যে দুটা নায়ক-নায়িকার প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ না দিলে সে গল্প গল্পই নহে! সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও ঐ অমৃতে মুখ মাজিয়া বসিয়া আছেন, অগত্যা লেখক বাধ্য হইয়া নাম কিনিবার জন্য হরে, রামা, সেধো মেধোর দেখাদেখি দু'টা রসের কথা জুটাইয়া দেন! এ রসালাপ যে যথার্থই বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বনাশসাধক, তাহা আধুনিক উদীয়মান-সাহিত্যিক-মণ্ডলী লক্ষ্যও করেন না। দৃষ্টিহীনতা হেতু অনেক স্থলে লেখক রসিকতা করিতে যাইয়া, আত্মজ্ঞানের প্রাখর্য্য প্রদর্শন করাইতে যাইয়া দ্বিতীয় 'নদেরচাঁদের' সৃষ্টি করেন!

বাস্তবিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের এ সকল অমূল্যরত্ন 'বঙ্গীয় জু-গার্ডেনে' রাখিবার যোগ্য, কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর নিকট নহে—বৈদেশিক মীমাংসাকারীর নিকট; বাঙ্গালীর পক্ষে উহা হৃদ্‌রক্তশোষক ভয়ানক ব্যাপার! এসকল দেখিয়া, পাঠ করিয়া আনন্দ পাই বটে, কিন্তু যদি বাস্তবিক ঐ সকল ঘটনা আমাদের সাধের সংসারে ঘটিতে থাকে,—ঐ সকল গ্রন্থপাঠ দ্বারা বা স্বভাবতঃ যদি ঐরূপ পুরুষ বা স্ত্রীর রুচিবিকার ঘটে, তবে আপনারা ভাবিয়া দেখুন, ঐ সকল ঘটনা কি ভীষণ প্রলয়ের বহ্নি সৃষ্টি করিয়া সংসারস্থ

সমস্ত জীবকে দগ্ধ করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ বা আলোচনা দ্বারা যে এসব কাণ্ড সংসারে না ঘটিয়া যাইবে, এমন কখনই হইতে পারে না।

এখন বাঙ্গালাভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিতেছি। এই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহিত বাঙ্গালীজাতি প্রাচীনকাল অপেক্ষা অনেক বিষয় অধিক শিক্ষা করিয়াছে। অনেক অশিক্ষিতের দল শিক্ষিত হইয়াছে, অনেক নিরক্ষরের অক্ষর-পরিচয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে কত লোক মূর্খ ছিল, বিদ্যাচর্চ্চার শক্তি কত অল্প ছিল, এখন কিন্তু তাহা দ্বিগুণ কিম্বা তিনগুণ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; ইহা বোধ হয়, আপনারা সকলেই স্বীকার করেন। পূর্ব্বে কোন গৃহে পুস্তক বড় একটা দৃষ্টই হইত না, পুস্তক পাঠকল্পে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বা ধনী মহাশয়ের পুস্তকাগারে যাইয়া আশ্রয় লইতে হইত,—পুস্তক এতই দুর্লভ সামগ্রী ছিল। কিন্তু এখন অতিবড় জনহীন পল্লীরও প্রতি-গৃহে এক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন ছাত্রকে কত কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে দূরদেশে গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যালাভার্থ গমন করিতে হইত; কিন্তু এখন আর তাহা যাইতে হয় না, এখন নিভৃতকুঞ্জের কুললক্ষ্মী পর্য্যন্ত শিক্ষিতা ও শিক্ষাদাত্রী হইয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, এদেশে বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

ঐ সকল পুস্তকাগারগুলি কিরূপ রত্নে অলঙ্কৃত, তাহা আলোচনা না করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; সেই জন্য আপনাদিগকে সে সকল পুস্তকাগারের প্রতি একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। যখন এতদূর আসিতে হইয়াছে, তখন ঐ বিষয়টী দেখিয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন না করিয়া যাওয়া নিতান্ত অরসিকের কর্ম্ম! সেইজন্য আজ বাঙ্গালা-সাহিত্যিকগণের পুস্তকালয়ে প্রবেশলাভ করিলাম; দেখিলাম, ঐ সকল পুস্তকাগার বার আনা রকম উপন্যাসে, দুই আনা, গান, রহস্য, অভিনয়ের পুস্তকে ও বাকী দুই আনা ধর্ম্মাধর্ম্মের গল্পওয়ালা বহিতে পূর্ণ! শেষোক্ত গ্রন্থগুলির প্রতি পাঠকের কৃপাদৃষ্টি অতি অল্পমাত্রই পতিত হয়! সেগুলি বড় বেশী কেহ স্পর্শ করে না, কি জানি পাছে বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত জ্ঞানে সংক্রামক ধর্ম্মরূপ ব্যাধি তাহাদিগকে আক্রমণ করে, অথবা যৌবনে বার্দ্ধক্য আসিয়া ভ্রমে একবারও বদনকমল হইতে শ্রবণবিদারক "হরিনাম" উচ্চারিত হয় এবং পাঠকের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে বা বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই বড় ভয়! সে সমস্ত আছে, গঙ্গাগর্ভে-পতনোন্মুখ তীরবাসী বৃদ্ধের জন্য। উত্তম ব্যবস্থা! যেখানে এ দল নাই, সেস্থান এ বিপদ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ; সেখানে ষোল আনাই "গোলাপী গাণ্ডারী"। যাহাহউক দেখিলাম, এই মহাপাপী গ্রন্থরাজি জরাজীর্ণ কীটদষ্ট হইয়া আবর্জ্জনার মধ্যে বঙ্গভাষার ক্ষীণরশ্মি প্রদান করিতেছে। আর একদিকে উপন্যাস, রঙ্গরহস্য, গীতবাদ্যাদি-সমন্বিত আমোদ-প্রমোদের পুস্তকগুলি সুচিক্কণ

চর্ম্মপেটিকায় নিবদ্ধ হইয়া স্বর্ণাক্ষরে স্বীয় নাম ধারণ করতঃ পাঠক ও দর্শকের চক্ষু ঝল্‌সাইতেছে। তাহাদের আদর যত্ন দেখে কে?

ভাই বঙ্গবাসি! আজ বড় দুঃখে একথা বলিতে হইল। বিদ্যাশিক্ষার কি উদ্দেশ্য, পুস্তকের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা আধুনিক সাহিত্যরথিগণ কি একবার চিন্তা করেন! পদ্যপাঠ শেষ করিতে না করিতেই কবিতা বা ঐরূপ কুৎসিত-ভাবাপন্ন উপন্যাস বা গল্প লেখাই কি বিদ্যাভ্যাসের চরমোৎকর্ষ! না, এই বিদ্যা দ্বারা আত্মার, আত্মীয়ের, স্বদেশ বা স্বজাতির অজ্ঞানতা দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিমল শান্তি প্রদান করিবে? সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম, এই কি প্রত্যাশা করে? না, ইহার দ্বারা উহাদের যথেষ্ট উন্নতি-বিধান করা হইল?

এই স্থলে পনর আনা লোকের উপর আমার অভিমত প্রকাশ করার কারণ বর্ত্তমান চরিত্রহীনতা! যদি আমাদের সৎপ্রবৃত্তি উদ্বোধিত হইত, তবে এ সকল পুস্তক পাঠ বা অভিনয়াদি দর্শন দ্বারা চরিত্র-বিকার ঘটে কেন? পূর্ব্বেও এ দেশে গ্রন্থপাঠ চলিত; তখন এমন দশা না ঘটিয়া আজ বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষের দিনে এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল কেন? আপনারা বিচার করুন।

বাস্তবিক ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ দ্বারা এদেশবাসীর চরিত্রে মলিনত্ব ঘটিতেছে এবং তাহারই ফলে লোক পরদারগামী, যথেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী ও অস্থিরচিত্ত হইয়া শত শত ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হইতেছে। স্বীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করণই অধিকাংশ স্থলে এই একান্নবর্ত্তী-পরিবার ভঙ্গের কারণ। কিন্তু তখন শিক্ষা অর্থে যাহা বুঝিতে পারা যাইত, সেই শিক্ষার গুণে স্বভাবসুলভ মধুরতা দ্বারা তাহারা আত্মীয় স্বজন একত্র মিলিত হইয়া সংসারের, পল্লীর ও স্বদেশবাসীর সুখশান্তি বিধান করিতেন! কিন্তু হায়, আজ শিক্ষাক্ষেত্র বিশাল ও নিষ্কণ্টক হইলেও জাতীয়চরিত্র বা সাধের সংসার অপবিত্র ও পূতিগন্ধময়!

আমার শেষ বক্তব্য এই, যাহাতে বাঙ্গালাভাষার শ্রী-বৃদ্ধি সাধিত হয় এবং ঐ সকল দোষ সংশোধিত হইয়া ভারতবাসীর প্রাণে পবিত্র আনন্দের সঞ্চার করে, তাহা করাই সাহিত্যিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্তরূপ খাণ্ডবদহনে যেন কেহ প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালার মুখ অবনত না করেন—ইহাই নিবেদন।

সাহিত্য ও মানব-হৃদয়

শ্রী জগদিন্দ্রনাথ রায়

কবে কোন্ প্রথম বসন্তদিনের শুভ মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে সাহিত্যের রসধারা ব্রহ্মকমণ্ডলুবিহারিণী মন্দাকিনীর মত দগ্ধমানবের হৃন্মর্ম্মব্রণের উপর শীতলধারা ঢালিবার জন্য কোন্ দেবতার কমণ্ডলু হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার সময় নিরূপণ দুঃসাধ্য, অসাধ্যও বোধ করি বলা যায়। ছন্দোময়ী গাথা যেমন একদিন জীবনসঙ্গীর বিয়োগবিধুরা ক্রৌঞ্চবধূর হৃদয়বেদনায় রত্নাকরের মানসকন্যারূপে এ ধরায় জন্মলাভ করিয়াছিল, সাহিত্যের প্রথম রসধারা তেমনি কোন্ আদিযুগে বুঝি বা মানবের মর্ম্মপীড়ার মহৌষধিরূপে মহৈশ্বর্য্যময় স্বর্গলোক হইতে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত নামিয়া আসিয়া আজও বসুন্ধরার সন্তান-সন্ততির সন্তাপ-হরণের উপায় হইয়া রহিয়াছে। প্রিয়বিরহ ও অপ্রিয়-সম্মিলনের অকরুণ আঘাতে অন্তর যখন কাঁদিয়া উঠিল, তখন এই ক্ষণবিধ্বংসি ধরার ক্ষণিক সুখের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া সত্য শিব সুন্দরের দর্শনের একান্ত আগ্রহে মানবমনে দর্শনশাস্ত্রের অঙ্কুরোদগমের সূচনা হইল; তখন কপিল, কণাদ, গৌতম, দ্বৈপায়ন তাঁহাদের অপার জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া সুধাপাত্র আনিয়া সংসারের তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠাধরের নিকট ধরিলেন; সে সুধার আস্বাদ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যাঁহারা তাহা পান করিয়াছেন, তাঁহারা পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। রোগের একান্ত-মুক্তির অব্যর্থ মহৌষধ সকলের ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, আপাত নিবারণের উপায়টুকু যদি পাওয়া যায়, তাহাই পরম সৌভাগ্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও আচার্য্য-শঙ্করের মত চিকিৎসককে ডাকিয়া দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। Burows and Welcom-এর আবিষ্কৃত অর্দ্ধরতি অহিফেন গুটিকার মত রসময় সাহিত্যের "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" বটিকার সাহায্যে দুরারোগ্য বেদনাময় আপাত-ব্যাধির উপশম করিতে পারিলেই আমরা বাঁচিয়া যাই। কোন্ দয়াপরবশ দেবতার করুণায় এই "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের" সৃষ্টি হইয়াছিল জানি না; তাঁহার নাম Burows কি না, তাহাও বলিতে পারি না; তবে উহা যে মানব সমাজের নিকট welcome, তাহাতে দ্বিধা করিবার কোন কারণই নাই। মানব-মনের চিরন্তন অমূর্ত্ত মানসীমূর্ত্তি বিশ্বের শোভাসৌন্দর্য্যের মধ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আবির্ভূতা হইয়া পরম শোভাময়ী সৌন্দর্য্যময়ী প্রাণমনমোহনকরী যাদুকরী মূর্ত্তিতে দর্শন দিতেছেন, তাই বহিঃপ্রকৃতি ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া এমন শোভাময়ী। বসন্ত-বৈতালিকের মধুর কণ্ঠ, মলয়স্পর্শে উল্লসিত মালঞ্চের পুষ্পৈশ্বর্য্য, প্রাবৃটান্ত গগনের নয়নাভিরাম নির্ম্মল নীলিমা, শারদাকাশের সান্ধ্যরক্তরাগ ও পর্ব্ব-নিশীথিনীর পূর্ণ শশধর, ঊষাসুন্দরীর সীমন্তের

সিন্দুরশোণিমা, সবই আমার শ্রান্তক্লিষ্ট মনের উপর সুধালেপ দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে। আমার অন্ধ নয়ন যে কিছুই দেখিতে পায় না; তাই যে দেবতার আশীর্ব্বাদবলে মানসসুন্দরীর প্রথম মূর্ত্তশ্রী মানবের কণ্ঠে আসিয়া বাণীরূপে দর্শন দিয়া নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই পরম দেবতার অসীম অনুগ্রহ ও পরম শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বারবার তাঁহার চরণোপান্তে মানবসমাজ উদ্দেশে প্রণত হইতেছে। বাগ্দেবতার সেই প্রথমাবির্ভাবের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবমন যখনই অভাব-সঙ্ঘাতে আর্ত্ত হইয়া উঠে, আর্ত্তিহারিণী মানসী অপূর্ব্ব শোভাসম্ভারে সমন্বিত হইয়া তখনই মানবের মানসস্বর্গে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেন—সে মূর্ত্তি কবি কাব্যে, ভাস্কর শ্রীমূর্ত্তিতে, চিত্রকর তুলিকাসাহায্যে চিরন্তনী করিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়। অনন্তসুন্দরের অখণ্ড অনাময় আনন্দের সন্দর্শন-লাভ করিয়া আমরা জীবন্মুক্ত হইতে পারি না, দুঃখ-দৈন্য-আর্ত্তি-অভাব-পরিপূরিত এই ধরণীর ধূলিতলে আমাদিগকে জীবনযাপন করিতেই হয়। সে জীবন যখন দুঃখের বেদনায়, অভাবের তাড়নায়, বিরহবিয়োগের যাতনায় দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, তখন মানবহৃদ্‌বিহারিণী নানারূপময়ী মানসলক্ষ্মীর মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য সাহিত্যই আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনার বিধান করে। ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়তটে সুখদুঃখের আন্দোলনে মানসবিহারিণীর কমলাসন যখন চঞ্চল হয়, রসাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়া মানসীর মনোমোহিনী মধুরমূর্ত্তি তখনই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সে মূর্ত্তি দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে চিরন্তনী হইয়া সন্তাপদগ্ধ মানবমনের শান্তি সম্পাদন করে।

রামগিরিপ্রবাসী যক্ষের অস্তিত্ব কোন কালেই ছিল কি না মেঘদূত পড়িবার সময় সে কথা কাহারও মনে আসে না, যক্ষের প্রিয়তমা "তন্বীশ্যামা", "মধ্যক্ষামা" কি "শ্রোণীভারমন্থরা" সে দৃশ্য কাহারও মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদয় হয় কি না জানি না; কিন্তু নববারিধরসমাগমে কেতকীকুটজগন্ধবাহী সমীরণের শীতস্পর্শে কালিদাসের ব্যাকুল-বিরহ যে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। বিরহী প্রবাসী মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে মন্দ মন্দ উচ্চারিত মেঘদূতের অমরশ্লোকাবলী যখন পাঠ করে, তখন কালিদাসের করুণ বেদনা তাহার চতুর্দ্দিকে বিরহব্যথার জাল বয়ন করিয়া দেয়, একথা কে অস্বীকার করিবে? বর্ষার দিনে, বিরহের বিপুল বেদনার দিনে, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা কেবল যক্ষের নয়, কালিদাসের নয়, বিশ্বের সমস্ত প্রিয়-সান্নিধ্যশূন্যজনের ভারাক্রান্ত মনে কি যম-যন্ত্রণার সৃজন করে, তাহা প্রিয়-বিরহ-কাতর জনেই জানে। কালিদাসের মন্দাক্রান্তার অমরশ্লোকাবলী পাঠ করিতে করিতে যক্ষবিরহ পাঠকের বক্ষে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, দেশকালপাত্রের সমস্ত দূরতা বিদূরিত হইয়া যক্ষের কল্পিত করুণা আমার বাস্তব বেদনার সহিত মিশিয়া যায়, কবির বেদনার ছন্দোময়ী গীতি আমারই বিয়োগযাতনার যথাযথ অভিব্যক্তির রূপ ধরিয়া উঠে। তারকা-নিধনরূপ দেবপ্রয়োজনে কুমারের সম্ভব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল কি না

বলিতে পারি না; দেবকার্য্যে দগ্ধদেহে অনঙ্গের চিরসঙ্গিনী নব-বৈধব্যবেদনাকাতর রতির সকরুণ বিলাপে যে বিশ্বের সমস্ত বিধবার হৃদয়বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বসুধার আলিঙ্গনে ধূসরিতস্তনী কন্দর্প-মনোমোহিনীর নববৈধব্যের অসহ্য বেদনার মর্ম্মভেদী-বিলাপ প্রত্যেক বিধবার প্রিয়তমের চিতাবহ্নির দুঃসহ তাপ হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া জ্বালাইয়া তোলে, তাহা প্রিয়-দয়িত-বিয়োগ-কাতরা প্রিয়াই বলিতে পারে। পৌরাণিক আখ্যানমতে গিরিরাজনন্দিনী তাঁহার চিরপ্রার্থিত দেবাদিদেব মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন, তারকাসুরনিধনকারী দেবসেনাপতি কুমারের সম্ভবে ব্যাঘাত হয় নাই, দেবকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া দেবতার আনন্দনিবাস স্বর্গলোক নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রকার মনোভীষ্ট লাভে সকলেই সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, কেবল কন্দর্পের চিরসঙ্গিনী, অনঙ্গের চির-সাহচর্য্যের একান্ত অভিলাষিণী স্মরপ্রিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় চির-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী কামদেবের হরকোপা-নলে ভস্মাবশিষ্ট দেহাবশেষের নিকট উন্মুক্তকুন্তলে রোদন করিয়া চতুর্দ্দিক শোকাকুলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; সেই শোক অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া উজ্জয়িনীর অমরকবি তাঁহার বিলাপগাথায় তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। রতির হৃদয়বেদনা বিক্রমসভার কবিশ্রেষ্ঠের লেখনীমুখে নিঃসৃত হইয়া আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বের নববৈধব্যশোকাচ্ছন্ন সদ্যোবিধবার অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

দাক্ষায়ণীর শবদেহস্কন্ধে মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরের তাণ্ডবনৃত্য কবিকল্পনার কি অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর চিত্র, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। চক্রীর চক্রে বহুধা-বিভক্ত সতীদেহ যেখানেই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানই আজ পর্য্যন্ত মহাতীর্থ বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে;—এ পূজা দেবত্বের নিকট নহে—ভুজঙ্গে ও মণিমাল্যে যার সমদৃষ্টি, মহীমহেন্দ্র ও নগণ্যে যিনি ভেদজ্ঞান-রহিত, চন্দনে ও চিতাভস্মে যাঁহার সমজ্ঞান, বিষে অমৃতে যাঁহার কোন প্রভেদ নাই, সেই সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবিহারীর ঐকান্তিক একনিষ্ঠ প্রেমের নিকট দেশকাল-নির্ব্বিশেষে কোটি কোটি মানবের মস্তক অবনত হইতেছে। যুগযুগান্ত পূর্ব্বের মহাকবিকল্পিত মহাপ্রেমের নিকট মানবের এই স্বেচ্ছাকৃত প্রাণপাত প্রেমমাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব গৌরবের অকাট্য ও অবিনশ্বর প্রমাণ। এই মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিকের প্রেমের ধন বলিয়াই শিবানীর শবদেহের অংশ যেখানে পড়িয়াছে, সেই স্থানই আজি মহামহিমময় দেবীপীঠ বলিয়া খ্যাত।

শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্মসম্পদ ও কাব্যসৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সাহিত্য-জগতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি—কবিহৃদয়বাসিনী সুন্দরী মানসীর মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তশ্রী এমন আর কোথাও বিকশিত হইয়াছে কি না, জানি না। সুখদুঃখ হর্ষামর্ষ কৃপাক্রোধ মিলনবিরহের অনেক কথা কবি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; বসুদেব-দেবকীর

কারানিবাসের করুণকাহিনী, নন্দ-যশোদার অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ, ব্রজবালকের সুধাময় সখ্য, সাক্ষান্মন্মথের মন্মথরূপী, বনমালা-বিভূষিত, পীতাম্বর, ব্রজসুন্দরের চরণারবিন্দে বৃন্দাবনবাসিনী আভীররমণীর অচলামতির সদ্যঃফল জীবন্মুক্তি, মহারাসবিলাসিনী পরম প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতীর শ্যামসুন্দরে অপূর্ব্ব অনুরাগ ভারত-সাহিত্যের অমূল্য মণিময় সম্পদ।

বৈদিক সময়ের উষা অরুণ ইন্দ্র বরুণের স্তুতিগীত, ঔপনিষদিক যুগের কথাচ্ছলে ব্রহ্মোপদেশ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পৌরাণিক ইতিকথা, মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক প্রভৃতি অর্দ্ধপৌরাণিক চরিত্রচিত্র, পুরাণবর্ণিত দেবমানব-চরিত্র অবলম্বনে শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য ও নাটক এবং মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতির-সামাজিক অবস্থাবর্ণন—এই সমস্ত উপলক্ষ্য করিয়া কবিহৃদয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দুঃখদীর্ণ অভাবপূর্ণ মানবমনের কি অমৃত প্রলেপ, তাহা কাব্য-কুঞ্জের সাহিত্যিক ষটপদবৃন্দের অবিদিত নহে।

কবিগুরু অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যা-দশরথের রামবাৎসল্য ও অযোধ্যাবাসী নরনারীর রাম-নির্ব্বাসনের অরুন্তুদ করুণা সুনিপুণ হস্তে রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে দুঃখ বিস্মৃত হইতে পাঠকের অধিক সময় লাগে না; সীতানির্ব্বাসনের অপার করুণা আজও ভারতবাসী নরনারীর মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কালের প্রলেপ সে ক্ষত-বেদনার কিছুই করিতে পারে নাই।

কুমারসম্ভবের উমা তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও প্রথমোদ্ভিন্নযৌবন লইয়া হরযোগভঙ্গেবিফলমনোরথ হইলেও তপস্যার বলে তাঁহার চিরকাঙ্ক্ষিতকে লাভ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার সাময়িক ব্যর্থতার বেদনা মানবের মনে চিরস্থায়ী হইয়া নাই, কিন্তু স্মর-সঙ্গিনীর বৈধব্যের ব্যথা আমরা ভূলিতে কি পারি? উনবিংশ-সর্গে সমাপ্ত রঘুবংশের সবই আমরা ভুলিয়া যাই, নবোঢ়া ইন্দুমতীর অকালবিরহে অজের বিলাপ প্রিয়াবিরহিত-জনের মনে জাতমূল হইয়াই থাকে। নন্দলালেল বৃন্দাবনলীলা-মাধুর্য্যের অপার পারাবার—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের তরঙ্গভঙ্গে সে সুধাসমুদ্র নিত্য লীলায়িত; অনঙ্গবর্দ্ধন বংশীনিনাদে প্রেমোন্মাদিনী আহিরিণীর রজনীযোগে বনপথে প্রয়াণ, কুটিলকুন্তল শ্রীমুখের প্রতি অপলক দৃষ্টিদানের ব্যাঘাতস্বরূপ কৃষ্ণতার নয়নের ঘনপক্ষ্মদাতা বিধাতাকে ধিক্কারদান, গোপকামিনীর প্রগাঢ় প্রেমের কি প্রচুর প্রমাণ, তাহা গোপী-গীতার পাঠকেই জানেন; কিন্তু এ সকল রসতরঙ্গ হৃদয়তটে নিত্য আঘাত করে কি না জানি না। যেদিন আহিরিণীর নয়নজলে যমুনার জলতরঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া রাধাহৃদয়ের আশালতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া—যে দিন শ্রীহরি শ্রীমতীর শতবৎসরব্যাপী বিরহের ব্যবস্থা করিয়া অক্রুরের রথে আরোহণ করতঃ বড় সাধের ব্রজধাম ত্যাগ করিলেন, "পাদমেকং ন গচ্ছামি" সত্যের মর্য্যাদা যে দিন তিনি

ভঙ্গ করিলেন, রাধাহৃদয়ের সে দিনের করুণা, হরিবিরহের সে দুঃসহ বহ্নি, মানবসমাজ আজও ভুলিতে পারে নাই, কারণ বৃন্দাবনলীলা যে নিত্যলীলা, মানবের হৃদয়ভূমিই যে নিত্য-বৃন্দাবনধাম।

বৈচিত্র্যময় ধরণীতলে মানবজীবন নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখের মধ্যে আমাদের দৈনিক-জীবন বহিয়া যায়, সে সুখের স্মৃতি আমাদের মনে চিরন্তন হইয়া থাকে না; কিন্তু দুঃখের ক্ষুরধার অস্ত্রে যে ক্ষতচিহ্ন রহিয়া যায়, সে দাগ জীবনে মিলাইবার নহে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াও যখন আমরা দুঃখের বার্ত্তা পাই, সে দুঃখ আমাদের মনে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। অশ্রুজলের প্রস্রবণধারায় তাহা ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা আমাদের বৃথা চেষ্টা।

কেবল পৌরাণিক-সাহিত্য নহে, নববঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও আমাদিগকে সুখের চিত্র দিয়া ভুলাইতে পারেন নাই। 'সূর্য্যমুখীর' সুখের সংসার আবার ফিরিল; সে সুখ আমাদিগকে সুখী করিল কি না জানি না; ক্ষুদ্র 'কুন্দের' দুঃখ আমাদের মনের উপর গুরুভার বিন্ধ্যগিরির মত চাপিয়াই আছে। রবীন্দ্রনাথের 'আশার' আশা মিটিয়াছিল, কিন্তু 'বিনোদিনীর' বিনোদনের উপায় গ্রন্থকার কিছুই করেন নাই—'বিহারীর' প্রত্যাখ্যান 'বিনোদ' ও পাঠকের মনে শেলসমই বিঁধিয়া রহিয়াছে।

'ভ্রমর' এবং 'গোবিন্দলালের' প্রথম জীবন সুখেই কাটিয়াছিল; সে সুখের চিত্র আমাদের মনে ক্ষণস্থায়ী; তাহাদের দুঃখময় পরিণাম পাঠককে অসহায়ভাবে অভিভূত করিয়া দেয়। ভ্রমপ্রমাদের হাত হইতে কেহই এ সংসারে নিস্তার পায় না, ইহারাও পায় নাই; অবশিষ্ট জীবনকাল ইহারা যে দুঃখে কাটাইয়াছে এবং যে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে ইহাদের অবসান হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে আসিলে অশ্রুজলে পাঠকের কণ্ঠরোধ হইয়া যায় এবং প্রথম জীবনের সুখময় দিনগুলি নৃত্যভঙ্গীতে অতিবাহিত হইলেও সে স্মৃতি পাঠকের মন হইতে মুছিয়া গিয়া কেবল তাহাদের দুঃখেরই কথা আমাদের মনে ভারের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে। নীতির্বিৎ হয় তো 'রোহিণীর' দুঃখে কাতর হইবেন না; কিন্তু 'হরলালের' অর্থের লোভ এবং বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া রোহিণী গোবিন্দলালের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পরমোপকার সাধন করিয়াছে, উহা যে প্রেমের প্রেরণায় করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই; এবং সেই প্রেমাশ্রিতা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া অনেক পাঠকের চক্ষু অশ্রুভারাকুল হইয়া আসে।

সন্ন্যাসী 'চন্দ্রশেখর', শৈবলিনীকে' ফিরিয়া পাইয়া আবার সংসারী হইয়াছিল; কিন্তু সংসারে থাকিয়াও চিরসন্ন্যাসী 'প্রতাপের' ব্যর্থপ্রেমের পদতলে হাস্যমুখে স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিনাশের সকরুণ কাহিনী হতভাগ্য পাঠককে কেমন করিয়া শোকাকুলিত করিয়া তোলে, তাহা চন্দ্রশেখরের পাঠকবর্গের কাছে অবিদিত নাই।

মাইকেলের 'মেঘনাদ' বঙ্গভাষার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে;—কবি দক্ষতার সহিত সুনিপুণ হস্তে নানা সুখের চিত্র আঁকিয়াছেন; রামলক্ষ্মণের ভ্রাতৃবাৎসল্য, বিভীষণের ন্যায়পরতা, সরমার সীতার প্রতি সহানুভূতি, কিছুই পাঠকের মনে স্থায়ী স্থান লাভ করে নাই। দশম সর্গে ইন্দ্রজিতের অবসানের পর বিয়োগকাতরা প্রমীলার সহমরণদুঃখ এবং দাম্ভিক বীর্য্যশালী, ভোগী, বীরাগ্রগণ্য, রাজাধিরাজ রাবণের শোকনম্র হৃদয়ের বৈরাগ্য ব্যথা পাঠকের অন্তর চির-বেদনাতুর করিয়া রাখিয়াছে।

অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পঞ্জরপিঞ্জরে চঞ্চল বিহঙ্গের মত চির-অস্থির হইয়াই আছে; জীবনভরা তপস্যা করিয়াও প্রিয়-লাভের বাসনা আমাদের তৃপ্ত হয় না। তাই সংসারের দৈনিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ নিত্য আসে ও চলিয়া যায়, আমাদের অন্তরপটে কোন চিহ্নই রাখিয়া যাইতে পারে না। একান্ত আগ্রহভরে আমাদের পরমপ্রিয় পদার্থটির প্রতি একাগ্র দৃষ্টি আমরা রাখিয়াছি। জীবনব্যাপী আরাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া কামনার ধন যখন আমাদের প্রসারিত হস্ত হইতে দূরে প্রস্থান করে, সে দুর্ণিবার দুঃখ আমাদের সমস্ত অবশিষ্ট জীবনকালকে বিষাদময় করিয়া দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও যখন আমাদের হৃদয়স্থ বিষাদ বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, আমারি হৃদয়ের অভিব্যক্তি বলিয়া উহা আমাদের অন্তরফলকে চিরমুদ্রিত হইয়া যায়, অপ্রাপ্ত-জীবন সর্ব্বস্বের নিবিড় বেদনা তখন নিবিড়তর হইয়া বিষাদের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কাঙ্গাল থাকিয়াই আমাদিগকে এ জীবনের নিকট চিরবিদায় লইতে হয়। তাই—

"ঘরের যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে!
ফলের বা'র নাইকো যার, ফসল যার ফল্‌লো না,
দুঃখের কথা ব'লতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জল্‌লো না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।"

মহাকবির এই করুণ উক্তি পাঠ করিয়া এতাদৃশ অবস্থাপন্নের মনে কি হয়, তাহা সেই জানে।

ভালবাসা ও মাতৃত্ব

শ্রী সুরেশচন্দ্র সিংহ

সাধারণতঃ ভালবাসা শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার দুর্জ্জয় শক্তির বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই শক্তির বিষয় অল্পাধিক পরিমাণে অবগত না আছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কোন চিন্তাশীল লেখক ভালবাসাকে এক মহাযজ্ঞ বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তটি বড়ই সমীচীন। ফলতঃ. পতঙ্গগণ যে রূপে অনলশিখাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করে, তদ্রূপ এই ভালবাসারূপ মহাযজ্ঞের হোমাগ্নিতে যে কত অগণিত নরনারী তাহাদের জীবন আহুতি প্রদান করিতেছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই শক্তির প্রভাবে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধরাবক্ষ রক্তস্রোতে অনুরঞ্জিত হইয়া আসিতেছে। ক্লিওপেট্রার কটাক্ষ-বিনিঃসৃত বহ্নি এন্টনিওকে যেরূপ দগ্ধ করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা এক প্রধান ঘটনা।

আবার এই শক্তির স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে যে কত দগ্ধ-হৃদয় শান্তিপূর্ণ হইয়াছে, তাহারই বা ইয়ত্তা কে করিবে?

একদিকে জ্বলন্ত বহ্নি অপেক্ষাও সহস্রগুণে প্রখর; অপরদিকে ইহার মাধুরী চন্দ্রমার সহস্র কিরণরশ্মিকেও পরাভূত করিয়া হৃদয়কে অমৃতরসে পরিপ্লুত করে।

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ বিপরীত ধর্ম্মাশ্রিত এই যে ভালবাসা, ইহার স্বরূপ কি? অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের জ্ঞানী ও প্রেমিকগণ এই তত্ত্ব নিরূপণ প্রয়াসী হইয়াছেন। জগতের যত কবিত্ব, এই ভালবাসাই তাহার মেরুদণ্ড এবং অধিকারভেদে ইহার ভাবগত বৈচিত্র্য থাকিলেও মূলতঃ সর্ব্বত্রই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পরস্পর আকর্ষণ, তাহারই উপর ইহার অধিষ্ঠান। বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যে ভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে ইহার বিকাশ, তাহাকেই প্রেম নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—রক্ত-মাংস-সংসৃষ্ট জীবদেহের যে আকর্ষণ, তাহাকে মোহঘটিত আসক্তি আখ্যা প্রদান করিয়া এই ভালবাসাকে অহেতুকী-ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিলেও স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের আকর্ষণের ভিতর দিয়া যে ইহার স্ফুরণ হইয়াছে, এই সকল মত তাহারই সমর্থন করিতেছে। আত্মত্যাগ ভালবাসার উচ্চ আদর্শ। এখন দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক-বিধি এই মতে অনুমোদন করিতেছে কি না।

সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, জীবন-প্রবাহ দুইপ্রকার সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছে; ইহার এক সংগ্রাম আত্মরক্ষার নিমিত্ত, অপর সংগ্রাম অন্যের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত। একের জয় নিজের প্রাধান্য-স্থাপন দ্বারা,

অপরের জয় আত্ম-বিসর্জ্জন দ্বারা। সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই পরস্পর-বিরোধী এই দুই শক্তির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে এবং জীবনরূপ-গ্রন্থি এই দুইটি বিভিন্ন-বর্ণযুক্ত সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। মানব যে সকল শক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণীজগতে নিজের একচ্ছত্র রাজত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদিগের মূল ভিত্তি আত্মরক্ষার্থ যে সমর, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এত সব সম্পদের অধিকারী হইলেও সে পশুরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুমাত্র। সে কেবল তখনই মনুষ্য নামের অধিকার লাভ করিবে, যখন অন্যের জীবনরক্ষার্থ সংগ্রাম-ইচ্ছা তাহার চরিত্রে প্রাধান্য-স্থাপন করিবে।

এই নিজ হইতে অন্যে গমন, জগতের ইতিবৃত্তের একটি বিশেষ ঘটনা; ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল ভালবাসার বিকাশ।

সৃষ্টির প্রাচীনত্বের সহিত তুলনায় এই ভালবাসার অভিব্যক্তি মাত্র সে দিনের ব্যাপার হইলেও, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জীবসৃষ্টির প্রারম্ভেই ইহার অনুসূচনা হইয়াছে। যদি একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত জীবাণুকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে সংস্থাপন করা যায়, দেখা যাইবে অনতিবিলম্বে ইহা দুইপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। আত্মরক্ষার্থ যে সংগ্রাম, তাহার বশীভূত হইয়া ঐ জীবাত্মা বাহির হইতে খাদ্য আকর্ষণ করিতেছে এবং অপর যে বিধি তাহার অনুশাসনে ইহার কিয়দংশ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতেছে; এবং পরিশেষে কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া উহা অপর একটী জীবাণুর আকারে প্রকাশ পাইতেছে।

জীবসৃষ্টির প্রারম্ভেই এই গ্রহণ ও প্রদান উভয়বিধি কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কোনরূপ আকস্মিক ঘটনাসম্ভূত নহে, জীবলোকের স্বভাবগত ধর্ম্ম। এই উভয়বিধ কার্য্যকে সহজ ইংরাজী ভাষায় nutrition ও reproduction বলে।

স্থাবর জঙ্গমাত্মক উভয়বিধ প্রাণীরাজ্যের মধ্যেই এই দুই উপায় সাধনদ্বারা জীবনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। আহার-গ্রহণ দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে জীবন-ধারণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সন্তান-উৎপত্তি দ্বারা জাতীয়-জীবন রক্ষা পায়। এই দুই বিভিন্ন পক্ষ সাধনার্থ বিভিন্ন উপায়ে এই দুই শক্তির কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। একের গতি নিজের দিকে, ইহা অন্তর্মুখীন এবং ইহার দৃষ্টি বর্ত্তমানে নিবদ্ধ; অপরটী বহির্মুখীন এবং ইহার দৃষ্টি ভবিষ্যতের উপর। অন্য কথায় বলিতে গেলে, এক নিজকে লইয়া ব্যস্ত, অপর আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল অন্যের হিতকামনাতেই নিমগ্ন।

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এই পরস্পর-বিরোধী উভয়বিধ ভাবের উপরই নৈতিক-জীবন প্রতিষ্ঠিত। আমরা এস্থলে দেখিতে পাইতেছি, জীব-জগতের প্রারম্ভেই কি প্রকারে এই পরস্পর-বিরোধী শক্তিদ্বয় একে অন্যের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কি উদ্ভিদ রাজ্য, কি গমনশীল জীবরাজ্য, এই উভয়বিধ রাজ্যের মধ্যে বংশরক্ষার্থ যে সকল আশ্চর্য্য উপায় ও কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে, উত্তরকালে তাহারই উপর অবস্থান পূর্ব্বক

মনোবৃত্তি সমুদয় বিকাশ লাভ করতঃ মানবকে পশুরাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক এত উচ্চ পদবী লাভের অধিকারী করিয়াছে। এই যে বংশরক্ষার্থ সংগ্রাম, ইহা আত্মরক্ষার্থ সংগ্রাম অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বরঞ্চ যে সকল উপায় অবলম্বনে ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা ভাবিলে চিত্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়।

উদাহরণ-স্বরূপ একটী বৃক্ষের বিষয় উল্লেখ করা যাক। শারীরতত্ত্ববিদের (phygiologist) চক্ষে ইহা একটী সামান্য বৃক্ষরূপে অনুভূত হইবে না, তাঁহাদিগের নিকট ইহা এই উভয়বিধ কার্য্য-সম্পাদনোপযোগী অসংখ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট একটী যন্ত্রবিশেষ। ইহার শাখাপ্রশাখা, শিখর, পত্র ইত্যাদি মুখ, ধমনী, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৃক্ষকে এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতেছে। উল্লিখিত যন্ত্রনিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আর একটী যন্ত্র বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার কার্য্যের সহিত এই সকল যন্ত্রের কার্য্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই এবং যাহা এই সকল যন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা বৃক্ষের পুষ্প। একটুকু অনুধাবনার সহিত এই পুষ্পের জীবন পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে, পুষ্পের যাহা কিছু সম্পদ সমস্তই পরহিতার্থে; বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃক্ষের জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত; কিন্তু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই মৃত্যুর আলিঙ্গনে আত্মজীবনকে বিসর্জ্জন দিতেছে! বৃক্ষ জীবন্ত, ইহার পত্রসমুদয় সতেজ ও সবুজ; কিন্তু আলোকস্পর্শে পুষ্পের জীবন প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই ইহার মুখে মৃত্যুর অভিনয়। প্রকৃতির এ কি নিষ্ঠুর ব্যবহার?

সৃষ্টির অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যে। সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ এই কুসুমের রচনায়। তবে কেন প্রকৃতি একদিনের জন্যেও তাহার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে নিজের সৌন্দর্য্য-ভোগের অধিকারিণী করিলেন না? কেন সৃষ্টির এ অসামঞ্জস্য? ইহার মধ্যে কি কোন নিগূঢ়-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে? মৃত্যুর অঙ্গুলিস্পর্শে ঐ যে পুষ্পদলটী শুষ্ক ও বিলীন হইয়া সঙ্কোচতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাকে উত্তোলন করিয়া দেখি, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ইহার অন্তরালে অভিনীত হইতেছে! অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত ক্ষুদ্র কোটরের মধ্যে বীজ সকল সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। জননী ইহাদের জীবনরক্ষার উপায় করিতে গিয়া নিজের জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়াছেন। যে খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুষ্প সংসারে অবস্থিতি করিতে পারিত, সেই খাদ্যভাণ্ডার অতি সংগোপনে ও অত্যধিক যত্নসহকারে পুষ্প ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের নিমিত্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, যেন সন্তানগণ সঞ্জীবনী শক্তিসংস্পর্শে জাগিয়া উঠিবামাত্রই ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির জন্য নিজের মুখের সম্মুখে ঐ খাদ্য-সম্ভার সজ্জিত রহিয়াছে, দেখিতে পায়। বৃক্ষ-জীবনে যে সকল আশ্চর্য্য কৌশলের সমবায় দ্বারা এই পুষ্প, ফল ও বীজ সকল সৃষ্ট হইতেছে, সে সমস্ত কার্য্যই পরের জীবন-রক্ষার্থ যে সংগ্রাম, তাহার ফল। ঐ যে তোমার সম্মুখস্থ কুসুমরাশি, যাহার সৌন্দর্য্যে বাগানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে ও যাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক

আমোদিত, ইহা কত নীরব প্রাণকেই না কবিত্বের ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রণয়িনীর কুন্তলদেশে সংস্থাপন দ্বারা অনুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থই তুমি ইহাকে চয়ন কর, অথবা উপাস্য-দেবতার চরণে অঞ্জলি-প্রদানার্থই তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, তুমি বলিবে, তোমারই চিত্ত-বিনোদনার্থ ইহার সৃষ্টি হইয়াছে; ইহা তোমারই সম্ভোগের সামগ্রী। সত্য বটে, ইহার অন্তরস্থ সঞ্চিত মধু তুমি পান করিতেছ; ইহার চিত্ত-উন্মাদী সৌরভ তোমাকে পাগল করিতেছে, ও ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তোমার অন্তরে কবিত্বের এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর; তিনি বলিবেন তোমার জন্য পুষ্পকে এরূপ সুন্দর পোষাকে পরিবেষ্টিত ও এরূপ সৌরভে অনুপ্রাণিত করা হয় নাই; এবং তোমার জন্য ইহার অন্তরে মধুভাণ্ডার সংস্থাপিত হয় নাই। তুমি যে এ সকল ভোগ করিতেছ, ইহা কেবল পুষ্প-সৃষ্টির গৌণফল (by-product)। সত্য বটে, পুষ্প প্রেমের সৃষ্টি, ইহার প্রতি পত্র প্রেমের সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত; ইহার সৌরভ প্রেমেরই আহ্বান ও ইহার অন্তরস্থ ভাণ্ড যে অমৃত-রসে পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা প্রেমের মদিরা।

প্রকৃতি অত্যাশ্চর্য্য কৌশল-সহকারে এই সমুদয়ে ফাঁদ পাতিয়াছেন—পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। এ সমুদয় স্রষ্টার সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনকল্পে (bait) চারস্বরূপ।

ভ্রমরকে প্রমুগ্ধ করিবার জন্যই পুষ্পে মধু সঞ্চিত রহিয়াছে। এই মধু আহরণ করিতে গিয়া ভ্রমর তাহার পাদদেশকে পুষ্প-পরাগে অনুরঞ্জিত করিতেছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ জানেন, একই বৃক্ষে পুং-জাতীয় ও স্ত্রী-জাতীয় উভয়বিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। পুষ্প চলচ্ছক্তিবিহীন। এই কীটপতঙ্গকে মধুলোভে আকৃষ্ট করিয়া একের পরাগরেণু অপরের গর্ভকোষ্টে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয়। এই উপায়ে গর্ভাধারে বীজের সৃষ্টি ও তাহা হইতে ভাবী-বংশের উৎপত্তি ও বংশরক্ষাকার্য্য সাধিত হয়। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়া থাকে যে, এক বৃক্ষে পুং-জাতীয় পুষ্প ও অন্য বৃক্ষে স্ত্রী-জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আবার কখনও বা একই বৃন্তে উভয়-জাতীয় পুষ্প বিকসিত হয়।

যে স্থলে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরাশির সঞ্চরণ কীট পতঙ্গাদির সাহায্য সাপেক্ষ, তথায় পুষ্পকে এইরূপ সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় বটে যে, যে সকল পুষ্প রজনীতে প্রস্ফুটিত হয়, তাহারা প্রায় সকলেই শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। এই ব্যাপারের মধ্যেও কি প্রকৃতির গূঢ়-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না? পুষ্পদিগকে শুভ্র-বসনে পরিহিত করা হইয়াছে, যেন ইহারা নিশাচর কীটপতঙ্গাদির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আবার এমন অসংখ্য কুসুম রহিয়াছে, যাহা পরিচ্ছদের কাঙ্গাল; কিন্তু অপর পক্ষে ইহারও অন্তঃস্থল অতুল সৌরভের

ভাণ্ডার;—উদ্দেশ্য সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কীট ইহার সন্ধান লইবে। পুষ্প মধু দ্বারা কীট-রাজ্যের পরিচর্য্যা করিতেছে। পক্ষান্তরে, কীটগণ পুষ্পের ভবিষ্যৎ-বংশরক্ষার উপায়-বিধান করিতেছে! Biologist-এর নিকট পুষ্প আর সামান্য পুষ্প নহে, ইহা ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগের প্রসবিতা ও পরের জীবনরক্ষার্থ আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বৃক্ষের বংশরক্ষার জন্যই পুষ্পের জন্ম। এই কার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্রই ধূলি হইতে সমুত্থিত পুষ্প আবার ধূলির সহিত মিশিয়া যায়। আত্মত্যাগই ভালবাসার লক্ষণ। এই পুষ্পের জীবনে কি আমরা ভালবাসার মৃদুমধুর ধ্বনির আভাস পাইতেছি না? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীগণ সম্বন্ধেও এই একই কথা। পতঙ্গের ঝিল্লীরব, কোকিলের মধুরশ্রাবী কণ্ঠধ্বনি, আর চক্রবাকীর হৃদয়স্পর্শী বিরহসঙ্গীত, এই সব মূলতঃ একই অর্থবাচক। পুষ্পোদ্‌গমের পূর্ব্বে বৃক্ষ যেরূপ নবপল্লবে পরিশোভিত হয়, তদ্রূপ কীটপতঙ্গাদি জীবগণও বুলি ফুটিবার পূর্ব্বে নূতন সাজে সজ্জিত হয়। বৃক্ষের ন্যায় এই বেশ-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই সকল জীবজন্তুর মধ্যে নবযৌবনের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি তাহার বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনকল্পে একদিকে যেরূপ ইহাদিগকে চিত্তাকর্ষক করেন, অপরদিকে তেমনই ইহাদিগের কণ্ঠমধ্যে অমিয়ভাণ্ডার স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরকে আসক্তির বন্ধনে সংবদ্ধ করে, অন্তরে আনন্দ-লিপ্সার জ্বলন্ত বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। প্রকৃতি রাজ্যের যত স্বাভাবিক সঙ্গীত, সকলের মূলেই এই আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। একটুকু অনুধাবনার সহিত চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, স্ত্রী ও পুং-জাতীয়দের মধ্যে পরস্পর মিলন উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি এই সকল কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভালবাসার পূর্ব্বরাগ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কবি কোকিলকে বসন্তের প্রিয়সখী ও কন্দর্পের দূতী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও কি এখানেই ভালবাসার জন্ম? সর্ব্বপ্রকার ইতর জন্তুর মধ্যেই মিলনের জন্য বৎসরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রহিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কেবল ঐ নির্দ্দিষ্টকালে স্ত্রী ও পুংজাতীয় জন্তু একত্র বাস করে। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর পরস্পরের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না; ভালবাসা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার লক্ষণও ইহাদিগের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের আকর্ষণ নাই।

এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, এই মিলনের জন্য বৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে কেন?

কাউন্ট ওয়েষ্টরমার্ক তাঁহার রচিত (History of Human Marriage) 'মানবজাতির মধ্যে বিবাহের প্রথা' শীর্ষক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বাদুড়ের মিলনকাল জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে; লবণ হ্রদের পূর্ব্বদিকস্থ মরুভূমের জঙ্গলে উষ্ট্রের মিলনকাল জানুয়ারী হইতে ফেব্রুয়ারী শেষ পর্য্যন্ত; তিব্বত দেশীয় চামরী ও নরওয়ের

রেনডিয়ারের সেপ্টেম্বর মাস, রেময় ও কস্তুরীমৃগের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। নেকড়ে বাঘের ডিসেম্বরের শেষ ভাগ হইতে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইত্যাদি। পক্ষী ও সরীসৃপের মিলনকাল বসন্তঋতু, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বিভিন্ন প্রকার জন্তুর জন্য দেশবিশেষে এই বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট করার মধ্যে প্রকৃতির যে এক নিগূঢ় অভিসন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ওয়েষ্টরমার্ক বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে পশু পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর পক্ষেই নবপ্রসূত শিশুর জীবন প্রাকৃতিক-অবস্থা ও আহার্য্য সামগ্রীর বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই মিলনের এরূপ সময়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহাতে নবজাত সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সময়ে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে।

যখন জগতের অভিব্যক্তি নৈসর্গিক নিয়মাবলীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সৃষ্টি-প্রকরণ ধারাবাহিকরূপে এই নিয়মাবলম্বনেই সংসাধিত হইতেছে, তখন ইহাও এক প্রকার নিঃসন্দেহচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, বংশরক্ষাকল্পে ইতরজন্তুদিগের মধ্যে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, মানবের আদিম অবস্থাতেও তদ্রূপই ব্যবস্থা ছিল। ইতর জন্তুর ন্যায় মানবজাতিরও সহবাসের নিমিত্ত বৎসরের বিশেষ সময় কিম্বা ঋতু নির্দ্দিষ্ট ছিল। কালসহকারে মানব যখন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ও বল্কলবস্ত্র ব্যবহার দ্বারা সূর্য্যের প্রখর কিরণ, শীতের দারুণ নির্য্যাতন ও বর্ষার বারিধারার আক্রমণ হইতে সন্তানের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইল এবং কিরূপে শস্য উৎপাদন করিতে হয় ও অসময়ের জন্য তাহা সঞ্চয় করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিল, তখন আর তাহার সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য অনুকূল সময়ের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন থাকিল না। শিশুকে কিরূপে লালনপালন করিতে হয়, জননী এখন তাহা শিক্ষা করিয়াছেন, আহার্য্য যোগাইবার ভার জনক আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন; এক কথায় বলিতে গেলে, পারিবারিক-জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে! একের সহানুভূতিতে অন্যের জীবনধারণের ভার লাঘব হইয়াছে, সহবাসের জন্য সময়ের অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল অবস্থার মুখাপেক্ষী হইবার আর কোন আবশ্যকতা থাকিতেছে না। ইহাই পারিবারিক-জীবনের প্রথম সূত্রপাত। স্বার্থত্যাগ ও পরস্পরের সহায়তা এতদুভয়ের সহযোগিতার উপর পারিবারিক-জীবন প্রধানতঃ নির্ভর করে। এই উভয়বিধ কার্য্যের মধ্যে ভালবাসার বীজ লুক্কায়িত থাকিলেও ইহার প্রকাশ সময়সাপেক্ষ। মানবজাতির আদি-অবস্থার বিষয় অবগত হইতে হইলে সভ্যতার আলোক হইতে সুদূরে অবস্থিত অরণ্যবাসী শিশু-স্বভাব অসভ্যদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদিগের জীবন সম্বন্ধে Henry Drummond লিখিতেছেন —

"Among the Horoaus, we are assured by authorities, the idea of love between husband and wife is hardly thought of; that at Winebal

not even the appeaurcane of affection exists between them; that among the Ben-Anur it is considered even disgraceful for a wife to show any affection for her husband.

The Eskimos treat their wives with great coolness and neglect.The cruelty with which wives are treated by the Australian aborigenes is indicated even in their weapons." p. 385.

Drummond যদি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া এখানেই নিরস্ত হইতেন, কোন ক্ষতি ছিল না তিনি এ বিষয়ে হিন্দুদিগকে ও অসভ্যদিগের সহিত একই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন—

"The very name 'Servant slave' by which the Brahmins address their wives and the wives' reply; Master, Lord' symbolizes the gulf between the two."

অবশ্য তিনি লেখনী-ধারণকালে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে, আর্য্যজাতির যে মূল শাখাকে তিনি অসভ্য বর্ব্বরদিগের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই শাখাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রসবিতা; এবং কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, মানবজীবনের সর্ব্ববিধ কালের মধ্যে অদ্যাপি ভারতের আর্য্যনরনারী জগতের আদর্শস্থল।

Drummond-এর ন্যায় পরমজ্ঞানী ও চিন্তাশীল লেখকেরও এরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মত দেখিয়া মনে হয় যে, প্রতীচ্যজাতির পক্ষে প্রাচ্যজাতির রীতিনীতি আচারব্যবহার সম্যক উপলব্ধি করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। সতী সীতা সাবিত্রীর জন্মে যে জাতি গৌরবান্বিত, সেই জাতি ভালবাসার উচ্চ-আদর্শবিহীন এরূপ অনুমান নিজের অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র হইলেও একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন হিন্দু-সমাজে যে চিরকালই এই উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা নহে; প্রাচীনকালে ব্রাহ্মবিবাহ অপেক্ষা আসুরিক বিবাহপ্রথা অধিক প্রচলিত ছিল।

স্ত্রীত্ব কি এবং পুংস্তই বা কি, আজ কোন বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হন নাই, অথচ সৃষ্টিক্রমের প্রথম প্রকটনের মধ্যেই এই লিঙ্গভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বংশরক্ষাই যে ইহার প্রধান কার্য্য, আমরা এযাবৎ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যে স্থলে অন্য উপায়েও এই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর, সেই স্থলে পুংজাতির ও স্ত্রীজাতির একত্র-বাসের কোন আবশ্যকতা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসরদেশীয় খজ্জুরবৃক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুংজাতীয় বৃক্ষ মরুভূমির অনুর্ব্বর প্রদেশে জন্মিয়া থাকে ও স্ত্রী-জাতীয় বৃক্ষ বাগানের শোভা পরিবর্দ্ধন করে। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার প্রাক্‌কালে মরুপ্রদেশ হইতে প্রবল বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারই সাহায্যে তত্রত্য বৃক্ষ-পরাগরেণু উদ্যানে প্রবেশলাভ করতঃ তথাকার খর্জ্জুর-পুষ্পের উর্ব্বরতা সম্পাদন করে।

অনেকস্থলে আবার এরূপও দেখা যায় যে, পুংসংসর্গ ব্যতীত সন্তানোৎপাদন সম্ভবপর হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ হংসের বাওয়াডিম্ব (Parthenog nosis) ও মৌমাছির গর্ভাধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদ্ভিদ-জগতে ত নানা উপায়েই এই বংশরক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ অবগত আছেন সৃষ্টিপ্রকরণ কিরূপে সাবধানতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার হঠকারিতা বা চঞ্চলতার স্থান নাই। কোনও লক্ষ্য প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া প্রকৃতি একবার যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহা অপরিহার্য্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। এইরূপ স্থলে এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, কেবল সন্তানোৎপাদনোদ্দেশ্যেই কি এই লিঙ্গভেদের সৃষ্টি বা ইহার মধ্যে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে? এতদ্‌সম্বন্ধে Wieseman বলিয়াছেন—

"I do not know what meaning can be attributed to sexual reproduction other than the creation of hereditary individual character to form the material on which natural-selection may work"

Biological Memoirs, p. 281

" নৈসর্গিক নির্ব্বাচনকার্য্যের সাহায্যকল্পে, উত্তরাধিকারীসূত্রেলব্ধ ব্যক্তিগত-স্বাতন্ত্র্য-সৃষ্টি ভিন্ন এরূপ সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থার যে অন্য কি অর্থ আছে, তাহা আমি জানি না।" Darwin কৃত *Origin of Species* নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই উক্তির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন। সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরিবারে আকৃতিগত যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে Wieseman এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। শারীরস্থানবিদ্যার হিসাবে এই উক্তির মধ্যে অনেক সত্য রহিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু লিঙ্গভেদের রহস্য যে এইখানেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। ইহার অন্তরালে কোন নৈতিক-তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে কি না তাহার আলোচনা করা যাউক।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণতঃ জীবসকলকে নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সর্ব্বনিম্নতরস্থ জীবন প্রোটোজোয়া নামে অভিহিত, কিলেনটারেটাইজ্‌ তদপেক্ষা সামান্য উন্নত, তৎপর কীট ও শম্বুক জাতীয় জীব। এই সর্ব্বপ্রকার প্রাণীই মেরুদণ্ডবিহীন। এই সকল হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই মীন-জাতীয় জীবের উল্লেখ করা যায়; তৎপরে জল ও স্থল—উভচর জীব। এই স্তন্যপায়ী জীবেতেই "মাতৃত্বের" প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে; তাহার পূর্ব্বে জন্মদায়িনীর পক্ষে মাতৃত্বরূপ উন্নত পদবী লাভ সম্ভবপর ছিল না। বিষয়টী একটুকু তলাইয়া দেখা যাউক। স্তন্যপায়ী জীবেব প্রকাশের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার জীবই অণ্ড প্রসব করিত। যাহাতে এই অণ্ড সুরক্ষিত হয় ও ইহা প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে অনুকূল স্থানে সংস্থাপিত হয়,

তৎসম্বন্ধে প্রসূতির যত্নের কোন ত্রুটী লক্ষিত হইত না এবং এখনও হয় না। সকলেই অবগত আছেন, নদীর শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে দূরে অথচ নাতিশীতোষ্ণ ও জল হইতে অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক কচ্ছপ তাহার ডিম্ব সংস্থাপন করে। ঠাণ্ডা লাগিয়া ডিম্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, জল হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ইহাকে স্থাপন করিতে হইলে কচ্ছপ-শাবককে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। প্রজাপতি অতিশয় সাবধানের সহিত তুঁতপত্রের নিম্নভাগে ডিম্বপ্রসব করিয়া থাকে, যেন ডিম্ব বাহিরের শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয় এবং গুটিপোকা তাহা হইতে বহির্গত হওয়ামাত্রই মুখের উপর আহার্য্য দ্রব্য লাভ করিতে পারে। এই উভয় স্থলেই প্রসূতি ভবিষ্যদ্‌বংশীদিগের রক্ষার জন্য আগ্রহাতিশয্য ও সাবধানতার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু ইহাকে মাতৃস্নেহ বলা যাইতে পারে না। গুটীপোকার অণ্ড প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই প্রজাপতির জীবলীলা শেষ হইয়া যায়। কচ্ছপ-জননীর পক্ষে নিজের সন্তানের সাক্ষাৎকারলাভ, কিম্বা পরিচয় গ্রহণের কোন উপায় থাকে না। মাকড়সা জাতীয় একপ্রকার কীট আছে; তাহাদের ডিমগুলি অতি যত্ন সহকারে নিজের বক্ষঃদেশে সংলগ্ন এক ঝুলির মধ্যে রক্ষিত হয়। ডিম্ব প্রস্ফুটিত হওয়ামাত্রই জননী প্রাণত্যাগ করে এবং সদ্য-প্রসূত শিশুগুলি যতদিন পর্য্যন্ত অন্যত্র গমনের উপযুক্ত না হয়, জননীর মৃতদেহই তাহাদিগের একমাত্র আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সন্তানের হিতার্থে আত্মত্যাগের কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত! কিন্তু এখানেও মাতৃভাবের সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আত্মত্যাগ পূর্ব্বোল্লিখিত পুষ্পের আত্মত্যাগের ন্যায় একই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। জননী নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা মা বলিতে যাহা বুঝি, তাহার কোন চিহ্নই এই স্থলে বিদ্যমান নাই। শিশুর লালনপালন সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার অভাব বিমোচনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা ও যত্ন মাতৃত্বের লক্ষণ। প্রসূতিকে এই মাতৃপদবী লাভ করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ চারিপ্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিতে হইয়াছে।

১ম—একসঙ্গে প্রসূত সন্তানের সংখ্যাধিক্যের খর্ব্বতা।

২য়--- প্রসূতির সহিত সন্তানের অবয়বগত সাদৃশ্য।

৩য়—ভূমিষ্ঠ সন্তানের আত্মরক্ষায় অসমর্থতা।

৪র্থ—প্রসূতি ও সন্তানের একত্র অবস্থানের ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত কথাগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাউক। মৎস্য একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ভেকও সহস্র পরিমাণ ডিম্বের প্রসূতি। সরীসৃপ-জাতীয় জন্তুসকলও শত শত ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল ডিম্ব হইতে প্রস্ফুটিত শত সহস্র ও লক্ষ লক্ষ সন্তানকে নিজের সন্তান বলিয়া জানাই অসম্ভব; আর জানিতে পারিলেও এক মাতার পক্ষে এতগুলি সন্তানের লালনপালন ও সংরক্ষণ কিছুতেই সম্ভব নহে। আর এই

সন্তানেরাও সেই সেই যত্নের মুখাপেক্ষী নহে। ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্রই নিজের জীবনরক্ষার উপায় নিজেই করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধের সম্পূর্ণ অভাব! ইহাদিগকে সন্তান না বলিয়া বরং ইংরাজীতে যাহাকে offspring বলে, ঐ নামে অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত হইবে। ইহারা যেন ভেকের ন্যায় এক লম্ফে জননীর দেহ হইতে উৎপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-রাজ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। কিন্তু যতই আমরা উপরের দিকে গমন করিতে থাকি, ততই দেখিতে পাই, সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে এবং পরিশেষে একটীমাত্র সন্তানেই পর্য্যবসিত হইতেছে। তৎসম্বন্ধে সৃষ্টির নিম্নস্তরস্থিত জীবের মধ্যে এই সাদৃশ্যের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। কোন কোন জন্তুর সন্তানের অবয়বগত বৈষম্য এত অধিক, যে বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদিগকে ভিন্ন শ্রেণীর জন্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ স্থলে প্রজাপতি ও গুটিপোকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় নিজের সন্তানকে চিনিয়া লওয়াই অসম্ভব! যতই আমরা সৃষ্টির উন্নততরস্তরে আরোহণ করি, ততই ঐ আকৃতিগত বিসদৃশ ভাবের লোপ ও সাদৃশ্য সংস্থাপিত হইতেছে, দেখিতে পাই। ছাগ, মেষ ও গরু প্রভৃতি জন্তুর মধ্যে এই সাদৃশ্য এত অধিক যে, শাবক জননীর ছোট খাট একটী প্রকৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল জন্তুর মধ্যে সন্তানের প্রতি প্রসূতির যে কি প্রগাঢ় আকর্ষণ, তাহা সকলে অবগত আছেন। আমি একবার দেখিতে পাই। রাস্তার উপর একটী মেষ চরিতেছে, ইহার পাশে একটী সদ্যঃপ্রসূত মেষশাবক ক্রীড়া করিতেছিল। একটী বালক দুষ্টবুদ্ধিবশে শাবকটিকে মেষের নিকট হইতে ছিনিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মেষের যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা অনেক দিন বিস্মৃত হইতে পারি নাই। পরিশেষে মেষের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া বালক যখন অন্যান্য কয়েকটী বালকের সাহায্যে মেষশাবককে উত্তোলন পূর্ব্বক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন জননীর সকরুণ আর্ত্তনাদ ও পাগলিনীর ন্যায় ঐ বালকের অনুসরণ এবং তাহার হস্ত হইতে শাবককে রক্ষা করিবার জন্য শত সহস্র প্রকারের চেষ্টা,—এই সকলের স্মৃতি অদ্যাবধি প্রস্তরবক্ষে খোদিত লিপির ন্যায় আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মেষের ন্যায় স্তন্যপায়ীমাত্রেরই জীবন একমাত্র স্তন্যদুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ঐ দুগ্ধের অভাব হইলে সন্তানের ধ্রুব মৃত্যু। এই আত্মরক্ষার অসমর্থতা যে স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানেই জননীর শিশুর সংরক্ষণ ও অভাব বিমোচনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতি মাতৃমূর্ত্তির অভিব্যক্তির নিমিত্তই লিঙ্গভেদ দ্বারা বংশরক্ষার উপায়বিধান করিয়াছেন; কিন্তু ইহা মাতৃভাবের পূর্ব্বাভাসমাত্র। মেষশাবক আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থায় জগতে অবতীর্ণ হইলেও ইহার অভাব এতই সামান্য যে এই সমস্ত বিমোচন করিবার জন্য জননীকে বিশেষ কোন

আয়াস-স্বীকার করিতে হয় না;—ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই সন্তান নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইতে ও দৌড়াইতে সমর্থ হয়; শারীরিক বলও যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। শরীর ঘন-সন্নিবিষ্ট কোমল, লোমে আচ্ছদিত থাকায় নৈসর্গিক বাধাবিঘ্ন সকল অতিক্রম করিবার জন্য জননীর সাহায্যের প্রয়োজন রাখে না। সুতরাং মাতৃত্ব এখানে নিজ শক্তি-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছেন না। মেষশাবক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সর্ব্বপ্রকার স্তন্যপায়ী পশু-শাবক সম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য।

পশুরাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক মানবসমাজে যখন আগমন করি, তখন কি দেখিতে পাই? মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ইহার জীবনরক্ষার জন্য কতই না উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রাণীজগতে এরূপ অসহায় অবস্থায় আর কাহাকেও আগমন করিতে দেখা যায় না। অপরের সাহায্য না পাইলে এই শিশুকে প্রসবমাত্রই মৃত্যুর আলিঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত। পশুরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় একটী শিশুর সহিত মানবশিশুর যদি তুলনা করি, তবে দেখিতে পাই, একজন জন্মের অব্যবহিত পরেই জননীর পার্শ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে; কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই সে বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় আরোহণ ও আহার্য্য সংগ্রহ দ্বারা নিজের জীবনরক্ষার উপায়বিধান করিতেছে। মানব-শিশুকে কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসরকাল সর্ব্বপ্রকার অভাব-বিমোচন ও জীবনরক্ষার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। যে সকল অস্থি ও মাংসপেশীর সমবায় মর্কট-শিশুতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানব-শিশুর তাহার কোন একটারও অভাব নাই। তবে এই বৈষম্য কেন? সৃষ্টিকার্য্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল; শেষ সীমানায় উপস্থিত হইবামাত্রই ইহার গতি হঠাৎ এরূপ পশ্চাদ্‌গামিনী হইল কেন? প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

আমরা দেখি, শিশুকে এরূপ অসহায় অবস্থায় সংস্থাপিত করিয়া প্রকৃতি মাতাকে সৃষ্টি করিতেছেন। অবশ্য সৃষ্টির আরম্ভে প্রত্যেক অসভ্য-জননীই যে সন্তানের জন্য এতটা ক্লেশ স্বীকার করিতে রাজী হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহাদের প্রতি প্রকৃতির অনুশাসন এই যে, "সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—আমার এই অসহায় নূতনসৃষ্ট জীবকে তোমার বক্ষে ধারণ করিয়া ইহার সর্ব্বপ্রকার অভাব বিমোচন কর।" যে জননী এই আদেশ-পালনে রাজী হইলেন না, তাহার সন্তান অচিরে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল এবং অযোগ্যা রমণীর সঙ্গে তাহার বংশও লোপ পাইয়া গেল; কিন্তু ঐ রমণীর বিনাশে অন্য সকলের শিক্ষালাভ হইল এবং তাহারা স্ব স্ব শিশুর জীবনরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিল।

ইহাই পারিবারিক-জীবনের মূলভিত্তি এবং এই ভিত্তির উপরই সেই প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত, যাহা পশুরাজ্য হইতে মানব-রাজ্যকে পৃথক করিয়া দিতেছে। এই মানবশিশুর

জন্মপরিগ্রহ সৃষ্টি-রাজ্যের একটী বিশেষ ঘটনা। যে নিগূঢ় উদ্দেশ্যে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কোটী কোটী বৎসরের পরিশ্রমের পর আজ তাহার সার্থকতা হইল। এই মানবশিশুর আগমনদ্বারা কেবল যে একটী জড়দেহধারী জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে; ইহাকে অবলম্বন করিয়া নৈতিকজীবন জগতের ইতিবৃত্তে এই সর্ব্বপ্রথম হইল। এই অসহায় মাংসপিণ্ডপ্রতিম শিশুই সর্ব্বপ্রকারের কোমল ও কমনীয় বৃত্তির আদি-শিক্ষক। মানব-শিশুকে আত্মরক্ষার্থ এই প্রকার অক্ষম অবস্থায় প্রেরণ করিয়া স্রষ্টা যে কেবল নৈতিক-জীবনেরই উদ্ভব করিয়াছেন, তাহা নহে; ইহার মধ্যে আরও বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ অবগত আছেন একটী বিশেষ যন্ত্রবৈচিত্র্য মানবশিশুকে বানর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীজগৎ হইতে পৃথক করিতেছে। ইহা মানবের মস্তিষ্ক। এই যন্ত্রটী এরূপ জটিল এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী এরূপ সূক্ষ্মভাবে ও নিপুণতার সহিত নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আমরা ইহার ধারণাই করিতে পারি না। প্রকৃতি শিশুকে অসহায় অবস্থায় সংস্থাপন করিয়া একদিকে যেমন মানবের পাশবিক বৃত্তিনিচয়ের উপর নৈতিক-বৃত্তির আধিপত্য বিস্তারের উপায় বিধান করিতেছেন, অপরদিকে যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টি উন্নতির সোপানে প্রধাবিত হইতেছিল, শিশুকে সেই উদ্দেশ্য-সম্পাদনের উপযোগী করিয়া গড়িতেছেন। ইতরজন্তুর জীবনপ্রবাহ কলের ন্যায় এক চিরন্তন পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে অভিনবত্বের লেশমাত্রও নাই। মানবশিশু কিন্তু এরূপ একটী স্বতশ্চল যন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতঃপর আর কোন প্রকারের নূতন জীবের সৃষ্টির প্রয়োজন হইবে না। বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার এই বিশাল শিল্পশালায় মানবকে প্রথম শিক্ষানবিশ ও তৎপর সহযোগীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাহা দ্বারা অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন, নূতন কার্য্যের সমাধান ও জীবন-রহস্যের অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য-সাধনার্থ মস্তিষ্করূপ যন্ত্রকে যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট করা প্রয়োজনীয়, তাহার সংযোজন ও বিকাশের নিমিত্তই মানব-শিশুকে এত দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

বংশরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহা দ্বারা চালিত হইয়া মেষ গো মহিষাদি সর্ব্ব প্রকার ইতরজন্তু নিজের শিশুসন্তান রক্ষার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে; সেই প্রবৃত্তির প্ররোচনাতেই অসভ্য-জননী তাহার মুখপানে তাকাইল, শিশু মাতার সহিত সম্বন্ধজ্ঞাপক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে মুখ ফিরাইল এবং শিশুর অধরে মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। অমনি জননী আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল "এ কি এ কি। এ যে অপার্থিব জিনিস, স্বর্গের ধন। এমন হাসি ত পৃথিবীতে সম্ভবে না। এরূপ দৃষ্টি ত মানবের হইতে পারে না!" প্রকৃতপক্ষেই ইহা পার্থিব জিনিস—ঐ মাংসপিণ্ড যাহাকে জননী আপনার সন্তান বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক পদার্থ! বিদ্যুৎ যেমন ধাতব-পদার্থের সংযোগে নিজকে প্রকাশিত করে, অথচ ইহা ধাতু-শলাকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; তেমনি ঐ যে হাসি, ঐ যে দৃষ্টি, তাহা এই জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক! আত্মপ্রকাশের জন্য শিশুর দেহ উপলক্ষ্য মাত্র!

এই যে ভুবনভোলান হাসি, এই যে প্রণোন্মাদক দৃষ্টি, ইহারই ভিতর দিয়া ভালবাসার প্রথম আত্মপ্রকাশ। ইহা জন্মবিহীন, অজর, অমর, অহেতুক ও অতুলনীয় জিনিস। প্রকৃতপক্ষে ইহাই স্বর্গের অমৃত;—শিশুর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া জগতকে আনন্দরসে নিমজ্জিত করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই শিশু জগতে আগমন করে নাই, ততদিন পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহা আসক্তিমাত্র ছিল; মানব পশুরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পশুমাত্র ছিল; স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণ আসঙ্গলিপ্সার নামান্তরমাত্র ছিল। ভালবাসা রমণীর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল; স্বামী সেই নিভৃত কক্ষের সন্ধান পান নাই; রমণীও সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার কোন অবসর প্রাপ্ত হন নাই। শিশুই সেই অন্তরস্থ কক্ষের দ্বার উদঘাটন পূর্ব্বক ভালবাসার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই ভালবাসার মধ্য দিয়াই জনকজননী সর্ব্বপ্রথম পরস্পরের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

কাব্যে প্রেম—প্রেমে কাব্য

শ্রী তারাপ্রসন্ন ঘোষ (বিদ্যাবিনোদ)

আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। বিকাশোন্মুখ যৌবনে শ্রীগুরুদেব কর্তৃক জ্ঞানাঞ্জনশলাকোন্মীলিত নয়নে কাব্য-পাঠে ও কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিয়াছিলাম, যাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পৌঁছায় না, তাহা কাব্যরূপী হইলেও বস্তুতঃ কাব্য নহে। সুতরাং কাব্য-নির্ণয়ের জন্য "কাব্য-নির্ণয়" ("কাব্য-নির্ণয়"—লালমোহন বিদ্যানিধি সংকলিত বাঙ্গলা অলঙ্কার-গ্রন্থ) চাই না, চাই—সরল, সরস, উদার প্রাণ। প্রাণবায়ুর প্রতি উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে কাব্যের ভাবস্রোতঃ যদি পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়ে রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া না দেয়, কাব্যের এক একটী ভাব লহরীর সমাগমে যদি পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়সাগর উদ্বেল হইয়া না উঠে, কাব্য-রসে যদি পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয় পর্য্যাপ্লুত না হয়, তবে সে কাব্য কাব্যই নহে। জগন্নাথের দারুময়ী মূর্ত্তি যেমন জগন্নাথ নহে—উপাসকের কল্পিত প্রয়োজনানুরূপ অনিত্য কাষ্ঠের গঠনমাত্র, রসহীন বাক্য গ্রন্থও তেমন কাব্য নহে, গ্রন্থকারের অনিত্য প্রয়োজনানুরূপ পদোচ্চয় মাত্র। তাই দেখিতে পাই, কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া "কবিরাজ" কাব্যের বহিরাকৃতির দিকে আদৌ দৃক্‌-পাত করেন নাই,—দেখিয়াছেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন প্রধানতঃ কাব্যের প্রকৃতি, কাব্যের প্রাণ, কাব্যের আত্ম, কাব্যের রস।

রস-স্নেহ-প্রেম। প্রেমে প্রাণ আর্দ্র করে, শীতল করে, কোমল করে, বিগলিত করে। প্রেমে প্রাণ প্রফুল্ল করে, প্রোৎসাহিত করে, প্রোত্তেজিত করে। প্রেমে পরকে আপন করে, আপনাকে ভুলাইয়া দেয়। প্রেমে আনন্দ কুড়াইয়া আনে, আনন্দ ভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত করে; আনন্দ বিশ্বে বিলাইয়া দেয়। প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়; প্রেমে ক্রোধের সঞ্চার করে, উত্তেজনার উদ্রেক করে; প্রেমে বীভৎসা, প্রেমে বিস্ময়; প্রেম চিত্তবৈক্লব্যের কারণ; প্রেমে স্থিরতা, প্রেমে অধীরতা; প্রেমে অনুরাগ, প্রেমে বিরাগ; প্রেমে উৎকণ্ঠা, প্রেমে অভিমান; প্রেমে বিরহ, প্রেমে মিলন; প্রেমে বিগ্রহ, প্রেমে সন্ধি, প্রেমে সৌভাগ্য, প্রেমে বৈরাগ্য, প্রেমে ক্ষান্তি, প্রেমে শান্তি, প্রেমে ভক্তি, প্রেমে মুক্তি।

এবম্ভূত প্রেমের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,—

"পীরিতি পসার লইয়া ব্যভার
দেখি যে জগৎময়।"

—(চণ্ডীদাস)

আবার পরমুহূর্ত্তে প্রেমের প্রকৃতি যেন বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—

" কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।
কোন্ বিধি সিরজিল স্রোতের সেওঁলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি।।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।"

—(চণ্ডীদাস)

অনুরাগে আত্মবিক্রয় করিয়া শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,—

"তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়।।
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি।।
গুরুজন মাঝে যদি থাকয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া।।
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল।।
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাশরিতে নারি।"

—(চণ্ডীদাস)

বিরহে অধীরা হইয়া আবার সখীকে বলিতেছেন,—

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব।।
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে।।
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ-নাম শুনে।।
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।।

সোইত তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়।।
কব হুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া পরশনে।।
পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব।"

—(বিদ্যাপতি)

যে প্রেমে আত্মবিক্রয়, যে প্রেমে হা-হুতাশ, সেই প্রেমের স্বরূপ কি বুঝিতে না পারিয়া সখীকে বলিলেন,—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি— অনুভব বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুরণ না গেলি।।
কত বিদজন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।"

—(বিদ্যাপতি)

এই প্রেম-রসের রসিক কে, তাহার নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রসিক-কবি চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।।
সখিহে রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মসলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে।।

রস পরিপাট সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পুরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে।।
সেই রস পান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে
উছলিয়া বহি যায়।

—(চণ্ডীদাস)

এই প্রেম-রসের আকৃতি-প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া গাইয়াছেন,—

প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মূরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম তায়।।
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল বলে।।
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট্ ফট্
জীয়ন্তে মরিয়া যায়।।
তাহার মরণ জানে কোন্ জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই।।
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি করে ছট্ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে।।

—(চণ্ডীদাস)

প্রেমের এতাদৃশী ব্যক্তিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—যাহাতে প্রাণ স্পর্শ করে না—হৃদয় আলোড়িত মথিত হয় না, যাহা শুধু মস্তিষ্কের খেলা—চিন্তার বিষয়, তাহা কাব্য নহে; পদ্য হইতে পারে।

তারপর, প্রেমের উন্মাদনা যৌবনেই। সুতরাং যৌবন-প্রেমেই কাব্যের প্রধান স্ফুর্ত্তি। তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেম সাধক বৈষ্ণব-কবির মুখে যৌবন-উচ্ছ্বাসেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে আবেগ, উদ্বেগ আছে বটে, কিন্তু

"আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ।"

এই জন্যই দেবর্ষি নারদ প্রেমের, ভক্তির স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"যথা ব্রজ-গোপিকানাম্।"

প্রেমে যদি আপনা ভুলিয়া যায়,—চেতনাচেতনে, স্থাবরজঙ্গমে যদি প্রেমাস্পদের উপলব্ধি হয়, তবেই প্রেম সার্থক, তবেই প্রেম ধন্য। কদমতলে, তমালমূলে, যমুনা-সলিলে, কোথায় না শ্রীরাধিকার কৃষ্ণোদ্দীপন ভ্রম ঘটিয়াছে! এই ত প্রেম—এই ত প্রেমের আদর্শ! এই শ্রীরাধিকার প্রেমের মাধুর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্যই নাকি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাঃ
ওদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

"ভালবাসা ভালবাসা—ও শুধু কথার কথা কবির কল্পনা"—হইতে পারে, কিন্তু প্রেম তা' নয়, প্রেম—"সচ্চিদানন্দরূপম্", "সত্যং শিবং সুন্দরম্"।

প্রেম সৎ। প্রেম "কবির কল্পনা" নয়, প্রেম নিত্য সত্য সনাতন। প্রেম—বাস্তব রচনা বাস্তব ভাবনা, বাস্তব ধারণা, প্রাণমন মাতোয়ারা, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাব। প্রেম সন্নয়—প্রেম সৎ।

যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, তাহাতেই প্রেম; যাহা অসৎ অবিদ্যমান, তাহাতে প্রেম নাই। স্থিতিতেই প্রেম—প্রেমেই স্থিতি। প্রেম পালনী শক্তি—প্রেম রক্ষণী-শক্তি। প্রেম বিষ্ণু-প্রেম বৈষ্ণব।

অবৈষ্ণবগণ চটিবেন না। এ'টি আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে, কবি হইতে হইলে তাহাকে বৈষ্ণব হইতে হইবে; নামরূপে না হইক—আকারে আচারে না হউক, প্রকৃতিতে প্রবৃত্তিতে তাহাকে বিষ্ণুভাবাপন্ন হইতে হইবে। আপনি কালিদাস হউন, ভবভূতি হউন, মাঘ হউন, শ্রীহর্ষ হউন, Shakespeare হউন, Tennyson হউন, Goethe হউন, Virgil হউন,—আপনি শাক্ত হউন, শৈব হউন, বৌদ্ধ হউন, খৃষ্টীয়ান হউন, আপনার কবিত্বের সাফল্যের মূলে ঐ বৈষ্ণব-ভাব—বৈষ্ণব-প্রকৃতি—বৈষ্ণব-প্রবৃত্তি,

সাক্ষাৎ-ভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, নিহিত রহিয়াছে। আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে একথা বলিতেছি না,—ধর্ম্মমত লইয়া একথা বলিতেছি না,—সাম্প্রদায়িক উৎকর্ষাপকর্ষের হিসাবে বলিতেছি না। আমি বলিতেছি "বিষ্ণুভাব" লইয়া, যেহেতু প্রেম বা প্রীতি "স্থিতিরূপা চ পালনে"। যেহেতু আমার বিশ্বাস, 'স্থিতিতেই প্রেম—প্রেমেই স্থিতি। তাই আমার আনুষঙ্গিক বিশ্বাস—প্রেম বৈষ্ণব; এখন প্রেম যে ভাবেই থাক্, যে অবস্থায়ই থাক্।

সুতরাং কাব্যের মূল বা সৃষ্টি প্রেমে, স্থিতি প্রেমে, বৃদ্ধি প্রেমে। কবিকেও আমি বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভাবাপন্ন মনে না করিয়া পারি না। আমার বাঙ্গালার কবিদের প্রতিই এই "বৈষ্ণবভাবাপন্নতা" প্রযোজ্য—আমাদের রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দাশরথি, নীলকণ্ঠ—কেহই এই বৈষ্ণব-প্রভাব—এই প্রেমের প্রভাব এড়াইয়া কবি হইতে পারেন নাই—কাহারই কাব্য প্রেম-প্রভাব-পরিমুক্ত নহে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বলিতে কি এই যে 'গীতাঞ্জলি'র মহিমায় রবীন্দ্রনাথ যুরোপকে মুগ্ধ করিয়া "কবিসম্রাট্" বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, সেই গীতাঞ্জলিও, আমাদের মনে হয়, এই বৈষ্ণব-প্রেম-সৌরভে ভরপূর। যতই কাব্যালোচনা করিতেছি, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

এই যে বিষ্ণুভাব বা প্রেমের কথা বলিতেছি, এই প্রেম সদয়, সরল, উদার, সরস। ক্ষুদ্র আমরা, আমাদের এই প্রেম-সাগরের "দুধারে সংযম-বেলা", থাকিতে হয়, থাকুক; কিন্তু "উর্দ্ধ নীলাকাশ" "দানবকুলের মণি" দানব-রমণী "রুদ্রপীড়-জায়া" ইন্দুবালার প্রেমে কবি এই সদয়, সরল, সরস, উদার ভাব দেখাইয়াছেন। নবীনচন্দ্রও শৈলজা, সুভদ্রা, জরৎকারুর প্রেম এই ভাবই দেখাইয়াছেন। আকাশের স্থিতি সর্ব্বত্র সমান—সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন; ঘটাবদ্ধ, পটাবৃত আকাশে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও উহা বস্তুতঃ এক, অভিন্ন; তদ্রূপ দেশকাল-অবস্থা পাত্র—ভেদে—শুদ্ধপ্রেমে ভাষান্তর প্রতীয়মান হইলেও, উহা এক বা—অভিন্ন; সর্ব্বত্রই উহার স্থিতি এক সুতরাং প্রেম সৎ।

যাক্। তারপরে প্রেম—চিৎ, চিন্ময়। প্রেম নিত্য জাগরুক সচেতন থাকিয়া প্রেমাস্পদকে হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিয়া অনন্ত অতৃপ্ত সুখ ভোগ করিতে চায়। "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে" রাখিয়াও শ্রীরাধিকার তৃপ্তি নাই। দিনেকের বিচ্ছেদে যেন যুগান্তর প্রলয়। বিরহে প্রাণ যায় যায়—আর বুঝি দেহে প্রাণ থাকে না! তবু নশ্বর দেহের একেবারে বিনাশ, বিলোপ করিতে চায় না। যদি বা পুনর্ম্মিলনের পূর্ব্বেই বিরহাসহিষ্ণু প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া আকাশে মিলাইয়া যায়, তথাপি—

"না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে!
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।।

সোই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়।।
কব হুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-পরশনে।।"

প্রিয়ের শ্রীঅঙ্গস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শে গতাসু-দেহে পুনঃ প্রাণ সঞ্চারিত হইবে—'মরা-গাঙ্গে জোয়ার বহিবে'—শুষ্কতরু মঞ্জুরিবে। চেতন হইয়া—চেতন থাকিয়া চিরানন্দ উপভোগ করিবে। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। তাই প্রেম—চিৎ—চিন্ময়।

প্রেম চায় আনন্দ—প্রেম চায় সুখ। প্রেমাস্পদকে পাইয়া—প্রেমাস্পদকে উপভোগ করিয়াই প্রেমিক সুখী। এই সুখে, এই আনন্দে তিলমাত্র নিরানন্দ সে চায় না। নিরানন্দ প্রেমের ধর্ম্ম নহে, প্রেমের কর্ম্ম নহে। যদিও শ্রীরাধিকা বলিতেছে—

" কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনি ।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।।
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ হাম পাশ।।"

—(বিদ্যাপতি)

যদিও —

"কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাস।
দিবস লিখি লিখি নগর খোয়ায়নু
বিছুরল গোকুল নাম।।
হরি হরি কাহে কহব ও সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ।।
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশন হুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি সবহু কুসুমে রমি
না তেজই কমলিনী লেহ।।
আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পরাণ।"

—(বিদ্যাপতি)

এই হা হুতাশের মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে—পুনর্ম্মিলনের আসার আনন্দ আছে, তাহা রসিক প্রেমিকেরই বোধগম্য। প্রেমিকের প্রেমে বিরহাবস্থায়ও একটা স্থির আনন্দ আছে। তাই রাধিকা বড় জোর করিয়া সখিকে বলিতেছেন—

"কানুসে কহবি কর জোরি।।
বোল দুই চারি শুনায়বি মোরি।।
মুঝে কত পরীখসি আর।
তুয়া আরাধন বিদিত সংসার।।
হামুছন না টুটব লেহা।
সুপুরুখ বচন পাষাণক রেহা।।"

—(বিদ্যাপতি)

বিরহানলে দগ্ধীভূত হইয়াও পুনর্ম্মিলনানন্দের উপভোগের জন্য সানন্দ উৎকণ্ঠা। তারপর, প্রেম মুক্তি চায় না, চায় ভুক্তি। প্রেমিক প্রেমাস্পদ হইতে একটু "আলাহিদা" থাকিয়া নিত্য, শুদ্ধ প্রেমানন্দ ভোগ করিতে চায়—প্রেমস্পদে একীভূত হইতে চায় না।

" আত্ম সমর্পণ জীবন যৌবন
তথাচ ভাবয়ে ভিন।"

ভক্ত রামপ্রসাদও প্রেমানন্দে গাইয়াছেন,—

"চিনি হওয়া ভাল নয় চিনি খেতে ভাল বাসি।"

এতাদৃশ মধুর রসাস্বাদনই প্রেম। প্রেম আনন্দ—আনন্দময়।

তবেই মনে হয় প্রেম সচ্চিদানন্দ। যাহা সৎ তাহাতে সত্য, যাহা চিৎ তাহাতে শিব, যাহাতে আনন্দ তাহাতেই সুন্দর। সুতরাং সচ্চিদানন্দ প্রেম যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্", তাহা এই অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

এমন প্রেমের "জাহ্নবী যমুনা-বিগলিত করুণা" ধারায় সুসিক্ত হইয়াই বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-কাব্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দশদিক আমোদিত করিতেছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে শিশিরকুমার পর্য্যন্ত। এত বড় মহান্ কাব্য-কলাপ জগতে, বুঝি, আর নাই।

শেষ কথা। আলঙ্কারিক মণীষীরা এই প্রেমরসকে কোনও বাচক-সংজ্ঞা না দিয়া "আদি রস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "আদি" ত বটেই—সকল রসের মূল—সকল রসেব জনয়িতা। এই রস হইতেই সকল রসের উদ্ভব। আলঙ্কারিকের দশটী রস—স্থায়ীভাব, সঞ্চারী ভাব, ব্যভিচারী ভাব—যে ভাবেই পর্য্যালোচনা করি, দেখিতে পাই উহারা একই "আদিরসের"—প্রেমের অবস্থান্তরে অভিব্যক্তি মাত্র, এখন যে ভাবেই তাহা উৎসারিত হউক না কেন।

"রসের পীরিতি রসিক জানয়ে।"

তাই, নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে ইচ্ছা হয়—শুধু তথাজ্ঞাত বৈষ্ণব কাব্য নহে, কাব্যমাত্রই প্রেম-সৌরভে ভরপুর। কাব্যের রচনায় কবির আনন্দ পাঠে, এবং আবৃত্তিতে পাঠকের এবং শ্রোতার আনন্দ। আনন্দের উদ্ভাবনা প্রেমের উন্মাদনাই কাব্যের প্রকৃতি।

বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-কবি

শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু

ভাষা দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি হয়। জাতীয়-ভাষা জাতীয় ভাবই প্রকাশ করে। যখন ব্যক্তি কি জাতির অন্তরে কোন প্রবল ভাবের স্রোত বহিয়া থাকে, তখন সেই ব্যক্তি অথবা সেই জাতির ভাষাও সেই ভাবস্রোতের অনুবর্ত্তী হয়। আর্য্যঋষিগণ যখন ভারতে অনার্য্য "দস্যু" দিগকে পদানত করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের বিজয়োল্লাসে ভারতভূমি মুখরিত হইতেছিল, যখন নূতন দেশ, বিচিত্র গিরিরাজি, পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী, সুফল তরু এবং শ্যামলক্ষেত্র সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের স্রোত বহিয়াছিল, তখন সেই মহাভাবস্রোত অনুগমন করিয়া যে ভাষার মন্দাকিনীধারা ছুটিয়াছিল, সমগ্র জগতের লোক তাহার কণামাত্র আস্বাদনের জন্য আজ পর্য্যন্ত কত উৎসুক! কালে সেই ভাবস্রোত ও ভাষামন্দাকিনীতে ভাটা আসিয়াছিল, এককালে তাহারা শুষ্ক হইয়াছে। আমরা কেবল কতকগুলি রত্ন "সুবর্ণরেখা"র বালুকারাশির মধ্য হইতে সাদরে সংগ্রহ করিয়া মানবসমাজের রত্নাগারে রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

বহুশতাব্দী পরে যখন সেই সনাতন ভাব পুরাতন হইল, যখন বৈদিকধর্ম্ম নূতন ও মনোহর পরিচ্ছদে সাধারণের সমক্ষে বাহির হইল, যখন যবনবাহিনী গৃহবিবাদে হীনবল উত্তরভারত সমাচ্ছন্ন করিয়া লক্ষ্মণ সেনের তোরণদ্বারে সমাগত প্রায়, তখন নূতন ভাবের ভাবুক বাঙ্গালী কবি গাহিতেছেন "দেহি পদপল্লব মুদারম্"। কিন্তু যুদ্ধাবসানে সোমরস পান করিতে করিতে ঋষির সেই বিজয়-গান "আমাকে শতপুত্র দাও, যাহাতে সহস্র "দস্যু" নিধন করিতে পারিব, প্রচুর ভূমি দাও যাহার শস্যে গৃহ পূর্ণ করিব, আর নৃপতি লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বাঙ্গালী-কবির গানে কত প্রভেদ! নাড়ী টিপিলেই হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতের বল বুঝা যায়। একটী হৃদয় একবিংশতিহস্ত দীর্ঘদেহের তেজঃসাধক আধেয়, অন্যটি যে দেহের আধেয় তাহার পরিমাণ সার্দ্ধত্রিহস্ত মাত্র। একটী অমর প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের নিকট বিশাল ও উন্মুক্ত হৃদয়ের তেজঃব্যঞ্জক আবেদন, অন্যটী অভিমানিনী নায়িকার উদ্দেশে আত্মহারা প্রেমিক নায়কের করুণ হৃদয়োচ্ছ্বাস। তথাপি ঐ করুণভাবও নিরর্থক হয় নাই।

আর্য্যগণ ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ-সংরক্ষণার্থ কর্ম্মবিভাগের প্রবর্ত্তন করেন; কিন্তু কালে তাহা জাতিবিভাগে পরিণত হওয়ায় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে ভাষা ও ভাবের পার্থক্য এত অধিক হইল যে, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের ধর্ম্ম সুশিক্ষিত ব্যক্তি

ব্যতীত অন্যের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল এবং সাধারণের ভাষা "প্রাকৃত" নামে অভিহিত হইল। তখন দেশজয়ের উল্লাস ছিল না; অনার্য্যের আক্রমণ-ভয় ছিল না; প্রকৃতি মুক্তহস্তে আর্য্যসন্তানকে তাঁহার রত্নরাজী বিতরণ করিতেন। সমাজ অবসর পাইয়া চিন্তায় মনোনিয়োগ করিল, কিন্তু জনসাধারণ শিক্ষিত-শ্রেণীর ঐ চিন্তা-প্রসূত ফললাভে বঞ্চিত রহিল। ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্তি থাকিতেও তাহারা সুযোগ পায় নাই। শিক্ষার অভাবে তাহাদের ধর্ম্মভাব শিথিল হইল। বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই অভাব পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা "প্রাকৃত'-ভাষায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কতক অনুশাসনাবলী শিখাইয়াছিলেন, ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সকল মানবের সম অধিকার দিয়াছিলেন, এবং "জীবে দয়া" এই উপাদানটীকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বৌদ্ধাদি ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পথানুসরণ করিলেন। তাঁহারাও সাধারণকে সহজ ভাষায় ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, সকল জাতিকে ধর্ম্মশিক্ষায় সমান অধিকার দিলেন, উপনিষদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে তাঁহাদের নিজের মত রক্তমাংসের শরীরে গঠন করিয়া তাঁহাদের পোষাক পরাইয়া, তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া মানবভাবে অনুপ্রাণত করিয়া দাঁড় করাইলেন এবং ধর্ম্মপিপাসু, মৃতকল্প সমাজে যেন নবজীবন সঞ্চার করিলেন। বঙ্গভাষার শৈশব অবস্থায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বাঙ্গালী কবিগণের এই নবজীবনের আধআধ কথাগুলি তজ্জন্য এত সরলতাপূর্ণ, এত সুমিষ্ট, এত সজীব যে, এখন পর্য্যন্ত মানবহৃদয়ে তাহাদের প্রভাব অটুট রহিয়াছে। মানুষ ও ধর্ম্ম উভয়ের এরূপ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব; এবং উভয়ের সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে উভয়ের উৎকর্ষ। ধর্ম্মের সহিত মানবভাবের মিলনের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত আছে বলিয়া আমাদের এত আশা যে কালে বঙ্গসাহিত্যসৌধ্য ঃ স্থপতির অপূর্ব্বসৃষ্টি "তাজমহলের" ন্যায় জগতের বিস্ময়ের ও আদরের বস্তু হইবে।

মানব-সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই বিপ্লবের সূচনা হয় এবং ঐ বিপ্লব নিবারণ করিয়া ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত ভগবানকে যুগে যুগে লোকসমাজে আবির্ভূত হইতে হয়। শিক্ষিত-সম্প্রদায় অশিক্ষিত জন-সাধারণের অনাদর করিয়াছেন, তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, উভয়ের ভাব ও ভাষার, আচার ও ব্যবহারে, মর্য্যাদা ও অধিকারে পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক রহিত প্রায় হইয়াছিল। এই সময়ে ভগবান্ ধর্ম্মে মানবভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া, আশু বিপ্লবের সম্ভাবনা অপসারিত করিয়া সমাজ-সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম আসিয়া সমাজের অনাদৃত নিম্নস্তরে গোপকুলে লালিত হইয়া, গোপ-বালকবৃন্দের সহিত তাহাদের স্বভাবসুলভ ক্রীড়ায় এবং মানবভাবের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ রাধাকৃষ্ণলীলায় দেখাইলেন— ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মন্দির এখন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নিজস্ব নহে; এখন তাহাতে

জনসাধারণের সমান অধিকার—ধর্ম্ম এখন প্রতিভার বিশদ স্ফটিক নহে, এখন তাহা মানবভাবের বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত। বাঙ্গালী কবি সেই রঙ্গে ছবি আঁকিয়াছেন।

তখন "সংস্কৃত" সাধারণের ভাষা ছিল না। পালি, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি "প্রাকৃত" ভাষা "সংস্কৃত" ভাষার স্থান অধিকার করিতেছিল। কিন্তু মরণোন্মুখী রাজহংসীর "গীতগোবিন্দম্" কাব্য-সরোবরে এক অপূর্ব্ব ভাবের ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে সমসাময়িক, উভয়ে সেই নূতন ভাবের ভাবকু। চণ্ডীদাস শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন, দারিদ্র্যের অঙ্কে লালিত; বিদ্যাপতি সম্ভ্রান্ত বিদ্বদ্‌বংশসম্ভূত, সংস্কৃতজ্ঞ, মিথিলাধিপতির সভাসদ্। কিন্তু এ সকল পার্থক্য প্রবল ভাবের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষা এখনকার অপেক্ষা বিশুদ্ধ, বিদেশীয় ভাষার সংস্পর্শ নাই, সংস্পর্শের সম্ভাবনাও থাকে নাই। আবার উভয়ের ভাষা সজীব, সরল এবং প্রাঞ্জল; কৃত্রিমতার, আড়ম্বরের লেশ নাই; ভাষার দিকে কবির যেন লক্ষ্য নাই। বনের পাখীর মত কবি আপনমনে নিঃসঙ্কোচে গাহিয়াছেন। লোকসমাজে যশোলাভের ঈপ্সা নাই, লোকনিন্দার ভয় নাই। কবি ও শ্রোতা একই ভাবে অনুপ্রাণিত। কবিকে পাইয়া সমাজের যেন কথা ফুটিল; সমাজ যেন অনেকদিনের চাপিয়া রাখা কথা ব্যক্ত করিল। পাশে যে এত বড় একটা রাষ্ট্রবিপ্লব হইল, সমাজের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাবে বিভোর বিপুল সমাজের কাছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁহাদের কাব্যে যে ভাবের রঙ্গে ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহাদের লোকান্তরের অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালার পরমতীর্থ নবদ্বীপে সেই ভাবের পূর্ণ-অবতার মানবদেহ পরিগ্রহণ করেন। চৈতন্য নূতন বাঙ্গালার মধ্যমণি; ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা, সাহিত্য চৈতন্যের প্রভায় আলোকিত, তাঁহার প্রেমরাগে রঞ্জিত। অনেক দেশ বিপ্লবের সময় নর-শোণিতে কলঙ্কিত এবং উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজের গঠন এরূপ সুন্দর, সমাজের প্রকৃতি এত উদার যে, অনেকবার ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়াছে, কিন্তু কখনও নর-শোণিতে বসুধা কলঙ্কিতা হয় নাই। রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের অনুগামী বিপদসমূহ অন্য দেশের তুলনায় এখানে অতি অকিঞ্চিৎকর। একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, অন্যদেশের যে অবস্থাকে ধর্ম্মবিপ্লব বলা যায়, এখানে ধর্ম্মবিপ্লব না বলিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণ বলিলে কথাটা অনেক পরিমাণে অবস্থার প্রকৃত পরিচায়ক হইতে পারে। ধর্ম্মের অর্থও ভিন্ন বোধ হয়। দুই চারিটী বিষয়ে মত বা বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্ম এক, আর সারাজীবনের আচার, ব্যবহার, অভ্যাস, নীতি, শিক্ষা, আহার, বিহার, সংযম, চিন্তা, ভাব, কাব্য লইয়া ধর্ম্ম ভিন্ন সামগ্রী। শেষোক্ত ধর্ম্মকে একটী সজীব দেহ বলিলে চলে। জীবদেহের যেরূপ ব্যধি আছে, এই ধর্ম্মেরও সেরূপ ব্যাধি আছে। জীবদেহ যেরূপ স্বভাবপ্রণোদিত হইয়া আপনার ব্যাধির মূলীভূত কীটাণু প্রভৃতি নষ্ট করে, আমাদের ধর্ম্মও সেরূপ স্বভাব-প্রণোদিত

হইয়া তাহার ব্যধির মূল নষ্ট করে। কিন্তু জীবদেহের সহিত বিরাট ধর্ম্মদেহের প্রভেদ এই যে, জীবদেহ মর, আমাদের ধর্ম্মদেহ অবিনশ্বর, সনাতন; জীবদেহকে সময়ে সময়ে বাহিরের সাহায্য লইতে হয়, আমাদের ধর্ম্মদেহ আপনা-আপনি সমস্ত রোগের নির্ণয় করিয়া বিনাশসাধন করে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ ইচ্ছামত এক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের আদি আমরা জানি না, আমরা কখনও সভা করিয়া আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হই নাই। আমরা অন্য ধর্ম্মে যাইতে পারি না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী আমাদের ধর্ম্মে আসিতে পারে না। সেজন্য বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, জৈন ইত্যাদি মতসমূহ আমাদের কাছে পৃথক ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ওগুলি কেবল বিরাট ধর্ম্মদেহের এক এক সময়ের রোগ অপনয়নের চেষ্টা মাত্র। আবার, ঔষধ যেমন রোগীর দেহের সহিত একীভূত হইয়া সমস্ত দেহের উপর কার্য্যকর হয়, ঔষধের নিজের পৃথক সত্তা থাকেনা; কিন্তু পৃথক স্থানে সংরক্ষিত হইলে অল্পকালমধ্যে বিকৃত হইয়া যায়; সেরূপ চৈতন্য বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম্মমত সকল যে সকল পরিমাণে সনাতন ধর্ম্মদেহের সহিত মিশিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়াছে, তাহাকে সজীব ও সতেজ রাখিয়া সমাজ-সংরক্ষণ করিয়াছে, সে পরিমাণে তাহাদের প্রভাব লুপ্ত হয় নাই; কিন্ত যে পরিমাণে তাহারা মূলদেহের সহিত বিছিন্ন থাকিয়া পৃথক অস্তিত্ব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা কালক্রমে বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সেজন্য বৌদ্ধ, বৈষ্ণব বলিয়া পৃথক্ কোন ধর্ম্ম ভারতে স্থায়ী হইতে পারে নাই।

চৈতন্য জাতি-নির্ব্বিশেষে মানুষকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সকলকে ভক্তি ও প্রেমপথ দিয়া ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। চৈতন্যের সমুজ্জ্বল প্রতিভা, অসাধারণ-আত্মত্যাগ এবং অপরিসীম ভগবদ্ভক্তি থাকায় তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলি। বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাবের আবেগে অনেকেরই কবিত্বশক্তি উন্মেষিত হইয়াছিল। তাঁহারা মানবপ্রেমের মহাচিত্রে ভগবদ্‌প্রেম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সরল অকৃত্রিম ভাষা, উন্মুক্ত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ ভাব, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দাবলীর সহিত সাধারণ চলিত কথার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, শব্দে চিত্রাঙ্কণের প্রয়াস এবং সুমিষ্ট পদবিন্যাস, বঙ্গ-সাহিত্যের শৈশব অবস্থায় জনসাধারণের প্রীতি ও আগ্রহ-ভাজন হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুপরিচিত হইয়াছিল। গানের আকারে রচিত কবিতা সকলে কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার আবৃত্তি করিত। এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে নিত্য কত "বৈষ্ণব" সন্তান পদাবলী গান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। মুদ্রাযন্ত্র ও বিজ্ঞাপনের অভাব শিশু বঙ্গ-সাহিত্যের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। সাহিত্য তখন ব্যবসায়ের সামগ্রী ছিল না। সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ তখন কুবের-পূজক ছিলেন না। লোকশিক্ষা

সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব-কবিগণ সাহিত্যের সে উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্য গান, যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-পদাবলী এবং চরিতাবলী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ। চৈতন্যভক্তগণই কেমন করিয়া জীবন-চরিত লিখিতে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা প্রথম দেখান। ইতিহাস ও সাহিত্য হিসাবে চরিতাবলী অতি মূল্যবান। বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গের গীতি-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। তাহাদের কবিত্ব অতুলনীয়। প্রেমের এরূপ সুন্দর ও নিখুত বিশ্লেষণ আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। কবি যেন আদর্শ প্রেমিক ও প্রেমিকার পাশে বসিয়া প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি আঁকিয়াছেন, কবি আপনার কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য সত্যের অপলাপ করেন নাই; যেমন দেখিয়াছেন সেরূপ চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। সেই কারণে চিরকালের জন্য ছবিগুলি যেন প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছে। কবির এই প্রেমচিত্রে মনের এবং দেহের গতি দেখিতে পাইতেছি, কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছি; সারাজগতের সাহিত্য এই প্রেমের চিত্রাঙ্কনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। তাহা হইলে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিগণের উৎকর্ষ কোথায়? আমার মনে হয়, বৈষ্ণব-কবিগণ তাঁহাদের চিত্রে মানবভাবের যেরূপ পূর্ণবিকাশ দেখাইয়াছেন, এরূপ জগতের সাহিত্যে বিরল। অন্য সাহিত্য মানুষ, তাহার পোষাক, তাহার আচার, তাহার ব্যবহার, সমাজে তাহার স্থান, তাহার পদ, তাহার মর্য্যাদা, তাহার প্রাসাদ, তাহার আত্মীয় স্বজন, তাহার কুটুম্ব, তাহার রাজা, তাহার প্রজা ইত্যাদিকে ছাড়িয়া চিত্র আঁকে নাই; কিন্তু যে সাহিত্যের কথা বলিতেছি, তাহা কেবল মানুষটিকে আঁকিয়াছে। মানুষটিও গোটা নহে; মানুষটি যখন মনুষ্যভাবের সর্ব্বোচ্চভাব, প্রেমের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় বহুশতাব্দীর বিরহের পর উপনীত হইয়াছিল, তখনকার সেই অবস্থাটি আঁকিয়াছে। এখানে সুরম্য অট্টালিকা নাই, এখানে সমাজ নাই;—কেবল আছে প্রেমিক ও প্রেমিকা, আর আছে অন্ধকারময় মৃতকল্প সমাজে সেই প্রেমের আলোকরশ্মি দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কবি।

মুরলী শিক্ষা

শ্রী ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

বৈষ্ণব-কবির অপূর্ব্ব অমৃতময় কাব্যে "মুরলী-শিক্ষা" নামে একটী ক্ষুদ্র অধ্যায় আছে। ইহা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পদ্মমধুবৎ মিষ্ট, পারিজাততুল্য সুগন্ধী। ইহার বাহ্যরূপ যেমন সুন্দর, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বও তেমনি চিত্তগ্রাহী। আমরা প্রথমেই ইহার আখ্যানভাগ বর্ণনা করিয়া পরে, ইহার মর্ম্ম-গ্রহণে সচেষ্ট হইব।

একদা গৌরাঙ্গদেব নিঝুম মধ্যাহ্নে গঙ্গাতীরে আপনার মনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমে ভরপূর, দৃষ্টি কৃষ্ণচন্দ্রের মানসী-মূর্ত্তি দর্শনে বিহ্বল, পদবিক্ষেপ ভাবাতিশয্যে বিলম্বিত ও অসতর্ক। সহসা চিত্ত-সিন্ধু কি এক অপূর্ব্ব অভিনব ভাব-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; প্রকৃতির স্থূলকায় দেখিতে দেখিতে বিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে বৃন্দাবন-পাদবাহিনী যমুনা কুলু কুলুনাদে বহিয়া যাইতেছে, এবং তিনিও তাহার তীরে প্রেমময়ী কোন্ গোপবধূর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

"সোঙারি পূরব-লীলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
মুরলী শব্দ করি বদন বাজায়।।"

সেই প্রেম-পাগলের অদ্ভুত বদন-বাদ্য শ্রবণ করিয়া, আর এক পাগল—যিনি এই নবদ্বীপ-চন্দ্রের কৃষ্ণাবেশ হইলে আপানাকে শ্রীমতীর প্রতিচ্ছায়া-রূপে রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-স্মৃতি সর্ব্বদা সজীবিত করিয়া রাখিতেন,—সহসা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"শুনিয়া মুরলী-রব গদাধর আইল।
"মুরলী শিখিব" বলি বামে দাঁড়াইল।"

তখন গদাধরের—

"এ বোল শুনিয়া, প্রভু কহে হাসি হাসি।
"আগে শিখ নাগরালী, তবে শিখ বাঁশী"।।
গদাধর বলে—"সেই কেমন প্রকার"।
বংশী কহে—"নয়ন-বাঁকা ত্রিভঙ্গ আকার"।

কবি বংশী কহিতেছেন—"যে কেহ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শিখিতে চায়, যে কৃষ্ণের মতন বাঁশী বাজাইয়া জগজ্জনের প্রাণ-মন হরণ করিতে বাসনা করেন, তাহার শিখা চাই—নাগরালী; তাহার থাকা চাই—"বাঁকা নয়ন, ত্রিভঙ্গ-গঠন"। এই অপূর্ব্ব কথার ভঙ্গীতে, এই বিচিত্র ইঙ্গিতে, কবি বুঝাইতে চাহেন—"যিনি এ সংসারে 'চতুর', যিনি

এই সংসারের বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ-ভাব বুঝিয়া, তাহার সহিত চাতুরালী করিতে পারেন; যিনি সংসারে সৌন্দর্য্যকে অনিত্য জানিয়া, সংসারের সুখকে মোহ-পাশ জানিয়া, পঙ্কমধ্যে মৎস্যবৎ নির্লিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করেন; আবার যিনি এই বিশ্বের সর্ব্ববিধ বিচিত্রতা ও অনিত্যতার মধ্যে এক নিত্য-প্রবহমান আনন্দ-রস পান করিয়া রসিক-শেখররূপে বিরাজ করেন; সানুরাগা নারীর স্পর্শ, কিংবা মৃত্যুর হিম-আলিঙ্গন, যাঁহার স্বস্থ হৃদয়কে বিহ্বল করে না; যাঁহার বিষয়ে বিদ্বেষ বা লোভ নাই, লাভে বা অলাভে ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই, ভাবে বা অভাবে হর্ষামর্ষ নাই; যিনি বালকবৎ সর্পরজ্জুরূপী শুভ এবং অশুভ উভয় লইয়া সমভাবে ক্রীড়ারত রহেন; যিনি চিন্তার মাঝে নিশ্চিন্ত, ইন্দ্রিয়গণ সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়তা-বিবর্জ্জিত; যিনি এই জগৎকে ইন্দ্রজাল ভাবিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় শুদ্ধা-মায়ার ভুবনবাসীকে মুগ্ধ করেন, অথচ নিজে মুগ্ধ হন না; যিনি সংসার-মরুভূমে থাকিয়া, বিষয়রূপ মরীচিকার অসত্যতা উপলব্ধি করিয়া বারংবার তাহা নেত্র পথে সমুদিত হইতে দেখিয়াও আর তাঁহার মোহে ভ্রান্ত হন না—তিনিই যথার্থ "নাগরালী" শিখিয়াছেন।" পুনঃ "নয়ন বাঁকা" বলিতে কবি বলিতে চাহেন—"যে নয়ন জগতের বাহ্যরূপে নিপতিত থাকিয়াও অভ্যন্তরে নিবদ্ধ; যে নেত্রে বাহ্যদৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট; যে চক্ষু বাহ্যভাবে বিষয়সুখের ক্ষণিকতা দেখিয়া. এবং অন্তর্গূঢ় চিদ্‌ঘন মূর্ত্তির রূপাতীত অবিনাশিতা বুঝিয়া মৃদুহাস্যে সমুদ্বেল হইয়া উঠে; যে নয়ন সর্ব্ববস্তুতে মর্ম্মমধ্যস্থ ধ্যেয় বস্তুর অনিন্দ্য-সুন্দর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করে. এ কি সেই নয়ন?" পায়ের উপর পা রাখিয়া, ক্ষীণ কটি ঈষৎ হেলাইয়া, মস্তকের শিখি-পুচ্ছ বাঁকাইয়া, বৃন্দাবন বিলাসীর যে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি কবির চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল,—যে ভঙ্গিমায় সচ্চিদানন্দরূপীর ধ্যানগম্য ভাবত্রয়ের বাহ্য-বিকাশ লীলায়িত, এই "ত্রিভঙ্গ আকার" বর্ণনায় কবি কি তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন! আবার এই একটী মাত্র পদে কবি কি বলিতেছেন—"যে বাঁশী শ্যামের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া ধরণীকে উন্মাদিনী করিয়াছিল, সে বাঁশী বাজাইতে হইলে বাদকরূপী সাধককে শ্যামরূপ ধারণ করিতে হইবে; ধ্যেয়, ধ্যায়ী ও ধ্যান, এই ত্রিভাবের একত্র সমাবেশ করিতে হইবে,—যে বাঁশী থাকিয়া থাকিয়া জগতের জীবকে মধুরস্বরে পাগল করিতেছে, যে বাঁশীর স্বরে এই বিশ্ব-হৃদয়-বিহারিণী ভক্তি-যমুনা উজান বহিতেছে, সেই বাঁশীটি বাজাইবার যদি কাহারও সাধ হইয়া থাকে, তবে সে গদাধরের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের রাতুল-চরণে শরণ লউক, একান্তমনে ভক্তি-পূরিত হৃদয়ে তাঁহার সমীপে "মুরলী-শিক্ষার" জন্য ব্যাকুল-ভাবে নিবেদন করুক, তবেই তাহার "মুরলী-শিক্ষার' সূত্রপাত হইবার সম্ভাবনা হইবে।"

গৌর চন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গ-গদাধর বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবনা লিপিবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণব কবি রাধা-কৃষ্ণের "মুরলী-শিক্ষা" বিষয়িণী অপূর্ব্ব ঘটনার গান গাহিতেছেন।

একদিন শ্রীমতী অন্তঃপুরে নিরালা বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—"যে বাঁশীর স্বর একদিন কাণের ভিতর দিয়া আমার মরমে পশিয়া, সহসোত্থিত পবন-সঞ্চালনে শুষ্কপত্রবৎ আমাকে কোন্ শূন্যে উড়াইয়া লইল; সে বাঁশীর উন্মাদক-সঙ্গীতে ব্রজের প্রতিনারী বাউরা হইয়া নাথের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন; যে বাঁশীর মধুর গানে ব্রজবালাগণ আত্মহারা হইয়া শ্যামচাঁদের পশ্চাতে ছায়াবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সে বাঁশীটি কি আর কেহ বাজাইতে পারে না?"

" ঘর হইতে শুনিয়াছি মুরলীর গান।
আহীর-রমণী, কুলে দিল সমাধান।।
মোহিত সবার মন মুরলীর তানে।
সতী কুলবতী হেন বধিল পরাণে।।
বঁধুর মুরলী-রব শুনিয়া শ্রবণে।
যুবতী ত্যজিয়া পতি প্রবেশে কাননে।
অপরূপ-শুনিয়াছি মুরলীর নাদ।
শিখিব বিনোদ বাঁশী করিয়াছি সাধ।।"

হৃদয়ে এইরূপ ভাব ধারণ করিয়া, শ্রীমতী উন্মনা হইয়া শ্যাম-সমীপে উপনীত হইলেন, এবং আগ্রহ সহকারে কৃষ্ণচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—

" ঘর হৈতে এলাম্ বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী রাধা বলি, শিখাও আমারে।।
মুরলী শিখিব বঁধু! মুরলী শিখাও।
যেমন করিয়া তুমি আপনি বাজাও।।"

"আমি ত জানি না—কেমন করিয়া বাঁশী বাজাইতে হয়, কেমন করিয়া বাঁশী ধরিতে হয়; কেমন করিয়া ঐ বাঁশের বাঁশীর ভিতর দিয়া তোমার মতন একমন প্রাণ-পাগল করা 'জাতি'-কুল-নাশা ধ্বনি তুলিতে হয়। একবার আমাকে তাহা শিখাইয়া দাও; আমি একবার প্রাণের সাধে বাজাইয়া তোমারি বাঁশীর স্বরে তোমাকে আমারি মত পাগল করি।"

"শিখাও পরাণ বঁধু! যতনে শিখিব।
জানাইয়া দেহ, ফুক্ মুরলীতে দিব।।"

কিন্তু মুখে বলিলে ত হবে না, হাতে হাতে শিখাইতে হইবে;—

"অঙ্গুলি নোঙায়ে বঁধু! দেহ হাতে হাত।
বাজাইতে শিখাইয়া দেহ, প্রাণনাথ।"

বঁধু হে! আমাকে শিখাইয়া দাও—

"যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
(জ্ঞানদাস কহে) বাঁশী দেহ শিখাইয়া;—"

"তোমার মুরলীর মধ্যে এতগুলি রন্ধ্র কেন? আবার এক একটি রন্ধ্রে, এক এক রকমের সুর ফুটে কেন? বাঁশী কেন এমন করিয়া গড়িলে? তাহা যদি শুনাইতে না চাও, তবে তাহা শুনাইয়া কাজ নাই! কেবল আমাকে শিখাইয়া দাও ঃ—

" কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম।
কোন্ রন্ধ্রে "রাঁধা" বলি ডাকে আমার নাম।।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে 'কেকা' শব্দে নাচে ময়ূরিণী।।
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটায়ে, পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটায়ে, প্রাণনাথ।।
কোন্ রন্ধ্রে, ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে, নিধুবন হয় ফুল ফলে।।
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম-স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।।
কোন্ রন্ধ্রের গানে নদী বহয়ে উজান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে গোপীর হরল জ্ঞেয়ান।।
কোন্ গানে গাভী বৎস তৃণ-মুখে ধায়।
কোন্ রন্ধ্রের গানে শ্যাম! পাষাণ-মিলায়।।"

প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকার এই অপরূপ সাধের কথা শুনিয়া রসিক-শেখর শ্যামসুন্দর বালতেছেন—-

"মুরলী শিখিবে রাধে! শিখাব মনের সাধে,
যে বোল বলিয়ে, শুন ধনি!
ছাড়হ নারীর বেশ, উচ্চ করি বান্ধ কেশ,
বামে চূড়া করহ টালনী।
ঘুচাহ সিন্দুরের ঘটা, পরহ বিনোদ ফোঁটা,
দূরে রাখ নাসার বেশ্লরে।
কাঁচলি ঘুচায়্যা ফেল, মৃগ-মদে হও কালো,
তবে বাঁশী বাজাবে অধরে।।
লেহ মোর পীতধড়া, পর আঁটি কটিবেড়া,
অঙ্গুলি নোঙাও, শিখাইব।
তুয়া নাম-গুণ, রাই! যে রন্ধ্রে সদাই গাই,
একে একে জানাইয়া দিব।।

সৌর অঙ্গুলি তোর, সোণা-বাঁধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা, পাঁচনিতে দেও ঠেকা,
তবে সে বিনোদ-বাঁশী বাজে।।"

এ সংসারে প্রকৃতি-প্রসূত জীবমাত্রেই নারী; আর এ জগতে একমাত্র পুরুষ আছেন। তিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, সকলের হৃদয়ের রাজা; যাঁহার মধুর আহ্বান প্রেমরূপী মুরলীর রন্ধ্রে ধ্বনিত হইয়া জীবের মর্ম্ম-কন্দরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এবং তাহাকে শুভমুহূর্ত্তে প্রেমময় ভগবানের আসঙ্গলিপ্সায় আকুল করিয়া তোলে। যে গান শুনিয়া ভক্ত মাঝে মাঝে মায়ার গণ্ডি ছাড়াইয়া, বিষয়ের পাশ ছিন্ন করিয়া, ভগবানের প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হয়,—যে তান সর্ব্বদা জীবকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে এবং ধীরে ধীরে সেই পরম-পুরুষের চরণসরোজে ভৃঙ্গবৎ আনন্দ-মধু-পানের জন্য পিপাসিত করিতেছে, সে গান—তান কি আর কাহারও কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে পারে? কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে তাঁহার বাঁশী শিখাইবার জন্য সর্ব্বদা আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন; এবং আমরা যখন সরলান্তঃকরণে সত্যই তাহা শিখিতে চাই, তখন তিনি আমাদিগকে উপযুক্ত দেখিলে, স্বয়ং হাত ধরিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্যামসুন্দরের উক্তি শুনিয়া শ্রীমতী তাঁহাকে সেই-ভাবে সাজাইয়া দিতে বলিতেছেন। তখন ঃ

"এলায়্যা কবরী-ছান্দ চূড়া-বান্ধে শ্যামচান্দ,
রাই-অঙ্গ করে ঝলমলে।
কহিছে জ্ঞেয়ান দাসে বাঁশী শিখিবে বঁধু পাশে,
মুরলী ধরিয়ে করতলে।।"

তখন শ্রীরাধার কুঞ্জে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িল। তখন ঃ

"নিকুঞ্জ-মন্দিরে দেখ অদভুত রঙ্গ!
দুঁহু শিরে শোভে চূড়া, দুঁহেই ত্রিভঙ্গ।।
রাই শিখয়ে বাঁশী, নাগর শিখায়।
একে বাঁশী আধ-আধ, ধরিল দোঁহায়।।
রাই ভেল বিনোদ মুরলী শ্রুতি-ধর।
অঙ্গুলি লোলায়ে ভেদ জানাইছে নাগর।।
শ্যাম কহে—"একবার বাজাও দেখি রাই।
যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই।।"

নিজ নামে রাই বাঁশী পূরিল অধরে;
"শ্যাম নাম" ডাকিছে আপন বামা-স্বরে!
রাই কহে—"নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম!
তোমার মুখে তোমার বাঁশী কেমন অনুপাম।।"

কিন্তু এ কি! যে বাঁশীতে কৃষ্ণচন্দ্র যখনি ইচ্ছা "রাধা" নাম ফুটাইয়াছেন, যে বাঁশীটি তাঁহার অধরস্পর্শে বিশ্ব-বিমোহিনী মাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে, আজ সেই বাঁশীতে কিছুতেই ত তাঁহার নিজ নাম ফুটিল না!

"নিজ নামে শ্যাম তখন বাঁশী পূরে আধা।
নাহি বাজে "শ্যাম" নাম, বাজে "রাধা রাধা"।।
ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী, রাধা-গুণ গায়।।"

কেন এমনটী হইল? যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য জীবের চিত্ত জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রধাবিত, সেই রস-স্বরূপ শ্রী ভগবানও ত জীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য যুগে যুগে অপেক্ষা করিতেছেন। এক হইতে যেমন দুই-এর উৎপত্তি, একের মধ্যেই তেমনি দুই-এর মহা মিলন? তাই বুঝি কবি বলিতেছেন ঃ

"রাই কহে—"এক রন্ধ্রে দুঁহে দিব ফুক
না জনি কেমন বাজে, দেখিব কৌতুক"।।
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেই রাধা-কানু।
"রাধা-শ্যাম" দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু।।
রসের হিল্লোল উঠে দোঁহাকার গানে।
মোহিল সবার মন মুরলীর তানে।।
গান শুনি সারী-শুক কোকিল আনন্দ।
তরুলতা কুসুমে বারয়ে মকরন্দ।।
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি অগোচরী,—
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোর কিশোরী,—

সত্যই এই মর-জগতে যখন জীব 'আমি' ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া মরম-সুন্দরের সঙ্গে অন্তর্মিলনে মিলিত হয়, যখন জীবের সুর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী শ্রীভগবানের বিশ্ব-বিমোহন সুরের সহিত এক হইয়া যায়, তখনি এই সচল পরিণামী জগৎ মুহূর্ত্তের জন্য অচল হইয়া যায়, এবং সেই অনন্ত ভক্ত ভগবানের অপূর্ব্ব মিলনের আনন্দের ধারায় বিশ্ব ভাসিয়া যায়।

কবি চণ্ডীদাস চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, তাঁহার অমর তুলিকায় সেই ভাবী মিলনের বিচিত্র কাহিনী ধ্যান-সহায়ে বহুদিন পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অদূর ভবিষ্যের সেই অলৌকিক সঙ্গীত, প্রবন্ধ-শেষে পাঠকের প্রীত্যর্থে সংযোজিত করিলাম।

"আজু কে গো মুরলী বাজায়। এ ত কভু নহে শ্যাম-রায়।।
ইহার গৌর বরণে করে আলো। চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল।।
তাহার ইন্দ্র নীলকান্ত তনু। এ ত নহে নন্দ-সুত কানু।।
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল কতি।।
বনমালা গলে দোলে ভাল। এ না বেশ কোন্ দেশে ছিল।।
কে বনাইলে হেন রূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকন বরণী।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণে করে ঠারা-ঠারি।।
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি।।
আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোঁহার চরিত।।
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে।।"

আবার কবে এই অপূর্ব্ব-মিলনে ভারত-ভূমি গোলক হইতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে?

নব-নাগরিক সাহিত্য

শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের অধিকার

সাহিত্যক্ষেত্রে এখন একটা মত বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে সাহিত্যে সকলের অধিকার নাই। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না, আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সহিত আমাদের লোক-সাধারণে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ বরং অপরিচয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নূতন মত অনুসারে দোষটা হইতেছে, অশিক্ষিত লোকসাধারণের; শিক্ষিত লোকের সাহিত্যের নহে। লোকসাধারণের স্বল্পবুদ্ধি ও অল্প জ্ঞানের যোগাযোগে যে আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই, ইহা এই নূতন মতাবলম্বীদিগের নিকট বরং গৌরবের বিষয়। লোকসাধারণের সহিত যোগাযোগে এ সাহিত্য গড়িয়া উঠিলে তাহা কখনও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হইত না এবং বিশ্বমানবের নিকট তাহা মর্য্যাদা লাভও করিত না।

ইঁহারা লোকসাধারণকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছেন, তোমাদের স্পর্দ্ধা ত কম নহে; তোমরা আমাদের সাহিত্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে জ্ঞান। তোমাদের জন্য রূপকথা, উপকথা, যাত্রা, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস রহিয়াছে। কাব্য-সাহিত্যে তোমাদের অনধিকার। কাব্য-সাহিত্য ত কল্পনা জল্পনা নহে, যে তোমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। সাহিত্য আরও উচ্চ অঙ্গের, সাহিত্যকে বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের অনেক শিক্ষা ও সাধনা চাই।

ব্রাহ্ম ও শূদ্র সাহিত্য

আমারা কৃতবিদ্য, তোমরা মূর্খ। আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, তোমরা শূদ্র। শাস্ত্রের মত সাহিত্যে আমাদেরই কেবল অধিকার, তোমাদের অধিকার নাই।

আমরা অধিকার-ভেদ মানি। আমরা ইহাও মানি, সাধনার দ্বারা সকলেই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারে। হিন্দু-সমাজ যখন সজীব ছিল, তখন শূদ্রও সাধনার বলে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিতে পারিত। বর্ত্তমান আলোচনায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে অধিকার-ভেদের কথা উঠিয়াছে, তাহা অন্য রকমের।

লোকসাধারণ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই যে নব্য কাব্য-সাহিত্য আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহা নহে। শিক্ষা ও সাধনার বৈষম্যের উপর সাহিত্য-চর্চ্চার বর্ত্তমান অধিকার ভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

অধিকারভেদের কারণ

বাংলা সহিত্যে অধিকারভেদ কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে না। দেশের লোক বহুকাল হইতে এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান-সাহিত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের তৈয়ারী সাহিত্য। আমাদের সাহিত্যিকগণ,—ইংরাজি শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত. যাঁহাদিগকে আমরা সচরাচর কৃতবিদ্য বলিয়া থাকি। দেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের কৃতিবিদ্যগণ একদিকে যেমন ইংরাজি অথবা ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে সাহিত্যের রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, আর একদিকে লোকসাধারণের সহিত ভাববিনিময় ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে দেশীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা Ivanhoe পাঠ করিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে বসিলাম, Milton পড়িয়া মেঘনাদবধ লিখিলাম। Shakespeare ও Moliere পড়িয়া আমরা নাটক লিখিতে লাগিলাম, Shelley পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র কবিতায় গা ঢালিয়া দিলাম। ইউরোপীয়নবিশ লেখকদিগের হাতে পড়িয়া বাংলা-সাহিত্য স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর আদর্শ বাঙ্গালী লেখকদিগের রচিত সাহিত্যে বিদ্রূপের বিষয় হইল। সেই তখন হইতে ইংরাজির অনুবাদ যেমন সাহিত্যে সাধুভাষা বলিয়া গৃহীত হইল, সেরূপ ইংরাজি আদর্শের নকল সত্য বলিয়া সাহিত্যিক-সমাজ গণ্য করিতে লাগিল।

সমাজ-তত্ত্বে নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য

বাঙ্গালী জাতির প্রাণ আছে। তাই ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছে, একবারে জড় অচেতনের মত থাকে নাই। সাড়া পাওয়া গিয়াছে ঠিক, কিন্তু বাঙ্গালী-জাতির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সাড়া পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালীর দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম-তত্ত্বের ভিতর ইউরোপীয় ভাবসমূহ ও দেশের ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ ভাবসমূহের একটা সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইতেছে। আমাদের দার্শনিকগণ, আমাদের সমাজ তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতিকূল ভাবপ্রবাহের মধ্যে আমাদের জাতির জন্য একটা গন্তব্যপথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছেন। প্রতিকূল আদর্শের মধ্যে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের আদর্শ কিছু জানিতে পাইয়াছি।

সাহিত্যে ইউরোপীয় নবিশ

কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে আমরা এখনও যথোচিত সাড়া দিই নাই। নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য আমরা খণ্ড-কবিতায় কিছু করিয়াছি সত্য। কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে, নাটক নভেলে আমরা শুধু নূতন লইয়া খেলা করিতেছি মাত্র। আমরা এখনও ইউরোপীয়নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও অ্যানা ক্যারেনিনার (Anna Karenina-র) মোহে 'চোখের বালিতে' দেশের মনের সম্পূর্ণ

বিরোধী নায়ক-নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আঁকিতেছি. "স্ত্রীর পত্রে"ও "নারীর মূল্যে" ইবসেন (Ibsen) এর মত প্রচার করিতেছি, এবং রেসারেক্‌সন্‌কে (Resurrection) বাঙ্গালী সমাজে আনয়ন করিতেছি। আলফন্সো ডডে (Alphonso Daudet) ও গিডে মোঁপাসা (Guyde Maupassant) বর্ত্তমান নব্য-সাহিত্যিকদলের গুরু হইয়াছেন।

অবান্তর সাহিত্য

ইঁহারা ভাবিতেছেন, ইঁহারা যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন, তাহা আসল, সত্য ও সুন্দর, তাহাতে সমাজের মিথ্যা আচার-ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সমাজের কদর্য্য অনুশাসন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ করে না। সেখানকার জীবন, একেবারে স্বাধীন, বাধাবন্ধনহীন, নিত্য সরস, নবীন, সবুজ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহারা যাহা আঁকিতেছেন তাহা ছবি মাত্র, জীবন নহে। তাহা শুধু বন্ধন-বিহীনতা, তাহা একটা mere abstraction, অলীক কল্পনা,—সমগ্র জীবনের সাহিত তাহার যোগাযোগ নাই। একটা টবে-পোঁতা গাছের মত যাহা বিদেশী রসসিঞ্চনে সঞ্জীবিত, তাহা সরস, সবুজ, নয়নমুগ্ধকর হইতে পারে সত্য; কিন্তু দেশের মাটীর জীবন্ত গাছের মত দেশের সমগ্র জীবনের সহিত তাহার যোগযোগ না থাকাতে সে যেমন চিরজীবন বিফল থাকিয়া যায়, সেরূপ বর্ত্তমান নব্য-সাহিত্য আভিজাত্য-দোষ-দুষ্ট হইয়া জাতীয় জীবনের নিকট নিষ্ফল হইতেছে।

আসল কথা হইতেছে, কয়েকটা স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রতার অলীক কল্পনা (abstractions) লইয়া ছবি আঁকা যায়, কল্পনা জল্পনা করা যায়, কিন্তু তাহাদের লইয়া জীবন চলে না। জীবন মানেই যোগাযোগ। ফুল হঠাৎ আকাশে ফুটিয়া উঠে না; ফুলের সহিত গাছের পাতা, শাখা, প্রশাখা, মূল ও শিকড়ের সম্বন্ধ আছে। জীবনের সঙ্গে সেইরূপ সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের যোগাযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবন কখনই নির্লিপ্ত হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে না। জীবনের প্রকাশ যোগাযোগের ভিতর দিয়া। মনুষ্য জীবনে এই যোগযোগের অবলম্বন হইতেছে, জাতি বা সমাজ, ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ ও ক্রমবিকাশমান জাতি বা সমাজ।

বিদেশীয় সভ্যতার কয়েকটা abstraction মাত্র অবলম্বন করিয়া যেমন জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না, জীবনকে যেমন দেশেরই ইতিহাস ও দেশেরই সমাজকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিতে হয়, সেইরূপ সাহিত্যও দেশের জীবনের সহিত যোগাযোগ ত্যাগ করিয়া বিদেশী-জীবনকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আসল সাহিত্য জাগিয়া উঠে একটা সত্য, স্পষ্ট, concrete জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া। যেখানে শুধু কয়েকটা abstraction এর লীলাখেলা, একটা পূর্ণাবয়ব

সর্ব্বাঙ্গ-সমন্বিত জীবনের প্রকাশ নাই, সেখানে সাহিত্যও লীলাময়, সদা-চঞ্চল, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। সেখানে সাহিত্য আমোদ দেয়, আনন্দ দেয় না; চমক লাগায়, প্রকৃত সৌন্দের্য্যের সৃষ্টি করে না।

সাহিত্যে abstractions বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা লইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের "গোরা"। প্রত্যেক চরিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতার বিশ্লেষণের ধূমে মানুষগুলা ছায়ামায় হইয়া গিয়াছে। এই "গোরা"ই হইতেছে নব-নাগরিক-সাহিত্যের কল্পনার শ্রেষ্ট প্রকাশ।

আভিজাত্য-দোষ

বর্ত্তমান নব-নাগরিক সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ অনেকটা বলা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার কয়েকটা কল্পনা, সুতরাং তাহার পক্ষে অবাস্তবভাব লইয়া উহা বিকাশ লাভ করিতেছে। এতকাল আমরা শুনিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যে কতকগুলি বিদেশী ভাব আসিতেছে। বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে একপ্রকার ভাবের প্রতিপত্তি লাভ করা বিচিত্র নহে। এখন আমরা শুনিতেছি, আসলসত্য ভাব হইতেছে এইগুলাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্য-তত্ত্বও জাগিয়া উঠিতেছে, যে সাহিত্যে এই সকল ভাবের প্রকাশ তাহা লোকসাধারণ আয়ত্ত্ব করিতে পারিবে না। তাহাই উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, এবং তাহাতে লোকসাধারণের অধিকার নাই। লোকসাধারণ এই ভাব সমূহের সাধনা না করিলে এ সাহিত্য বুঝিবে না। তার আস্বাদ যাহারা জানে না, তাহাদের নিকট তার গুণগান করার মত taste create করিবার এই আয়োজন।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের বিরোধ

বর্ত্তমান নাগরিক-সাহিত্য দেশের concrete বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে নাই। বিদেশী সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া সে আপনার কল্পনার দ্বারা একটা অবাস্তব জীবন তৈয়ারী করিয়াছে। কল্পনার দ্বারা একটা খাপছাড়া অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন তৈয়ারী করিয়া সে তাহাকে চরম সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছে। আমাদের নাগরিক সাহিত্যে নাটক নভেলের কথাবার্ত্তা তাই ঠিক যেন Drawing room, parlour এর table talk,—বিলাতী ধরণের বাক্যালাপ, ঘটনাসমাবেশ বিলাতী ধরণের মত অপ্রত্যাশিত, full of surprises, চরিত্রগুলি একগুঁয়ে; স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, পরিবার বা সমাজ-ধর্ম্মকে আপনার স্বার্থের মূল্য দ্বারা একেবারে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের নাগরিক সাহিত্য নাগরিক জীবনের মত দেশের প্রকৃত ও সহজ জীবন হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া দেশের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। দেশের জীবনের সহিত সাহিত্যের এই বিয়োগ আমাদিগের নিকট আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে, কারণ আমরা এতকালের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের দ্বন্দ্বের পর

একটা সমন্বয়-সাধনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। নব-সাহিত্য এক্ষণে সে সমন্বয়-সাধনের পন্থা ত্যাগ করিয়া বরং পশ্চিমমুখে পথ অবলম্বন করিয়াছে।

ইহার ফল একদিক হইতে দেখিতে গেলে মন্দ নহে। আমরা বিলাতী ফরাসী জাপানী জীবনের আস্বাদ সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাইয়া আরও ব্যকুলভাবে জাতীয়-জীবনকে বরণ করিতে শিক্ষা করিতেছি। অপরাপর সভ্যতাকে ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে না অনুভব করিলে আমরা জাতীয় সভ্যতা ও সাধনার গৌরব বোধ হয় আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। সমাজ-সংস্কার নহে, ধর্ম্মের আন্দোলন নহে, নাগরিক-সাহিত্যের বিদেশীয়তাই গৌণভাবে আমাদের দেশীয়তার পুষ্টিবিধান করিয়াছে।

বাস্তবিক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নব-নাগরিক সাহিত্য যে ভাবসম্পদ লইয়া আপনাকে ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিতেছে, তাহার সহিত আমাদের মানসিক ও অধ্যাত্মজীবন কিছুতেই খাপ খায় না। তাহাদের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ অধ্যাত্মজীবনের বরং চরম বিরোধ রহিয়াছে। এই যে বিরোধ, ইহার কারণ কেবল শিক্ষার তারতম্য নহে, এই বিরোধের কারণ সভ্যতা ও সাধনার বিভিন্নতা। যে ভাব-সাধনা, যে অধ্যাত্ম শিক্ষা আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও সমাজের ভিতর দিয়া ইতিহাসে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, যাহা বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনায়ত্ত, লোকসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এখনও সজীব রহিয়াছে, তাহাই এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এক্ষণে নিজে পাশ্চাত্য-সভ্যতা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বর্ত্তমান জনসমাজকে আশ্রয় করিয়া, আপনার স্বতন্ত্র অপূর্ব্ব বিকাশের সুযোগ খুঁজিতেছে।

অশিক্ষিত জনসমাজ ও জাতীয় সভ্যতা

লোকসাধারণের, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের হৃদয়ে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাধনা আপনাদের গৌরব অটুট রাখিয়াছে। সহরের আফিস, আদালতে, ইস্কুল কলেজে সে অনাদৃত, উপেক্ষিত, অপমানিত; নাগরিক-জীবনের এক কোণে নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে থাকিবার স্থান সে পায় নাই; সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া সে পথে পথে ঘুরিয়া কত কাঁদিয়াছে, বৃথা আশাভরে আপন সন্তানের মুখোপরে চাহিয়া তীব্র উপহাসের মর্ম্মন্তুদ ব্যাথা পাইয়া ফিরিয়াছে; কিন্তু দেশের তথাকথিত অশিক্ষিত সমাজের বিরাট হৃদয়-সিংহাসনে তাহার স্থান ছিল। সেখানে কৃত্রিমতা নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা নাই, সেখানে আছে শুধু স্বাধীন-জীবনের সরলতা ও সৌন্দর্য্য; সেখানে বাক্চাতুরী নাই, কূটনীতি নাই; আছে শুধু সহজভাব, সরল প্রকাশ; সেখানে শুধু শুষ্ক-জ্ঞান নাই, জ্ঞানের সহিত হৃদয়ের যোগ আছে। সেখানে দয়া মায়া কোমলতা আছে, প্রেম ও ভাবুকতা আছে। জাতীয় সভ্যতা সেইখানে

আপনার স্থান পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেইখানে আমাদের জাতীয়-সভ্যতা ইতিহাস-সঞ্চিত সমস্ত ভাব-সম্পদ লইয়া এখনও নীরবে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতেছে, শান্তির মধ্যে, সংযমের মধ্যে, সরলতার মধ্যে, সহজ ও স্বাধীন প্রেমময় জীবনের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির মধ্যে।

বাহিরের চিন্তা-স্রোত হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের যে দোষ হইয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। একটা গোঁড়ামির ভাব, একটা সঙ্কীর্ণতা, আচারের একটা অন্ধ অনুকরণ, আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। আমাদের নাগরিক সাহিত্য পাশ্চাত্য-সভ্যতা হইতে দীক্ষা লইয়া—এই সঙ্কীর্ণতা এই গোঁড়ামিকে যে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা আশার বিষয়। বাস্তবিক এতকাল পরে সভ্যতার শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া ঘোর স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব দোষ হইবে সন্দেহ নাই।

নকল ও আসল জীবন

কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট শিক্ষালাভ আমাদের নিজেদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশসাধনের যেন এক উপায় মাত্র হয়। দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় পাশ্চাত্য-সভ্যতার নিকট স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন। জাতির প্রকৃত বিশেষত্ব, দেশের আসল মনুষত্ব তথাকথিত শিক্ষিতদিগের মধ্যে বিকাশলাভ করিতেছে না।

দেশের আসল জীবন,—সহজ, সরল, অকৃত্রিম জীবন, স্কুল কলেজের বাকবিতণ্ডা, আফিস আদালতের হাকিমী, জারিজুরী, Drawing room, parlour, club-room-এর ইয়ারকি, নাগরিক জীবনের হৃদয়হীনতার মধ্যে লোপ পাইয়াছে।

সেই আসল জীবনকে পাই আর এক জগতে,—সেখানে সে এখনও আমাদের গরুচরা মাঠে, ছায়া-ঢাকা খেয়াঘাটে, বনে ঘেরা কুটীরে নিত্য নূতন রসের রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে। সেই সুন্দর রসভরপুর মধুর জীবন প্রাতঃকালের অবকাশের মধ্যে কত অশ্রু-সজল ভৈরবী গানে পথহারা পথিক 'পরাণ'—তরুণ হৃদয়কে কাঁদাইতেছে, মধ্যাহ্নের কর্ম্মক্লান্তির আবেশে কত ভাটিয়াল, কত গম্ভীরা, কত বাউল, কত প্রসাদীগানে ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্নজল দিতেছে এবং ঝিল্লী মুখরিত রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে কত রামায়ণ মহাভারত, ভাগবতের কত কাহিনী শুনাইয়া কত সুখ দুঃখের, আশা নিরাশার, বিপদ সম্পদের বিহ্বলতা দূর করিতেছে।

আসল-সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, এই আসল জীবনকে অবলম্বন করিয়া। নাগরিক জীবন নকল জীবন; তাই নাগরিক-জীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শুধু নকল-সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিয়াছে।

অচলায়তন-সাহিত্য

ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। টেবিলে কেরাসিন-আলো জ্বলিতেছে। সন্ধ্যা হইতে সকলে মিলিয়া গল্পগুজব করিতেছে। সিগারেটের ধূম, কেরাসিন আলোর তাপ, লোকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সকলে মিশিয়া ঘরটাকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সাহিত্যচর্চ্চা এইরূপেই নাগরিক-জীবনের বদ্ধ অচলায়তনের তাপ ও গ্লানি সঞ্চয় করিয়া দূষিত হইয়া পড়িতেছে। সমাজকে যেমন অচলায়তন করিয়া ফেলা অসহ্য হয়, সেইরূপ সাহিত্যকেও অচলায়তন করিয়া ফেলিলে তাহাও অসহ্য,—জীবন ও স্বাস্থ্য বিকাশের প্রধান অন্তরায়; কিন্তু বদ্ধ অচলায়তনের নব্য-সাহিত্য এখন বলিতেছে, দরজা জানালা খুলিয়া কাজ নাই, দুরন্ত বাতাস আলো নিবাইয়া দিবে, বদরসিক অসমজ্‌দার পাড়ারলোক ঢুকিয়া ঘরের মজলিস একবারে মাটী করিয়া দিবে। তাহার অহঙ্কার হইয়াছে, আসল সত্য ও সৌন্দর্য্য খোলা আকাশ, বাতাস, মাঠ ঘাট ত্যাগ করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে; এবং যতই এই অহঙ্কার বাড়িতেছে, ততই সে আপনার বাহিরের জাঁকজমক, ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের—শিল্পচাতুরীর দিকে মন দিয়া আসল সত্য ও সৌন্দর্য্যের গৌরব খর্ব্ব করিতেছে। শুধু তাই নহে, অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া সে বদ্ধঘরের তাপ ও গ্লানি সত্য ও সৌন্দর্য্য বলিয়া সকলকে দান করিতে বদ্ধপরিকর। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দাও। বাহিরের মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে সমস্ত গ্লানি দূর হইবে। বদ্ধচিত্তকে মুক্তি দিয়া সাহিত্য এখন বাহিরের বিশ্বজোড়া প্রাণ অনুভব করুক। সে যে তাহারি প্রাণ, তাহার যুগ-যুগান্তকালের ইতিহাসের ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত প্রাণ; জাতির ক্রম বিকাশের সহিত যে তাহার শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় যোগ রহিয়াছে। সাহিত্য এই যোগ অনুভব করুক। সাহিত্য আপনার বদ্ধচিত্তকে সত্য ও সৌন্দর্য্য-লোকে জাগ্রৎ চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক; তখন তাহার সমস্ত পাপ গ্লানি খোলা আলোর বাতাসের পুণ্য স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে বিলীন হইবে।

সাহিত্য—দেশী বিদেশী

বদ্ধঘরের পাপ ও গ্লানির মধ্যে সাহিত্য যে মাঝে মাঝে জাতীয় চৈতন্যের সহিত পরিচয় লাভ করে নাই, তাহা নহে। প্রায়ই বিদেশীয় চৈতন্যপ্রভাবে দেশীয় চৈতন্য একবারেই লোপ পাইয়াছে; কিন্তু মাঝে মাঝে বিলাতী ও দেশীয় চৈতন্য বেশ মিশিয়া একটা সুন্দর ও নূতন সৃষ্টিও হইয়াছে; আবার সময় সময় মেলামেশাটা সম্পূর্ণ হয় নাই; তখন সমন্বয় না হইয়া একটা খিচুড়ি হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' মত অমন জোবালো বই আমাদের সাহিত্যে নাই বলিলেও চলে। অথচ ইহা একদম Romola -র বাঙ্গালী সংস্করণ। "গোরায়" আমরা বিদেশীয় nationalism-এর স্বদেশী সংস্করণ দেখিতে পাই বটে; কিন্তু ইহা স্পষ্ট বিদেশী তাহার প্রমাণ হিন্দুত্ব-প্রচারক গোরার

আইরিশ-জন্ম। 'মেঘনাদবধে' আমরা মিল্টনের সয়তানকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া ধৌত করিয়া লইয়াছি; 'কুরুক্ষেত্রে' 'রৈবতকে' আমরা কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে জর্ডন নদীতে চুবাইয়া আনিয়াছি। এমন কি বেদব্যাস দ্বৈপায়নকে শ্বেতদ্বীপ-তীর্থে পার্কার ও নিউমানের বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া আসিতে হইয়াছে। 'বৃত্রসংহারে', দেবগণের জটলা—Paradise Lost এর infernal crew-র বঙ্গে আগমন।

আবার বিদেশী ও দেশী ভাবের একত্র সমাবেশে খুব জোরালো লেখার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যথা—দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি, নৌকাডুবি ইত্যাদি। "দুর্গেশনন্দিনী"র আয়েষার পার্শ্বে আমাদের সূর্য্যমুখী, কমলমণি আছে। চোখেরবালির বিনোদিনীর পার্শ্বে আমাদের আশা আছে। নৌকাডুবির হেমনলিনীর পার্শ্বে আমাদের কমলা আছে।

আবার আমাদের নিখুঁত দেশী ভাবের সৃষ্টিও আছে। রবীন্দ্রবাবুর প্রথম উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাটে' ও 'রাজর্ষি'তে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর ছোট গল্প, 'দিদি', 'সমাপ্তি', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', প্রত্যাবর্ত্তন', 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতিতে তাহা lyric-এর শক্তি ও সৌন্দর্য্য লইয়া অতি সুন্দরভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। নাটকের মধ্যে আমাদের "লীলাবতীর' পার্শ্বে 'নীলদর্পণ' আছে, আমাদের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'পরপারে' আছে। আমাদের 'স্বর্ণলতা' আছে, 'শক্তিকানন' আছে, 'শুভবিবাহ', 'ধ্রুবতারা' আছে। আমাদের 'দিদি' আছে। আমাদের 'বিন্দুর ছেলে', 'বিশুদাদা', 'ছোটকাকী' আছে। আছে, কিন্তু বেশী নাই।

নিখুঁত দেশী বইয়ের রহস্যের মধ্যে প্রায় সবেতেই মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত-সমাজের চিত্র; চিত্রপট খুব ছোট, দেশের শ্রমজীবীগণ একবারেই বাদ পড়িয়াছে। যাহাদের লইয়া দেশ, তাহাদের সহজ ও স্বাধীনজীবন আমাদের এই কৃত্রিম হাতে-গড়া পোষাকী সাহিত্যে কি করিয়া থাকিতে পারে?

বহুকাল ধরিয়া টেবিল, চেয়ার, আরাম-কেদারা আশ্রয় করিয়া আমরা Scott, George Elliot পড়িয়া উপন্যাস লিখিতেছিলাম, Byron ও Tennyson পড়িয়া কাব্য লিখিতেছিলাম, Moliere, Sheridan পড়িয়া নাটক লিখিতেছিলাম। আজ এখনও আমরা Scott, Byron ও Shelley-র যুগ অতিক্রম করিয়া Tolstoy ও Ibsen পড়িয়া নভেল তৈয়ারী করিতেছি, গল্পে "Daudet ও Maupassant" ফুটাইয়া তুলিতেছি। Materlink ও Strindburg এর শিষ্য হইয়াছি। নাটক লিখিতে যাইয়া আমরা একবারে মোগলবাদসাহের দরবারে যাইয়া হাজির; আমাদের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ নাই; যেন ভাল মন্দ সুখ দুঃখ যাহা কিছু সবই ছিল সেই ঐতিহাসিক যুগে,—পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময়ে। এমন কি পাঠান মোগল চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়াও আমরা ঐতিহাসিকভাব রাখিতে পারি নাই। যেমন সাজাহান চিত্রিত করিতে

যাইয়া আমরা King Lear আমদানী করিয়াছি। এতই আমাদের বিদেশীয় মোহ। তাই আমাদের আসল সাহিত্য বেশী জন্ম লয় নাই।

শাক্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতা

প্রায় চার শতাব্দী হইল একবার আমাদের এই দেশে বাধা, বন্ধন, কৃত্রিমতার মধ্যে, পরাধীনতার পাপে দূষিত বদ্ধজীবনের মধ্যে, এমন একটা ভাবুকতার ঢেউ উঠিয়াছিল, যাহা উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সাধারণ, অসাধারণ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের হৃদয় তোলপাড় করিয়া একটা জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে আন্দোলনে অধিকার-ভেদ, আভিজাত্য ছিল না; সকলের অধিকার, সকলের মনুষ্যত্বের গৌরব অটুট ছিল। সে আন্দোলন একই সঙ্গে ধর্ম্মের পরোক্ষবাদ, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য, ও সমাজের স্বাধীনতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। সমস্ত কৃত্রিমতা, সমস্ত পরাধীনতার মধ্যে তাহা একটা সরল, মুক্ত ও সুন্দর জীবনের সৃষ্টি করিয়া আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মনপ্রাণকে গঠন করিয়া আসিতেছে। সেই শাক্ত ও বৈষ্ণব-সাধনার যুগ হইতে বাঙ্গালী আজও তাহার সাধনার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। তখন বাঙ্গালীর সাহিত্যের জাতীয়-সাধনার কার্য্যকারণ যোগ ছিল। সাহিত্য একটা অবাস্তব খাপছাড়া সৃষ্টি ছিল না। একটা Concrete অধ্যায় জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিয়ছিল। সে সাহিত্যে অধিকার ভেদ ছিল না, কারণ সে সাহিত্য যে মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনুষ্যত্বে সকলের অধিকার, কাহারও অনধিকার নাই। সে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল শুধু ব্রাহ্মণ নহে, হীন কামার, দোকানদার, চাষী, ধোপা, পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীও সে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্ম্মের ভাবুকতা, সমাজের বাধাবন্ধন-বিহীনতার মত সে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য একটা সত্য অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা লইয়া সমগ্র জাতির হৃদয় আন্দোলিত করিয়াছিল এবং তাহাকে মুক্ত জীবনের পরিচয় দিয়াছিল। সে মুক্ত-জীবনের মনোমুগ্ধকর বাঁশীর সুরে সমগ্র জাতির হৃদয় আকুল আবেগে পাগলিনী রাধার মত ছুটিয়াছিল।

স্বদেশাত্মা ও সাহিত্য-শক্তি

আজ এই দূষিত জীবনের পাপ সঞ্চয়ের মধ্যে, এই বাধাবন্ধন, কৃত্রিমতার মধ্যে, সেই সহজ সরল মুক্ত জাতীয়-জীবন প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও স্বাধীনতার দিক দিয়া আমাদিগের সাহিত্যকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের জাতীয়-হৃদয় যমুনার তীরে আমাদের স্বদেশাত্মা সেই পরম মোহন সাজে সাজিয়া তমালতলে নিখিল-রসাত্মিকা চিত্তময়ী সাহিত্যকে আর কেহ ঘরে বদ্ধ রাখিতে পারিবে না, জাতি কুল, মান অভিমান, লজ্জা ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া সে সেই গোচারণ-মাঠের রাখাল, খেয়াঘাটের মাঝি, তমালতলের বংশীধারীর দিকে ছুটিবেই,—বিশ্বগ্রাসিনী শক্তির লীলা

দেখাইয়া ছুটিবেই, শ্রীঅঙ্গে নিখিল সৌন্দর্য্যের সুষমা ধরিয়া, অন্তরে পরম জ্ঞানের অগাধ আনন্দ লইয়া, হৃদয়ে অসীম প্রেমের অবাধ উচ্ছ্বাস লইয়া। সেই গোচারণ মাঠই যে আমার জাতীয়-জীবন দেবতার ক্রীড়াভূমি, সেই তমাল-ছায়াই যে আমার চিরকিশোরের বিলাসক্ষেত্র আর সেই কল্লোলিনী যমুনার লীলালহরী আমার চিরলীলাময়ের নিত্য-তরঙ্গিত ভাবস্রোত। আমার লোক-ললামভূতা, নিখিল-জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্যময়ী সাহিত্য-স্বরূপণী, ভাবাত্মিকা, আরাধিতা শ্রীরাধিকা যখন সেই বংশীধারীর চরণে আত্মনিবেদন করিবে, তখন সে জানিবে যে তিনি শুধু রাধিকাহৃদিবল্লভ নহেন, এমন কি গোপী-জন-বল্লভও নহেন, তিনি জগন্মোহন, নিখিল-মনমোহন। তিনি শুধু তমালতলে, গরুচরা মাঠে, খেয়াঘাটে থাকেন না; নিখিল বিশ্বের হৃদয়-দ্বারকায় তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, নিখিল বিশ্ববাসীর অন্তরে ধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রের তিনিই অধিনায়ক।

যিনি গোপগৃহে জাত রাখাল বংশীধারী, তিনিই মথুরার রাজা, তিনিই যুগে যুগে ধর্ম্ম সাম্রাজ্যের সংস্থাপক। বঙ্গের ভাবময়ী রাধা তাঁহার হৃদয়-সঙ্গিনী, পাশ্চাত্য-কল্পনা-রঙ্গময়ী কুব্জা তাঁহার চিত্তবিনোদনের সেবিকা মাত্র।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রী সিদ্ধেশ্বর সিংহ

উভয়েই পরলোকে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সাধনার সফলতা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের বীণার মধুর তান পঞ্চমে লয় প্রাপ্ত হইয়া থামিয়া গিয়াছে। এই শোক-সমাধির পাদদেশে আজ আমরা দণ্ডায়মান। চাহিয়া আছি, যদি কেহ বলিয়া দেন, কোন্ অজানা মহাপ্রদেশে তাঁহারা গমন করিয়াছেন। যেদেশে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে তাঁহারা পূজা প্রাপ্ত হ'ন নাই—বাঙ্গালাদেশ তাঁহাদের পূজা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই দুঃখের জলধারা যদি বন্যার জলস্রোতের ন্যায় বঙ্গের প্রত্যেক হৃদয়কে প্লাবিত করে, তবেই তাঁহাদের পূজার সময় আসিবে। হায়! সে দিন কি আসিবে?

তাঁহাদের মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, এবং তাঁহাদের নিকটই বা বাঙ্গালাসাহিত্য কি সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

আমি বক্তা বা লেখকরূপে আজ দণ্ডায়মান হই নাই; সে শক্তিও আমার নাই। আমার এই অকিঞ্চিৎকর নিবেদন যদি সেই মহতী স্মৃতির সম্মানরক্ষা করিতে পারে, তবেই আমার পূজা সার্থক হইবে।

এইবার তাঁহাদের কাব্য-নাটকের কথা। বিস্তৃত সমালোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে; তাই তাঁহাদের ধীশক্তির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উভয়েই কবি ও নাট্যকার। গিরিশবাবুর "গৈরিশীছন্দ", দ্বিজেন্দ্রবাবুর অপূর্ব্ব "শব্দ-যোজনা" বাঙ্গলায় নূতন সৃষ্টি। এই সম্পদ অমূল্য। কবিত্বে দ্বিজেন্দ্রলাল, নাটকে গিরিশচন্দ্র বোধ হয় প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় এমন একটা প্রাণোন্মাদিনী শক্তি লুক্কায়িত আছে, যে ভাবুক সেই বুঝিতে পারিবে। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা নাট্য-কল্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দ্বিজেন্দ্রলালের খণ্ডকবিতাও কাব্য-বিশেষ, তাহার উদাহরণ "আমারদেশ", "আমার জন্মভূমি"। গিরিশচন্দ্রেরও "হলদীঘাট" সেই শ্রেণীর। এই একটী কবিতাই তাঁহাকে উচ্চ-আসন প্রদান করিয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তি, স্মৃতির উন্মেষ, বর্ণনার অপ্রতিহত গতি, শব্দের মধুর ঝঙ্কার, কবিত্বের নিদর্শন, তাহা পূর্ব্বোক্ত কবিতাগুলিতে কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কাব্যে কবিকে ধরা যায়, ইহা অনেকের মত। গিরিশচন্দ্রের শতাধিক নাটকেও তাঁহাকে ধরা যাইত না, Shakespeare-এর বহু নাটকেও তাঁহার স্বরূপ পাইতাম না, যদি আমরা তাঁহাদের জীবনের "আলো ও অন্ধকার" দুইটী দিক জানিতাম। Paradise Lost-এ Milton-কে বুঝিয়াছি, কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালকে ধরিয়াছি। এইটুকু

বিশেষত্ব। গিরিশচন্দ্রের জীবনে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের মিলন যদি না জানিতাম, তাহা হইলে তাঁহার "বিল্বমঙ্গল" বুঝিতে পারিতাম না। কার্য্য ও উদাহরণ মানষকে নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়ে, সেই জন্য মহতের সহবাস জীবনে এত বাঞ্ছনীয়। Milton-এর Puritanic ভাব না থাকিলে Paradise Lost এত উচ্চ হইত না; দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশভক্তি না থাকিলে তাঁহার কবিতা এত মিঠা লাগিত না।

এইবার তাঁহাদের পার্থক্য বা বিশেষত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বদেশী ও বিদেশী ভাবের মিশ্রণ আছে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে খাঁটি ভারতীয় আর্য্যভাব। তবে পৌরাণিক নাটকেই গিরিশচন্দ্রের সমাধিক কৃতিত্ব, সেই পৌরণিক চরিত্র একটু কোথাও মলিন হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সীতাকাব্যে সীতানির্ব্বাসন বিষয়ে বাল্মীকি ও বশিষ্ঠের কথোপকথন ও উত্তর প্রত্যুত্তরে রামচরিত্র ছোট হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদন দত্তের রামলক্ষ্মণ চরিত্র সেই দোষে দূষিত, তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। যাহারা কাব্যে advocacy বা ওকালতি অবতারণা করে, তাহাদের কথার gloss সাধারণ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

জনা নাটকে জনা, ও পাণ্ডবগৌরবের সুভদ্রা ভারতীয় বীরাঙ্গনার প্রতিমূর্ত্তি। যাহা পড়িয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহাই, একটু অতিরঞ্জিত নহে। ক্ষত্রিয় রমণীর আদর্শ এত সুন্দর—এত মহান কোথাও দেখি নাই। গিরিশচন্দ্র সেই চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

শুনা যায়, ভরতঋষি ভারতীয় নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক। সংস্কৃত নাটকাদিতে "নান্দীবাক্য" মধ্যযুগের ইংরাজি নাটকের prologue-এর মত, তবে প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান নাটকগুলির ভাব ভাষা ও অঙ্কবিভাগ অনেকটা পাশ্চাত্যধরণের হইলেও গিরিশচন্দ্রের নাটকে সংস্কৃত-যুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তাহা একেবারেই নাই—স্থান-নির্দ্দেশ, নেপথ্য-অভিনয় প্রভৃতি বহুল পাশ্চাত্য ইঙ্গিত তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। ফল কথা, গিবিশচন্দ্র সংস্কৃত-নাট্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের নাট্য রীতির উপর নিজের অসাধারণ প্রতিভাকে সংযোগ করিয়া তাঁহার নিজের নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থা এখনও আদর্শ হইয়া আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকে সংস্কৃত নাটকের ছায়াপাত একেবারেই করেন নাই, বরং বাঙ্গলা নাটকে পাশ্চাত্যভাব, ইঙ্গিত প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া নূতন ধরণ, নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি স্বাধীনচিন্তার ক্ষেত্র হইলেও ভাবদুষ্টি দোষে সঙ্কুচিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্র কোন নাটকে হিন্দুর-আচার-ব্যবহারের বাহিরে যান নাই। এই গেল তাঁহাদের নাটক-রচনার পদ্ধতি।

উভয়ের নাটকগুলির স্তরবিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ বয়সের রচনা উন্নত, মেঘবারির ন্যায় স্বচ্ছ, কল্পনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু গিরিশবাবুর নাটকে সেরূপ স্তরবিভাগ নাই বলিলেই চলে। তাহার কারণ তাঁহাকে অনেক সময়

থিয়েটারের অধ্যক্ষদিগের মুখ চাহিয়া নাটক লিখিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রথম-বয়সের রচনা বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব, চৈতন্যলীলা, নসীরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক নাটক ধর্ম্মজগতে এক একটী প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম এক একটী নাটকের মূলমন্ত্র। যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, সেই ভাবেই ভগবানকে পাইয়াছে। ইহাই হিন্দুর সার ধর্ম্ম, শাস্ত্রের উপদেশ এবং হিন্দুজীবনের ত্রিধারা। "বিল্বমঙ্গলে" সংসারী মানুষের পরিণাম প্রদর্শন, শত প্রলোভনের ভিতর দিয়া নিজেকে রক্ষা করিয়া কিরূপে ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত। যে আজন্ম বনে বসিয়া তপস্যা করে, প্রলোভনের মরীচিকায় আত্মবিস্মৃত হয় নাই; তদপেক্ষা যে লোক পদস্খলিত হইয়াও নিজেকেও রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার শক্তি উচ্চ। সেই হিসাবে বিল্বমঙ্গল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং বিল্বমঙ্গল নিজে সাধকশ্রেষ্ঠ। তারপর বুদ্ধদেব। ক্লেশ, দুঃখের হাত হইতে নিজের আত্মাকে কি করিয়া মুক্তির পথে, নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাওয়া যায়, পরোপকার মহাব্রতে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারা যায়, সংসারের সকল দুঃখ দৈন্য বিমোচনের জন্য জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া কর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়, বুদ্ধদেব-চরিত তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। বুদ্ধদেব-চরিতের শ্রেষ্ঠত্ব তাহার গানগুলিতে, তাহার উদার সরল ভাবপ্রকাশে, তাহার জ্ঞান-প্রদর্শিত মুক্তিপথে। এরূপ উচ্চাঙ্গের নাটক বঙ্গসাহিত্যে বিরল। বুদ্ধদেবের স্ত্রী গোপার সন্ন্যাসিনীব্রত অপূর্ব্ব, কিন্তু হিন্দু ideal বহির্ভূত নহে। এইটুকু গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব, সেইজন্য গিরীশচন্দ্র হিন্দুর এত আদরের।

তারপর চৈতন্যলীলা। বৈরাগ্য আসিয়া কিরূপ আত্ম-পর ভাবকে বিনাশ করে, সর্ব্বজীবে সমভাব, সমানদর্শন, কিরূপে জীবকে ব্রহ্মপাদপদ্মে লীন করে, তাহার জ্বলন্ত উপদেশ। প্রেম ও ভক্তির পথ অতি সরল। জ্ঞান ও কর্ম্মের পথে শত নৈরাশ্যের বাধা আত্মাকে নিষ্পেষিত করে। যে বাধা অতিক্রম করিতে পারে, সেই শতযুদ্ধজয়ী বীরের ন্যায় অমরত্ব প্রাপ্ত হয়—তাই এ পথ বড় কঠিন, বড় দুর্গম। প্রেম ও ভক্তির পথে যে আসিয়া পড়ে, সেই ভাসিয়া যায়, আমিত্ব ভাসিয়া যায়, অহংজ্ঞান ভাসিয়া যায়, থাকে কেবল ভক্তি মন্দাকিনীর পূতধারা; সংসারের সমস্ত জ্বালা বিধৌত হইয়া আত্মা মেঘবারির ন্যায় নির্ম্মল, অগ্নির ন্যায় পূত এবং সাগরের ন্যায় উদার হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে শিখিবার ভাবিবার অনেক কথা আছে; তবে বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার মত লেখককেও পরের মুখ চাহিয়া নাটকে লিখিতে হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম বয়সের রচনা—পৌরণিক "পাষাণী" অর্থাৎ অহল্যার শাপ-বিমোচন, যেন মানুষের লীলা, কারণ ও কার্য্যে ঘাত-প্রতিঘাত। শ্রীরামচন্দ্রের ভগবান-আদর্শ যেন তর্কের সীমার ভিতর আবদ্ধ, প্রতিপাদ্য বিষয়টী যেন কত সঙ্কুচিত তাই

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরণিক নাটক বা দৃশ্যকাব্য তত বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, যেন একটা "কিন্তু"র আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে।

তার পর তাঁহাদের মধ্যভাগের রচনা। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, জনা, পাণ্ডব-গৌরব ও বলিদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক নাটকের কোহিনূর, প্রফুল্ল—সংসারের নিখুঁত ফটো। এমন সুন্দর চিত্র কোথাও দেখি নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের "পরপারে" হিন্দু-সংসারের ideal-এর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাই সামাজিক হিসাবে "পরপারে" মূল্যহীন। যে ভাবের জন্য মন প্রস্তুত নহে, সে ভাব আদৃত হয় নাই। এক "প্রফুল্ল" গিরিশবাবুকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসন প্রদান করিতে পারিত, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের "পরপারে" তাঁহাকে নাট্যকারের আসন দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। সংসারে যাহা দেখি না, নাটকে তাহা দেখি। Theory নাটকে চালাইতে হইলে নাটক নীরস ও বিকৃত হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক নাটকে, তাঁহার মধুর হাস্যরস রচনায়, তাঁহার অতুল্য সঙ্গীতে। সে সঙ্গীতের প্রাণ-মাতান তান আর কোথাও পাই নাই। Mollire-এর নাটকেও হাস্যরস-রচনার উৎকৃষ্ট নির্দশন। তবে মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ-সংস্কারের জন্য বহু মত-ভেদ, ধর্ম্মভেদ, রঙ্গমঞ্চে নাটকাকারে অভিনীত। দেশ যখন অবনতির চরম সীমায় নামিয়া যায়, তখন উচ্ছৃঙ্খলতা, কু-নীতি সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে প্রসারিত হয়; সেই সকল নিবারণের জন্য ফরাসী Mollire লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার লেখাও সার্থক হইয়াছিল। বঙ্গ-নাট্য-সমাজে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও গিরিশচন্দ্রের প্রহসন অনেকটা সেইরূপ কার্য্য করিয়াছে। তবে গিরিশিচন্দ্রের প্রহসনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ব্যক্তিগত হিংসা বা শ্লেষবর্জ্জিত। প্রহসনের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার—নাট্যাকারে সমাজের দোষগুণগুলি লোক-সমক্ষে প্রদর্শন করা। এক সময়ে বঙ্গদেশে গিরিশচন্দ্রের ও অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রহসনরূপী চাবুক সমাজের উপরে কশাঘাত করিয়া সৎপথে ফিরিয়া আনিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন কেবল সামাজিক দোষগুণের উপর সবিশেষ অধিষ্ঠিত না হইলেও, তাঁহার ব্যঙ্গ মর্ম্মস্পর্শী, humour অন্তঃশিলা নদীর ন্যায় প্রধাবিত। বড় মিষ্ট আস্বাদ, সহজে ভোলা যায় না, অর্থাৎ বেশ উপভোগের জিনিষ। এই humorous vein বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বপ্রথম দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার humour টীকে ইংরাজীতে বলিতে হইলে বলিতে হয়, Sunny, bright almost like cut-jewel–বেশ রৌদ্র-দীপ্ত মণিখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল—মণির ন্যায় মহার্ঘ্য, অন্যের নিকট তাহা এখনও দেখি নাই।

এইবার তাঁহাদের ঐতিহাসিক নাটকের কথা বলিব।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে নূতন ধারা, নূতন পদ্ধতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনেক নাটকে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার একজন ভক্ত শিষ্য হইলেও এ কথা বলিতে বাধ্য। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক

নাটকে নূতন চিন্তা, স্বাধীন গবেষণা বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালার কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহাদের যত্নে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক-কালিমা অনেকটা মুছিয়াছে, আরও মুছিয়া যাইবে সন্দেহ নাই! কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল, তাঁহার রাণা প্রতাপের শক্ত সিংহ, সাজাহানের জয়সিংহ, চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রকে ইতিহাস হইতে অনেক নীচে ফেলিয়া দিয়াছেন। নাটকের plot ও development চরিত্রের বিকাশের উপর নির্ভর করে; কিন্তু অযথা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে খাটো করিয়া দিলে নাটকের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। মহাত্মা টডের রাজস্থান-লিখিত শক্তসিংহ আর দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তসিংহের অনেক প্রভেদ! রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ মোহের বশে একটি মোগল রমণীকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন!—বিবাহের যথেচ্ছাচারিতা বা অসবর্ণ-বিবাহ তিনি একটা theory বা মত স্বরূপ নাটকে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার আশা দুরাশা বলা যাইতে পারে। সেনাপতি জয়সিংহ মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সেই জয়সিংহ কাপুরুষ, হীন চাটুকাররূপে চিত্রিত হইয়াছেন! চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য মৌর্য্যবংশ ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণ-রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু রক্ষা বা পালনকার্য্যে ক্ষত্রিয় যেরূপ উপযোগী—ব্রাহ্মণ সেরূপ নয়, ইহা ভারতের ইতিহাসে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্য এক অদ্ভুত চরিত্র। এ চরিত্র অপর কেহ অঙ্কিত করিতে পারিত কি না সন্দেহ। সে নাটকীয়-চরিত্র সহানুভূতি আকর্ষণ না করে, অর্থাৎ ভাল ও মন্দের standard-এ প্রতিপন্ন না হয় যে ঐ চরিত্র মনুষ্য-চরিত্র-গঠনের উপযোগী, তাহা হইলে কল্পনা ও সত্যের মিশ্রণ বা hybrid কার্য্যকরী হয় না। কল্পনাকে সত্যের ছায়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্যের উপর গিল্‌টী বা কারিকুরী চলে না। দুর্গাদাস নাটকের ঔরঙ্গজীবের অত্যাচারের স্বপক্ষে কতকটা ওকালতি আছে, যে ইউরোপে মধ্যযুগে তদ্‌পেক্ষা আরও লোহমর্ষণ অত্যাচার হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া কি অত্যাচারের সমর্থন করিতে হইবে? অত্যাচার সকল সময়েই বর্জ্জনীয়, যে কোন প্রকারেই হউক না কেন? গিরিশচন্দ্রে "সিরাজউদ্দৌলা" ও "মীরকাশিম" কঠিন সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। সেই নবালোকের-সূর্য্য শ্রদ্ধাপদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যে স্বাধীন-চিন্তার পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে লইয়া গিয়াছেন। সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাশিম যেন অন্য প্রকারের। লোকে বুঝিয়াছে যে, কি এক মহা সত্য এতদিনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য মৈত্রেয় মহাশয় হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

তারপর গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা, তপোবল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নাটক। বিশ্বামিত্রের তপোবল, শঙ্করের আরাধনা উভয়ই বড় কঠিন; কিন্তু এই কঠিন শৈলগাত্র

হইতে যেন অমৃত-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণী ছুটিয়া গিয়াছে। এরূপ নাটক বোধ হয় গিরিশবাবুর নিজস্ব, এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যে অমূল্য দান।

এইবার আমরা দেখিব, এই উভয় নাট্যকারের দ্বারা বঙ্গভাষা কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে এখন অনেক রত্নরাজি সঞ্চিত হইতেছে সত্য, কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের দানও অকিঞ্চিৎকর নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের নূতন ভাব, নূতন সুর, গিরিশচন্দ্রের সরল সরল ছন্দোবন্ধ বাঙ্গালার নাটকগুলিকে নূতন প্রাণ দিয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের প্রধান নাটক সংস্কৃতবহুল সজারুর কাঁটার ন্যায় শব্দগুলিকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করিয়া এক অভিনব সম্পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কত পৌরাণিক, কত ঐতিহাসিক কত সামাজিক চিত্র তাঁহার লেখনীস্পর্শে আমাদের হৃদয়ের কাছে আসিয়া পঁহুছিয়াছে—তাহার ইয়ত্বা নাই। কুরুক্ষেত্র কাব্যের সুভদ্রা ও পাণ্ডব-গৌরবের সুভদ্রা বিভিন্ন আদর্শের। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা Floral Nightingale-এর প্রতিচ্ছায়া, কিন্তু গিরিশচেন্দ্রর সুভদ্রা বীরাঙ্গনার প্রতিকৃতি—ঠিক যাহা বলিয়াছে, শুনিয়াছি, তাই একটু; বিকৃত নহে। আদর্শ উচ্চ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, নিম্ন আদর্শ শীঘ্রই বালিচাপা পড়ে।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গিরিশচন্দ্র অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাটক লিখিয়া বড় হইয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প দিনের মধ্যে অল্প লিখিয়াই বড় হইয়াছেন। আমরা যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের এত মূল্য! তাঁহার কার্য্য দেবতার ন্যায় প্রেরিত, যেন কোন মহাস্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, কার্য্যশেষে আবার চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার জন্মে বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ধন্য হইয়াছে—কিন্তু তিনি বিনা ধন্যবাদেই চলিয়া গিয়াছেন—এই যা দুঃখ।

গিরিশচন্দ্রের mission সম্পূর্ণ হইয়াছে। বঙ্গ-নাট্যশালা সুসংস্কৃত হইয়া অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু নাট্যশালায় প্রকৃত কার্য্য হয় না, এই দুঃখ। যে নাট্যশালার অভিনয়ে লোকের মতি গতি নিয়ন্ত্রিত হইবে সেই নাট্যশালার কথা মনের মধ্যে উদিত হইলেও কেমন একটা ঘৃণার ভাব আসে।

উভয় মহাত্মাই এখন স্বর্গে। আমরা এই সম্মিলনীর মহা-মিলনের শুভ সুযোগে তাঁহাদের গুণাবলীর আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করি; তাঁহাদের স্মৃতি আমাদিগের মধ্যে জাগ্রত করি, বাঙ্গালীর গৌরব বলিয়া গৌরবান্বিত হই, ইহাই যেন ভগবান করুন।

মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য

আব্‌দুল করিম

মাতৃভাষা হিসাবে একটা ভাষার যে পরিমাণে অনুশীলন ও আদর হওয়া উচিত, বাঙ্গালার বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সে পরিমাণ আদর ও চর্চ্চা নাই, একথা খাঁটি সত্য। চর্চ্চা ত দূরের কথা, অনেকে বাঙ্গালাভাষাকে আজও মুসলমানগণের মাতৃভাষা বলিয়াও স্বীকার করিতে চান না। এক শ্রেণীর লোক বরাবরই উর্দ্দু ভাষাকেই বাঙ্গালার মুসলমানগণের জাতীয়ভাষারূপে প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলনে দেশের আর কোন উপকার হউক বা নাই হউক, তাহার ফলে উর্দ্দুভাষা আজ বাঙ্গালার মুসলমানগণের নিকট একটা উপসর্গ রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজী, বাঙ্গালা, আরবী, পারসী ও উর্দ্দূ—এই ভাষা পঞ্চকের নিষ্ঠুর চাপে পড়িয়া আজ মুসলমান-শিক্ষার্থিবৃন্দের শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু মুখে স্বীকার করি আর নাই করি, বাঙ্গালাভাষাই যে মুসলমানগণের প্রকৃত মাতৃভাষা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাতৃভাষা যতদিন জাতীয়-ভাষার স্থানাধিকার না করিবে, ততদিন সেরূপ মাতৃভাষা দ্বারা কোন জাতির উপকার সাধিত হইতে পারে না। স্বাভাবিক ভাষা ত্যাগ করিয়া মুসলমানেরা একটা বিদেশীয় ভাষাকে আনিয়া আজ গায়ের জোরে জাতীয় ভাষার স্থলাভিষিক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফল বিষময় হইতেছে, অথচ অনেকে দেখিয়াও তাহার অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বটে।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকেই আপনাদের মাতৃভাষা ও জাতীয়-ভাষারূপে গঠন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত ছিলেন। সে চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে আজ বঙ্গভাষায় মুসলমানদিগকে বিজাতীয় ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হইত না; এবং বঙ্গভাষা আজ সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদের নিজের ভাষা হইতে পারিত। প্রাচীন মুসলমান-কবিগণের আরব্ধ কার্য্য আজ পর্য্যন্ত অনুসৃত থাকিলে বঙ্গভাষা মুসলমানগণের জাতীয়-ভাষারূপে পরিণত হওয়ার কোন বাধাই ছিল না। বর্ত্তমানকালেও যে কোন বাধা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। উর্দ্দু ভাষা প্রচলনের জন্য যে শক্তির অপব্যবহার চলিতেছে, তাহা এদিকে প্রযুক্ত হইলে বাঙ্গালার ভাষারাজ্যে মুসলমানেরা সহজেই লব্ধপ্রবেশ হইতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তাহাতেই দেশের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

সেকালের মুসলমান কবিগণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে রূপ অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বঙ্গভাষায় আজ আমাদের একটা বিশেষ দাবি করিবার

অধিকার জন্মিয়াছে। এক সময় শত শত মুসলমান-কবির অভ্যুদয় ও শত শত কাব্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া মুসলমান-সমাজ আমোদিত করিয়াছিল। আলাওলের মত বিদগ্ধজন ও কবির আবির্ভাবে যে কোন জাতি বা সমাজ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। "পদ্মাবতীর" অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সৌন্দর্য্য দীনেশ বাবুর কৃপায় এখন বাঙ্গালী পাঠক সমাজে সুপরিচিত। এরূপ আরও বহু সাহিত্য-সম্পদ আমাদের ছিল বা আছে, যাহা লইয়া আমরা সমভাবেই গৌরব করিতে পারি। আজ এখানে আমরা একজন মুসলমান কবির রচিত আর একখানি অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্যের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব, বাসনা করিয়াছি।

আলাওলের "পদ্মাবতী"র মত প্রতিপত্তি লাভ কোন কাব্যের ভাগ্যে কখন ঘটিবে বা ঘটিয়াছে কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এরূপ আর একখানি কাব্য আমাদের দেশে আছে, যাহা "পদ্মাবতী" প্রভৃতির মতই সর্ব্বজন-সমাদৃত এবং কাব্য-রস রসিকের পক্ষে মনোমদ। উহা সাধারণ পাঠকসমাজে পরিচিত না হইলেও চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। এই কাব্যখানির নাম 'লোরচন্দ্রানী' ও 'সতী ময়নার পুঁথি', দৌলত কাজী নামক কবি উহার প্রণেতা। ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর অতীত হইল রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া কবিবর দৌলতকাজি "সতীময়না" ও "লোরচন্দ্রানী" কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। আলাওলের কাব্যাদি পাঠে জানা যায়, তখন রোসাঙ্গ রাজদরবার বিদ্যামোদী ও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ও রাহবর্গে সমলঙ্কৃত ছিল। মহামতি মাগণ ঠাকুর, সৈয়দ মহম্মদ খান, সৈয়দ মুসা, শ্রীমন্ত সোলেমান, নবরাজ মজলিশ, লস্কর উজির, আসরফ খান, সৈয়দ সাউদসাহ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গ-রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে সমারূঢ় ছিলেন। আলাওল মাগণের আদেশে "পদ্মাবতী" মাগণ ও মুসার আদেশে 'সরফমুল্লুক ও বদিয়ুজ্জমান' মহম্মদ খাঁর আদেশে 'সপ্তপয়কর' 'শ্রীমন্ত সোলেমানের আদেশে 'লোরচন্দ্রানীর' শেষাংশ, নবরাজ মজলিশের আদেশে সেকান্দরনামা এবং কবি দৌলত কাজি, আসরফ খাঁর আদেশে 'লোরচন্দ্রানী' রচনা করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উক্ত সকল মহাত্মাই অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যামোদী ছিলেন। সউদ সাহ রোসাঙ্গের কাজি ছিলেন, আলওল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। অপরাপর মহাত্মাগণ কেহ অমাত্যপদে, কেহ বা সেনাপতিপদে আসীন ছিলেন।

কবি দৌলতকাজী স্বীয় প্রভু রোসাঙ্গরাজ রুস্তুধর্ম্ম সুধর্ম্মের গুণানুকীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ, কিন্তু তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত প্রকটনে একেবারেই উদাসীন ছিলেন।

অন্য কথা দূরে থাকুক, তাঁহার কাব্যে তদীয় বাসস্থানেরও উল্লেখ করিয়া যান নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত মালঘর নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় রোসাঙ্গ-রাজসরকারের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল। তাহা না হইলে তিনি রোসাঙ্গ-রাজ্যের প্রশংসাগানে

এরূপ পঞ্চমুখ হইবেন কেন? তদ্দুদেশে ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

কর্ণফুলী নদীপূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রম বুদ্ধচ্ছার (?)।
নামে রুস্তধর্ম্ম' রাজা ধর্ম্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।
দেবগুরু পূজয়ে ধর্ম্মেতে তার মন।
সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন।।
পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার চরণ।
নারকীও স্বর্গপাত্রে সাফল্য জীবন।।
বিধবা নির্ব্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।।
ভীমসম বলিয়া না করে বলাকার।
সীতাসম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।
রাজভয়ে না নিরখে সহস্র লোচনে। — ইত্যাদি

রাজার বিশেষ অনুগত না হইলে, এরূপ বিমানস্পর্শী গুণানুবাদ অন্য ব্যক্তি নিশ্চয় অনাবশ্যক ও অবান্তর মনে করিতেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি রাজার চরণে কবির পুষ্পবিল্বদলের অর্য্যই হউক, আর যাহাই হউক, তিনি যে বিশেষ গুণগ্রাহী ও গুণবান্ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহারই সচিব (কবির কথায় ধর্ম্মপাত্র) লস্কর উজীর উপাধিধারী আসরফ খাঁর আদেশে 'লোরচন্দ্রানীর' রচনা আরব্ধ হয়। ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ—

ধর্ম্মপাত্র শ্রীযুত আসরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান।।
পীর গুরু অভ্যাগত পূজন্ত তৎপর।
লোক উপকার করে নাই আপ্ত-পর।।
মস্‌জিদ্ পুষ্করণী দিলা বহুলবিধান।
মহাদেবী মনেতে ভাবিল সুনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে ধিক সুপাত্র পণ্ডিত।।
নৃপতি ও পুত্রভাবে হরিষ সাদরে।
মহামাত্য করিলেন্ত আসরফ খাঁরে।
নানা দেশে গেল তান প্রতিষ্ঠা বাখান।।

* * *

মহারাজ্ঞা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন।
তান হস্তে রাজনীতি কৈলা সমর্পণ।।
ছত্রে সমে দিলা সৈন্য পতাকা দুম্‌দুমি।
স্বর্ণ অঙ্গরাগ আর বহুমূল্য জমি।।
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া।
রাজখড়্গ সমর্পিলা লস্করী কাপড়া।।

রাজা ইঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন; এমন কি দিনরাত্রির ইঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল হইতে দিতেন না! ইঁহাদের অবিচ্ছেদ অবস্থানের একটি ঘটনা (অর্থাৎ বিপিন-বিহার) কবি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কাব্য-প্রণয়ানার্থ কবির প্রতি আদেষ্টার আদেশ বাক্যগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

শেষ পুনি কৌতুকে কহিলা মহমতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।।
* * *
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।
গুজার্তি গোহারী খেট ভাষা বহুতর।।
সহজে মহৎ সভা আনন্দ নিয়ড়।
দেশী ভাষে কহো তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ সানন্দে।।

কোথায় গুজরাট, আর কোথায় রোসাঙ্গ (আরাকান)! আরাকানের কোন সমিতিতে গুজরাটি ভাষায় পর্য্যালোচনা হইয়াছিল, একথা বিশ্বাস করা যায় কি?

আরাকানে বাণিজ্য-ব্যপদেশ বিভিন্নভাষা-ভাষী লোকগণের সংঘট্ট হইত, স্বীকার করিলেও গুজরাটের মত এত দূরদেশীয় ভাষা তথায় প্রচলিত ছিল, বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। তবে খেট ও গোহারী কোন্ দেশের ভাষা? এই গোহারী ভাষা-নিবদ্ধ 'লোরচন্দ্রানী' উপাখ্যান কোথায় গেল, অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এখন আর কোন ফল হইবে না।

আগেই বলিয়া আসিতেছি, আসরুফ খাঁর আদেশে কবি দৌলত কাব্যখানির রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কাল কবিবরের এই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা করে নাই। হঠাৎ একদিন গানের মাঝখানেই কবির বীণার তন্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়!

আমাদের আলোচ্য কাব্যের প্রকৃত নাম "সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী।" কিন্তু সাধারণতঃ ইহা "সতীয়না" বা "লোরচন্দ্রানী" নামেই সুপ্রসিদ্ধ। যে নামই হউক না কেন, উভয় গ্রন্থ অভিন্ন। এরূপ নামদ্বয় প্রসিদ্ধি লাভ করিবার কারণও যে কিছু নাই,

তাহা নয়। গ্রন্থখানি আখ্যান-হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে লোরচন্দ্রানীর বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ বিরচিত হইবার পর কবি দৌলতের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এইখানে কবির ভবলীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনবৃত্তেরও পর্য্যাবসান; তাঁহার আরদ্ধ কার্য্যও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এইরূপে "খণ্ডকাব্য পুস্তক আছিল চিরদিন" কত দিন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এই সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মারঃ শেষে তিন নৃপ চলি গেল।।
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপ মহাশয়।।
শুভক্ষণে হইল রোসাঙ্গে অধিপতি।
দুঃখী সুখী হইল দুর্জ্জয় অধিপতি।।

দৌলতের কীর্ত্তিত রোসাঙ্গপতি 'রুস্তুধর্ম্ম সুধর্ম্মার' সংক্ষেপতঃ সুধর্ম্মার মৃত্যুর পর আর তিন জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে রোসাঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দীর্ঘকালের পর 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল এই অসমাপ্ত কাব্যের শেষভাগ রচনা করিয়া দিয়া কাব্যখানি পূর্ণাঙ্গ করিয়া দেন।

সুকবি আলাওল এই অংশ শ্রীমন্ত সোলেমন নামক মহাত্মার আদেশে রচনা করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে আলাওল লিখিয়াছেন ঃ—

প্রথম যৌবন রাজা অভিনব কাম।
কলিযুগে ছিল আসি অবন্তির রাম।।
পাপলেশ নাহি চিত্তে সুপবিত্র মন।
চিত্তমধ্যে নিরঞ্জন ভক্তি অনুক্ষণ।।
চতুরঙ্গ মহীপতি সাগরান্ত সীমা।
নৌকাকুল শব্দে টুটে সমুদ্র মহিমা।।
পূর্ব্বে নৃপ ত্রাসে যথ দেশত্যাগী লোক।
পুনি পাসরিল আসি স্থানভ্রষ্ট দুঃখ।।
দুঃখিতের কর খণ্ডাইলা পুনঃ পুনঃ।
তথাপিই আদ্যহস্তে বাড়ে দশগুণ।
সুধর্ম্মার কীর্ত্তি আদ্যখণ্ডের ভিতর।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে কীর্ত্তি লক্ষ্যান্তর।।
তান মহাপত্র শ্রীমন্ত সোলেমান।
নানা বিদ্যাশাস্ত্রে শতশঃ অবধান

হেম রত্ন আদি যথ ভাণ্ডার সকল।
পাত্র হস্তে দিলা রাজা তান করতল।

অন্যত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা আলাওলের জীবনবৃত্তের আলোচনা করিয়া জন্মকাল আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আলাওল চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের কি তদ্‌পূর্ব্বে রোসাঙ্গে গমন করেন। এই সময়েই শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা রোসাঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সুতরাং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। এই সময়ে তাঁহার ১০ বৎসর রাজত্ব হইয়াছিল অনুমান করিলে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। ইঁহারই পূর্ব্বে তিনজন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কথিত। এই তিনজনের রাজত্বের স্থিতিকাল কত? অবশ্য জানি যে, এক শতাব্দ হইতে এক বৎসরের মধ্যেও তিন জন অধিরাজের রাজত্বও অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনজন রাজাই ক্ষীণায়ু ছিলেন, অনুমান করিলে যুক্তিসঙ্গত হয় কি? গড়ে প্রত্যেকের দশবৎসর রাজত্ব ধরিয়া সাকুল্যে ৩০ বৎসর রাজত্বকাল অনুমান করিলে সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হইবে না। অতএব ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুধর্ম্মা রাজা ও দৌলতকাজী বিদ্যমান ছিলেন, বলিতে হয়। মৃত্যুকালে কাজীসাহেবের বয়ঃক্রম অন্যুন ৪০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এতদ্বারা দৌলতকাজি আলাওলের ৪৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

কবি আলাওল স্বরচিত ‘পদ্মাবতী’র মুখবন্ধে ‘লোরচন্দ্রানী’র উল্লেখ করিয়াছেন,—

যে হেন দৌলতকাজী চন্দ্রানী রচিল।
লস্কর উজীর আসরফ আজ্ঞা দিল।।

পদ্মাবতীর পর হয় লোরচন্দ্রানী, নয় সরফলমুল্লুক বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যখন লোরচন্দ্রনীর উপসংহারভাগ ও সরফলমুল্লুকের পূর্ব্বভাগ রচিত হয়, তখন শাহসুজা রোসাঙ্গে আগমন করেন নাই। তাই, এই দুইস্থলে তাঁহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

সরফলমুল্লুক পাঠে আরও জানা যায় যে, মাগনঠাকুর, সৈয়দমুসা ও শ্রীমন্ত সোলেমান, ইহারা সমকালীন লোক; তবে কি না মাগন অগ্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। হইতে পারে মাগন তাঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ্য ছিলেন। আলাওল কর্ত্তৃক লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ রচিত হইবার সময় মাগন জীবিত ছিলেন কি না, বলা যায় না।

আলাওল “লোরচন্দ্রানীর” একটি কালজ্ঞাপক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মীমাংসা করা আজ আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়াই তৎসাহায্যে কোনও সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করি নাই। উহা পুস্তকসমাপ্তের কাল হওয়াই খুব সম্ভব। যাহাহউক উক্ত কবিতাটি

এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমরা তাহার মীমাংসার ভার পণ্ডিতগণের উপর অর্পণ করিতেছি।

মুসলমানি শক সংখ্যা শুন গুণিগণ।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন।।
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া অপর দুই দিকে।
শুক্রকলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে।।
মগধের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে দুর্গাঙ্কন।।
শ্রাবণের বহুদিন আশ্বিনে রুদ্রাঙ্গ।
তদন্তরে লেখি পুস্তক করিলাম সাঙ্গ।।

কাব্যের উপাখ্যানটি সংক্ষেপতঃ এই লোররাজের প্রথমা মহিষী ময়নাবতী ও দ্বিতীয়া মহিষী চন্দ্রানী। লোরচন্দ্রানীকে লইয়া শ্বশুর রাজ্যে বাস করিতে থাকেন; ছাতন নামক এক বণিকপুত্র এক বণিক পুত্র ময়নাবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসকাশে এক কুট্টনি মালিনী নিযুক্ত করেন।

মালিনী নানা অছিলায় রাণীর শৈশবধাত্রীর পদলাভ করে। লোরের কথা তুলিয়া রাণীকে রাজার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে কখনও বা হতাশ্বাস করিতেছে, কখনও বা পত্যন্তর চাই কি রাজধানীস্থিত ছাতন-কুমারকে গ্রহণ করিবার পরমর্শ দিতেছে। ময়নারাণীর প্রকৃত সতী-স্ত্রী—কিছুতেই টলেন নাই। মালিনী অগত্যা ষড়ঋতুর বর্ণনা জুড়িয়া দিল। প্রথমেই আষাঢ় মাস। দৌলতকাজী বৈশাখমাস পর্য্যন্ত লিখিয়া অমরধামে গমন করেন। ইহার পর আলাওলের লেখা। ইনি আর দুই একটা প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণান্তর লোরচন্দ্রানী ও ময়নাবতীর মিলন-সংঘটন করিয়া কাব্য সমাপ্ত করেন। বলিয়া রাখা উচিত, আলওল কাব্যখানি শেষে মুসলমানি পরিরচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন।

আলাওলের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্বন্ধে সকলেই জানেন, আমার কিছু বলাই ধৃষ্টতা। দৌলতকাজী আলাওল সাহেবের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের লোক। সুতরাং কাজীসাহেবের ও আলাওলের ভাষায় একটু আণুবীক্ষণিক পার্থক্য আছে।

ভাষাতত্ত্বান্বেষীর নিকট এই গ্রন্থ যেমন মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে, কাব্যরস-পিপাসুর নিকটও ইহা অতি উপাদেয় বিবেচিত হইবে। ইহার সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝাইবার জিনিস নহে; প্রকৃত উপভোগের সামগ্রী। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই ইহার কবিত্ব-মাধুরীর কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে ঃ

রাগিণী—দক্ষিণান্ত শ্রী (শ্রীরাগ)

প্রাণি মোর দহে দহে।
রাজার নন্দিনী কেনে রে ময়না এত দুঃখ সহে রে।

প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।।
বিরহিণী বিরহ বাড়এ অতি গাঢ়।।
মদন আসিক জিনি নীরকলা ঘন।
শিখরে নাচএ শিখী ধরিয়া পেখন।।
নব নীর পানে মত্ত চাতক চপল।
পীউ পীউ উচ্চ স্বরে ফুকারে মঙ্গল।।
কেহ নাচে কেহ গায় সারস বিহঙ্গে।
দোগে এ দম্পতী সব মদন তরঙ্গে।
আইসে পন্থিক জন বধূ প্রেম শুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী।।
নিজ গৃহ অনুসারে আইসে বণিজার।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার।।
ঘরে ঘরে নিজ কান্ত করয়ে বিলাস।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্ত পাশ।।
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী।
এ বোলিয়া ভূমে পড়ি বিলাপে মালিনী।।

রাগ—ভৈরব।

লালিনী কি করব বেদনা ওর।
লোর বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর।।
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়াএ এতাপ শরীর।।
মদন আসক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কএ যামিনী কম্পএ মোর দেহা।।
না বোল না বোল ধাত্রিও অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল।।
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ।।
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ।
ডংশিয়া পলাএ যেন এ কাল ভুজঙ্গ।।
বিরহিণী রাণী ধনী জয়পতি লেহা।
লস্কর নায়ক মনি রসগুণ গাহা।।

পাঠক দৌলতকাজীর রচনার নমুনা দেখিলেন; এখন আলাওলের রচনার কতকটা নমুনা দেখুন ঃ

সঘন গর্জ্জন করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন।।
ডাহুক দাদুরি রবে হিয়া জ্বলে বুকে।
গরল বরিখে যেন শিখিনী কুহকে।।
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হএ তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু।।
কোকিল দোরেফ নাদে কর্ণে ফুটে শলা।
বিচটীর পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমালা।।
চতস্ সম চন্দনে অন্তর ধিক জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপএ কুলালে।।
কণ্টক ফুটায়ে অঙ্গে কোমল শয্যায়।
প্রিয় বনে গৃহে মোর লাগ এ উৎপাত।।
পুষ্পের সৌরভে মোর শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীন হিত অহিত করএ।।
হিত শত্রু হইলে জীবন কিসে আর।
তাহে অনুচিত বাক্য বোলে বারে বার।।
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি।।
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গ।
নাগরিকা নারীর মনে উপজএ রঙ্গ।
ধাঞ বোলি সহম্ তোর এত দুর্ব্বচন।
অন্য হৈতে শাস্তি তোরে দিতুম তথক্ষণ।

স্থানে স্থানে কথার বাঁধুনি কিরূপ দেখুন। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই ঋতু বর্ণনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—বৈষ্ণব কবিতার গন্ধে অমোদিত।

১. মাঘের পঞ্চমী কি গুণ!
কামপুর মোর হইল শূন।।
তাতে ধাঞি কহে রঙ্গের বাণী।
হাস্য পরিহাস্য বিকল ধাই।
মুই ব্যাকুল ছাঁই (সাঞি) হারাই।

—দৌলতকাজী।

২. নবশীত ঘন, কেশ মলয় মার্জ্জন
রঞ্জিত তরল কুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কল কল কুজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে
কেতকী চম্পক কদম্ব মরবক
বকুল নকুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মালিনী মন বিভঙ্গে।। —ঐ

৩. চন্দ্রিমা চন্দন দহ যেন অঙ্গ।
বরিখে বাদর বিষের তরঙ্গ।।
মলয় সমীর অনলের তুল।।
কঠিন কণ্টক মালতীর ফুল।।

—আলাওল।

প্রবন্ধ বড়ই দীর্ঘ হইল। তথাপি বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করিতে পারিলাম না। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ শীঘ্রই এই গ্রন্থখানি বিশুদ্ধভাবে প্রচারিত করিবেন।

শ্রীহট্টের ভট্ট-কবিতা

শ্রী জগন্নাথ দেব

পুরাকালে বৈতালিকগণ রাজা, রাজপুরুষ ও ব্রাহ্মণের গুণ বর্ণনা করিতেন। সঙ্গীতাদি কলা-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ তাহাদের পক্ষে বিহিত ছিল। বৈতালিকদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; কিন্তু তাহাদের উপজীব্য বিষয়ে বিশেষ কোনও মতভেদ সৃষ্টি হয় না। "রঘুবংশে" দেখিতে পাই, বন্দিগণ "রাত্রির্গতা মতিমতাং বর মুঞ্চ শয্যাম্" ইত্যাদি স্তুতিবাদ পাঠ করিয়া মহারাজ অজের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন। বস্তুতঃ যশোগীতি ও বংশানুকীর্ত্তন-প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বন্দী বা বৈতালিকগণ পুরুষানুক্রমে নানা ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করিয়া কখনও বা রাজসভা মুখরিত করিতেন, কখনও বা বিজয়ী বীরগণের কীর্ত্তিকাহিনী গান করিয়া তাহাদের বংশধরদিগের সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, কখনও বা বর-কন্যার বংশ-বিবরণ ও গুণরাশি বর্ণনা করিয়া বিবাহের ঘটকালি করিতেন। রাজপুতনার চারণ ও বঙ্গের ভাটগণ বংশ পরম্পরাভাবে না হইলেও উপজীব্যের হিসাবে বৈতালিকদিগেরই সন্তান সন্ততি। চারণেরা প্রধানতঃ বীরগাথাই রচনা ও কীর্ত্তন করিতেন। বঙ্গীয় ভাটেরা রাজস্তুতি হইতে আরম্ভ করিয়া হরগৌরী-সংবাদ, কানু-গুণ-গান, শ্রাদ্ধবাসরে মৃত ব্যক্তির প্রশংসাবাদ, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যশোগীতিই কীর্ত্তন করিতেন। পদকল্পতরুতে দেখিতে পাই শ্রীমতী বলিতেছেন ঃ—

"পহিলে শুনিনু অপরূপ ধবনি কদম্ব কানন হইতে।
তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে।।

অন্যত্র "যাঁহার মুরলী ধ্বনি শুনি সেই বটে এই রসিক মণি।
ভাটমুখে যাঁর গুণগাথা দূতী মুখে শুনি যাঁর কথা।।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদি উপলক্ষে পাত্র পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পালরাজগণের স্তুতিব্যঞ্জক কবিতা বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচলিত হয়। এইরূপ গীতির কথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেও অনেক স্থলে এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।"

সেই ভাটদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এবং বংশ-পরম্পরায় রচিত কবিতাপুঞ্জের কথা আলোচনা করা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের সংবাদ জানি না; কিন্তু শ্রীহট্টের ভট্টগণ এখনও পূজা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি-বাসরে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করিয়া অনেকেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্রই তাহাদের

গতিবিধি দেখা যায়। বিশেষতঃ শারদীয়া পূজার প্রাক্কালেই তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সহরে মফঃস্বলে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়েন, এবং দিবা রাত্রি অভেদে ভদ্রবংশীয়দের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ-পূর্ব্বক নানা বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যাহাদের আঙ্গিনা ভগবতী দশভূজার পূজা উপলক্ষে গীত বাদ্য মুখরিত, ভাটদের তথায় অবারিতদ্বার। তাহারা পূজাস্থলে উপস্থিত হইয়া হরগৌরী-সংবাদ কীর্ত্তন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থ আদায় ও সমাদর লাভ করেন। কিন্তু অধুনা আমাদের মতি গতি ও রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাটদিগের ব্যবসায়েও ভাটা পড়িয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই এখন পেটের দায়ে কবিতা-কথা ছাড়িয়া চাকরীর উমেদারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যবসার হিসাবে ভাটের কবিতা আর অধিকদিন চলিবে না।

সুরমা-সাহিত্য-সম্মিলনীর বিগত অধিবেশনের সভাপতি পূজাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী মহাশয় তদীয় অভিভাষণে ভট্টকবিতার ক্রম-বিলোপের বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন "সেকালে বিবাহাদি ব্যাপারে ভট্টগণ কবিতা পাঠ করিতেন। কর্ত্তারা অবস্থানুসারে বিদায় পাঠাইতেন। কবিতায় কতবিধ রসভাব সমন্বিত বিষয়ের অবতারণা হইত। এখন কর্ত্তারা কবি রামকুমারের অনুকরণে বলেন 'বামুনরে দেই না কানা কড়ি, ভাটেরে দিমু কি?' তাই ভট্টগণও ক্রমশঃ কবিতার খাতাপত্র কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিয়া দ্বিজত্বের দাবী ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যবৃত্তির পথ দেখিতেছেন।" বস্তুতঃ শ্রীহট্টের ভট্টগণ ক্ষত্রিয়বৎ দ্বাদশ দিবস অশৌচ ধারণ করিলেও পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণবর্গভুক্ত বলিয়াই সমাজে সম্মানলাভ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগের সহিত একত্র ভোজন করেন, বিশ্বকোষের এই অদ্ভুত মত একেবারে অমূলক। শ্রীহট্টের প্রচুর মানসম্ভ্রম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের সহিত একত্র ভোজন করেন নাই।

সম্প্রতি কবিতাবৃত্তি অথবা শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ দ্বারা উদরপূর্ত্তি অনিশ্চিত ও অপমানজনক জ্ঞানে ভট্টমহাশয়দের অনেকে সত্যসত্যই কবিতার খাতা কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি-কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা রাজবল্লভের প্রিয়কবি ভট্টজয়চন্দ্রের 'কর্ম্মনাশা' কবিতাই শ্রীহট্টের ভট্ট-কবি রচিত শেষ গাথা নহে। স্বনামধন্য ভট্ট মকরন্দ, নবনারায়ণ ও রামমোহনের ন্যায় কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ভট্টকবি অধুনা বর্ত্তমান না থাকিলেও বানিয়াচঙ্গ, দুলালী, সাতলাও প্রভৃতি স্থানে আজও এমন অনেক ভট্ট বাস করেন, যাঁহারা বৎসরে অন্ততঃ এক দুইটী কবিতা রচনা করেন। এখনও শ্রীহট্টের অনেক ভট্ট বরিশাল প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে কবিতা আবৃতি করিতে গমন করেন এবং এই উপায়ে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া

কষ্টে-সৃষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সাহিত্য-চর্চ্চা ও ঐতিহাসিক-গবেষণা প্রভৃতির কল্যাণে সম্প্রতি আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে; সমাজের বহু প্রাচীন ও শুভকর পদ্ধতির উদ্ধার-সাধনে শিক্ষিত-সম্প্রদায় যত্নপর হইয়াছেন। মালদহের গম্ভীরা বিদ্বৎ-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; শ্রীহট্টের ভট্ট-কবিতা কি ভট্ট শরচ্চন্দ্র, রমণীমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই চিরতরে বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে?

শ্রীহট্টের ভাটদিগের রচিত কবিতা সঙ্কলিত হইলে খ্যাতনামা হরিদাসবাবুর 'গম্ভীরার' ন্যায় গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আজ পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ণী যে সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই একখানা ছোটখাট গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই আরও বহু কবিতা আমাদের হস্তগত হইবার আছে বলিয়া আমরা সম্প্রতি এই সমুদয় কবিতা প্রকাশে বিরত রহিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে নমুনাস্বরূপ ভট্ট-কবিতার কতিপয় বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত হইতেছে। কোন প্রকার নির্ব্বাচন বা বাদবিচার না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে এই সকল কবিতাংশ গৃহীত হইল; এইগুলি ভট্টকবিতার মধ্যে উৎকৃষ্ট; এরূপ যেন কেহই মনে না করেন। বানিয়াচঙ্গবাসী ভট্ট মকরন্দ রায়ের নামই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, ব্রজবুলি প্রভৃতি নানা ভাষায় বিবিধ বিষয়ে বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

> "শঙ্কর শম্ভু সদা সুখদায়ক।
> সাধক সিদ্ধি সরোবর কৈ অধিকার।।"

প্রমুখ শিবস্তোত্র ও ব্রজবুলিতে রচিত অপরাপর কবিতা কি ভাষা, কি ভাব, কি রসমাধুর্য্য, সকল বিষয়েই অতি মনোহর। একটী হিন্দী কবিতা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কবিতা সম্প্রতি আমাদের হাতের কাছে না থাকায় আমরা মকরন্দের রচনায় আর্দশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

মকরন্দের পৌত্র নবনারায়ণও একজন বিখ্যাত কবিতা-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার একটী ক্ষুদ্র কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

> "ভগবান্ এক বস্তু এক নিরঞ্জন।
> ভিন্ন ভিন্ন হইয়া করেন রস-আস্বাদন।।
> সেই রসে ফল হয় জগৎ ভরিয়া।
> কত হয় কত রয় কত যায় মরিয়া।।
> ঈশ্বর অহঙ্কারে অনন্তকোটী লোক।
> যার যেই ভাবে দেন পাপ পুণ্য ভোগ।।
> আজ্ঞ মনুষ্য দুলর্ভ জম্মে কেহ নহে কম।
> ভাব চরিত্রে বুঝা যায় উত্তম অধম।।

কেহ দয়া ধ্যান ধর্ম্ম ফলে বড় মানুষ হৈল।
কেহ কৃপণ নিকৃষ্ট ভাবে সামান্যেতে গেল।।
তার সাক্ষী দেখেন না দয়া ধর্ম্মের ফলে।
কেহ শোয়ারীর উপরে চড়ে কেহ শোয়ারীর তলে।।
কেহ হাজার লোক হুকুমে চালায় বসে একাসনে।
কেহ লাঠি চিঠি লইয়া ফিরে পেটের কারণে।।
কারো ছায়া সুখে লক্ষ লোকে চাকরি করি বাঁচে।
কেহ এক পেট পালিতে নারে কে যায় তার কাছে।।
কারো খাট পালঙ্ক দালান কোঠা গালিচার বিছানা।
কেউ ভাঙ্গা ঘরে শুয়ে থাকে গায় না তার তেনা।।
কেউ মর্‌লে কয় দেশের আপদ গেছে দূরে।।
ভাবে ছোট ভাবে বড় ভাবে সকল পাই।
ধর্ম্ম ছাড়া জীব হইলে লাভ কিছু নাই।।
নব নারায়ণ ভট্টে বলে ভাব সমাচার।
ইষ্টপদে নিষ্ঠা হইলে ভব সিন্ধু পার।।"

কৃষ্ণকালী, যোগমায়া, সীতার বিবাহ, হরিনামবলী, রাধিকার বস্ত্রহরণ, বরিশালের বর্ণনা প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট কবিতা এখনও শ্রোতৃগণকে মোহিত করে।

(৩) ভট্ট জয়চন্দ্রের নাম সৌভাগ্যক্রমে তেমন অজ্ঞাত নহে। তিনি বিখ্যাত-কীর্ত্তি রাজা রাজবল্লভের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং "কীর্ত্তিনাশা" শীর্ষক কবিতায় রাজনগর-ধ্বংসের অপূর্ব্ব বিবরণ বর্ণনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' শ্রীহট্টের এই ভট্ট-কবি বিরচিত উক্ত কবিতাটী বহুপৃষ্ঠাস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কীর্ত্তিনাশা কবিতার প্রারম্ভভাগ এইরূপ ঃ—

"লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র সুদর্শন শ্রীপতি শ্রীজনার্দ্দন।
গোলকবিহারী গোলকের হরি বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ।।
ভক্তাধীন হরি ভক্তবাঞ্ছাকারী ভক্তকে করেন উদ্ধার।
অসংখ্য মহিমা বেদে নাহি সীমা জীবের বুঝা সাধ্য তার।।
ভবে বাস তরে একস্থান পরে সৃজন করিলা হরি।
সোণার রাজনগর সৃজিলা শ্রীধর সুখ বাঞ্ছা মনে করি।।"

কবি রামমোহনও শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, নরমেধযজ্ঞ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বংশীসংবাদ, দ্রারিদ্র্য ভঞ্জন প্রভৃতি রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

তাঁহার নরমেধযজ্ঞ নামক সুদীর্ঘ কবিতার শেষ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা হইতে সাহিত্যরসজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন, রামমোহন কিরূপ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেখ মুনি সুত পুলকিত রাজার অন্তরে।
দিব্য পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইলা শিশুরে।।
জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড প্রচণ্ড প্রবল অতিশয়।
যেমন গগনমণ্ডলে শিখা ভেদে মনে লয়;
রাজা আজ্ঞা দিলেন যজ্ঞানলে করিতে আহুতি।
কাঁদিয়ে কৃষ্ণভক্ত কুশধ্বজ করে কৃষ্ণস্তুতি।।
এমন বিপদকালে কোথা রইলে শ্রীমধুসূদন।
আমার প্রাণ গেলে কি হবে তোমার এথায় আগমন।।
প্রাণ যাবার কালে না আসিলে পতিতপাবন।
তোমার পতিতপাবন নামে কেমন হবে নারায়ণ।।
যাহার মাতা পিতা সোদর ভ্রাতা হইলেন নিকরুণ।
আমার সময় দেখে হইলে নাকি নিদয়া নির্গুণ।।
কৃষ্ণ নিদানকালে দেখা দিলে বিপদ আসে না।
এমন নিষ্কলঙ্ক নামে রবে কলঙ্ক ঘোষণা।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ঝাঁপ দিয়া জ্বলন্ত অনলে।
এসে ভক্তাধীন ভগবান নিলেন কোলে।।
হইল যজ্ঞানল যেন চন্দন সমান।
অতি বিপদেতে ভক্ত রক্ষা কৈলা ভগবান।।

রামমোহনের ঃ "বন্দে শিবং ত্রিভুবননাথং ভৈরবনাথং লোকোপবীতং
ত্রিশূলধরং গলে অস্থিক মালং।
(গলে অস্থিক মালং)"

ইত্যাদি শিবস্তোত্র যখন ভট্টগণ শিখা-আস্ফালনপূর্ব্বক অকস্মাৎ পূজামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া একযোগে তেজবাঞ্জক স্বরে গায়িয়া উঠেন, তখন বাস্তবিকই মূর্ত্তিমান ভয়ঙ্কর-রসের আবির্ভাব হয়। ভাটের কবিতা কাগজে যেরূপ দেখায়, ভাটদের মুখে গীত হইতে শুনিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ মনোহর বোধ হয়। এই কবিতার পরবর্ত্তী পঙ্ক্তির প্রথম চরণ পূর্ব্ব পংক্তির আবৃত্তির পরে সংযোজকস্বরূপ একবার উচ্চারণ করিবার রীতি আছে; তাহাতে মধ্যে আর বিচ্ছেদ হয় না এবং শুনিতে মিষ্ট লাগে।

দেখে মুনিসুত। দেখে মুনিসুত পুলকিত রাজর অন্তরে। দিব্য...শিশুরে"
জ্বলে যজ্ঞ কুণ্ড। জ্বলে যজ্ঞ কুণ্ড প্রচণ্ড প্রবল অতিশয়। কেমন...মনেলয়"

রাজা আজ্ঞা দিলা। রাজা আজ্ঞা দিলা যজ্ঞানলে করিতে আহুতি।
কাদিয়ে...কৃষ্ণস্তুতি"

এই রচনার অনুকরণে শ্রীহট্টের মুসলমানগণও আরবী, ফারশী, উর্দ্দু শব্দবহুল বাঙ্গালায় ছড়া রচনা করিয়া থাকেন। নিম্নে ভূমিকম্প বিষয়ক একটি মুসমানিক ছড়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

সন (১৩০০) তের শত ২ (৪) চারি বাঙ্গলা ৩০শা জৈষ্ঠীতে।
শনিবারী দিন সময় পাঁচ ঘটিকাতে।।
এক কালনী কৈল ২, হাওয়া আইল বৃষ্টি সহিতে।
আচানক জমিনেতে লাগিল কম্পিতে।।
আইল ভৈচাল ২, সেই কাল এতিন ভুবনে।
বাঙ্গলা ভাষায় ভূমিকম্প কহে সর্ব্বজনে।।
বলে আল্লা ২, সেই বেলা যত মছলমান।
হিন্দু বলে রাধে কৃষ্ণ, করহে তরান।।
কার সাধ্যে নয় ২, খাড়া রয় জমিনের মাঝার।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে খলক আল্লার।।
সবে হায় হায় ২, করে তায় একি আচম্বিত।
কোন কালে না দেখিয়াছি এত বিপরীত।।
সব জমি কাটি ২, উঠে মাটী বালুকার মত।
ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল শত শত।।
যারার দালান ছিল ২, ভাঙ্গিয়া পড়িল না রহিল আর
আশ্চর্য্য করে খানা হইল সহরের মাঝারে।।

এইরূপ ছড়া কবিতা কিংবা উপকথা এতদঞ্চলে লোক-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সিলেট-নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত শত শত পুস্তক শ্রীহট্ট, ইস্‌লামিয়া প্রেস ও কলিকাতার কোন কোন স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিমাল্লা, মহাজন, দোকানদার, কৃষক, কারিগর বহু মুসলমানের নিত্যপাঠ্যে পরিণত হইয়াছে। এই লোক-সাহিত্যের উপর ভাটদিগের প্রভাব স্পষ্টতই অনুভূত হয়।

আর অধিক কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিতে চাই না। নিম্নে ইংরাজ-রাজত্বের সুখ-সুবিধা বিষয়ে একটি কবিতার কিয়দংশ সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত করিয়াই আমরা নিরস্ত হইতেছি।

২ চিহ্ন দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে পূর্ব্বপংক্তি আবৃত্তির পর এই অংশ একবার উচ্চারণ করিতে হইবে, এবং পরে আবার সম্পূর্ণ পংক্তি উচ্চারিত হইবে।

নমস্তে ঈশানি ঈশান ঘরণি ঈশ্বরি অসুর নাশিনি
সাবিত্রি গায়ত্রি গঙ্গে জগদ্ধাত্রি দক্ষপুত্রি দাক্ষায়ণি।।
ত্যজিয়া কৈলাস পদে কৃত্তিবাস বাস করে শব বেশে।
নামের মহিমা না পাইয়া সীমা শিব শ্মশানবাসী শেষে।।
সর্ব্বস্বরূপিনি কমলকামিনি ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি।
শ্রীমন্ত বিপদে তোমারি প্রসাদে ত্রাণ পাইল গো শঙ্করি।।
শঙ্কটে যে জন করয়ে সেবন শরণাগতে তার তুমি ।
দুঃখ সুখ ফল তোমারি সকল তদন্তে জানিয়েছি আমি।।
কেহকে কর ক্ষীণ কেহকে কর প্রবীণ তুমি লীলা ছলে।
বাদশাহী আমল করি বেদখল ইংরাজকে রাজত্ব দিলে।
শাসিতে ধরণী কলিতে এখনি মহারাণী মহেশ্বরী।
হুকুমেতে তাঁর (কাজ) করেন ইংরাজ হুর্গরে নাশেন অরি।।
কলিকাতা সহর শ্রীযুত লাট গভর্ণর লাট মেম সাহেবগণ।
বাঙ্গলা মুলুকেতে যাহার হুকুমেতে জিল্যে মহকুমে স্থান।।
পূর্ব্বদেশ পরে সুমেরু শিখরে শ্রীকরে* শ্রীহট্ট জিলে।
ইংরাজ বাহাদুর ভুবন মাসুর সুবর্ণা (?) শোভানীলে।।
যে স্থলে ইংরাজ করয়ে বিরাজ বিচার বিজয়ী গুণে।
কিবা ঠাট পাট শানবান্ধা ঘাট বান্দিয়াছে স্থানে স্থানে।।
আদ্য সর কিল্যা করিয়াছে জিল্যা সারজন সিপাহী বেড়ী।
জজ কালেক্টরী আদালত ফৌজদারী কাজি আদলত আর।
হরেক বিচার কানুনানুসার (সাবাস হেকমত ইংরাজ তোমার)।

উদ্ধৃতাংশগুলি হইতেই ভট্ট কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য শিক্ষিত-সংপ্রদায়ের নিকট প্রতিভাত হইবে। ভাটেরা যে কেবল পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনেই গাথা রচনা করিতেন, এরূপ নহে; তাঁহারা সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং স্থানীয় বহুবিধ অতীত ঘটনার নিখুঁত ছবি, বর্ণনার অক্ষয় তুলিতে জীবন্তভাবে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। জয়দেব-চরিত্র, ব্রহ্ম নিরুপণ মহাভারত পূর্ণা, থাকরন্তের জরিপ, নবীন এলোকেশী, ভাওয়াল, ভূমিকম্প, কঙ্গরেস, বঙ্গবিভাগ, মণিপুর যুদ্ধ প্রভৃতি গাথার নাম হইতেই প্রতীয়মান হইবে শ্রীহট্টের ভট্টকবিগণ কত বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় অনাচার, কুরীতি কদভ্যাস তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তির দারুণ কষাঘাতে

* শ্রীকরে—দক্ষিণ হস্তে। দেবীর দক্ষিণহস্তে শ্রীহট্ট পতিত হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

সংশোধন করিতেও ভট্টগণ কুণ্ঠিত হইতেন না। অধুনা সংবাদপত্রের দীর্ঘ সমালোচনা এবং দলাদলি, বাদবিসংবাদ দ্বারাও যে সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার হয় না, কিছুদিন পূর্ব্বে ভাটের ছড়ার দংশন-জ্বালায় অধীর হইয়া তাঁহারা অল্পেতেই অবহিত হইতেন। লোকশিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এইরূপ গাথা-সাহিত্য এদেশ হইতে তিরোহিত হইলে আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ভট্টদের আর একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইঁহরা উপস্থিতভাবে যে কোন বিষয়েই চলনসহি কবিতা রচনা করিতে পারেন। স্থলবিশেষে তাহা চাটুকারিতা অথবা শুদ্ধ পুষ্পিত বাক্যে পর্য্যবসিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে রচয়িতাদের যে স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ শত শত ভট্ট-কবি শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতিবৃদত্ত রচনা শক্তিপ্রভাবে স্ব স্ব পল্লী প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য তাহাদের কোন সংবাদ রাখে না। শ্রীহট্টের সংখ্যাতীত বন-লতিকার ন্যায় তাহাদের কবি-প্রতিভা নিরলে ফুটিয়া নিরলেই শোভা বিস্তার করিয়া শুকাইয়া যায়। সেই স্বাভাবিক সুষমার প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পতিত হইলে শ্রীহট্টবাসী গৌরবান্বিত হইবেন। পরিশেষে ভট্ট কবি বিশ্বনাথের ভাষায় বিভূতিভূষণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করির্তেছি। তাঁহার আশীর্ব্বাদ শ্রীহট্টের ভট্ট-কবিতা সঞ্জীবিতা ও জয়যুক্তা হউন।

প্রণমামি সদাশিব নম বিশ্বনাথ।
শ্রবণে ধুতুরা পুষ্প ভূত প্রেত নাথ।।
অভরণ ফণী, গলে হাড় মালা।
কটিতট মাঝে শোভে বাঘ ছালা।।
শোভে ভালে শশী শিরে মন্দাকিনী।
হলাহল কণ্ঠে বামেতে ভবানী।।
আরোহণ বৃষে বিভূতি ভূষণ।
বম্ বম্ শিঙ্গা পুরেত বদন।।

আমাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষার সাক্ষ্য

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

আজকাল একটা নূতন মত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী এতদিন আর্য্য বলিয়া গৌরব করিত; বাঙ্গালা ভাষা দেবভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিত; কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী আর্য্য নহে, Drarids-mongoloids. আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন* বাঙ্গালা ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান আছে। আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে যে সকল দ্রবীড় জাতীয়েরা বাস করিত, তাহাদেরই মাতৃভাষা বাঙ্গালা।

বাঙ্গালীর ভাষা কি সত্যসত্যই সংস্কৃতের ছাঁচে পরিবর্ত্তিত, আদিম দ্রবিড়ী ভাষার ক্রমবিকাশ? ইংরেজীভাষা যেরূপ অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দরাজি চয়নপূর্ব্বক আপন পুষ্টিসাধন করিলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট নিজ Saxon প্রভৃতি ধরা দেয়, বাঙ্গালাভাষাও কি তদ্রূপ নিজ দ্রবীড় প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালীর অনার্য্য উৎপত্তি ঘোষণা করিতেছে?

জাতিবিশেষের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিতে শারীরিক-গঠনের পরিমাপ, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, কিংবদন্তী এবং নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার সাক্ষ্য, প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শারীরিক গঠনের পরিমাপ হইতে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা বৃথা—এ শাস্ত্র এখনও শৈশবে। আর জাতীয়বিধি, ব্যবস্থা, কিংবদন্তীও এই জটীল প্রশ্ন-সমাধানে পর্য্যাপ্ত নহে;—এ সমুদয়ই নব নব ধর্ম্মমতের অভ্যুত্থানে এবং সুসভ্য জাতির সংঘর্ষে, মিশ্রণ ও অনুকরণপ্রাবল্যে, আবহমানকাল হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সমাজের নিম্নস্তরের কথ্যভাষা এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে বহুল পরিমাণে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনায় কথ্যভাষার সাক্ষ্য অতীব মূল্যবান।

আধুনিককালে বঙ্গের উন্নত জনপদসমূহে প্রায় সর্ব্বত্র কথ্যভাষার বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং নব নব রাজশক্তি ও ধর্ম্মমতের অভ্যুত্থানফলে বিজিত জনসাধারণের সামাজিক অবস্থা এবং ভাষায় তদ্রূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক এই সকল পরিবর্ত্তন এবং ভাষা-বৈচিত্র্যের মধ্যেও বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তে অশিক্ষিত জনসাধারণের কথ্যভাষা বহুল পরিমাণে আপন আদিমভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা বঙ্গ-সীমান্তে অবস্থিত সুরমা উপত্যকার কথ্যভাষার সাহায্যে আমাদের উৎপত্তি নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইব।

সুরমা উপত্যকায় সমাজের উচ্চ স্তর মুষ্টিমেয়, অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে উপনিবিষ্ট; আর এই উচ্চশ্রেণী সততই সমাজের নিম্নস্তর হইতে কঠোরভাবে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষণে বদ্ধপরিকর। ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতেছেন যে, প্রাচীনকালে এই স্থানে বড়ো নামে অভিহিত মঙ্গোলীয় জাতিবিশেষের একটী বিশাল রাজ্য দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এমতাঅবস্থায় নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষায় উচ্চশ্রেণীর প্রভাব যৎসামান্য হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক।

এক্ষণে সুরমা উপত্যকার অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রতিনিয়ত যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, তন্মধ্যে কয়েকটি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। শব্দগুলি প্রধানতঃ দেশজ ও সংস্কৃতমূলক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শব্দগুলির অধিকাংশই সংস্কৃতমূলক। পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত ক্রিয়া কারক বিভক্তি গঠনপ্রণালী এবং উচ্চারণ পদ্ধতি হইতেও তদ্রূপ সংস্কৃতের প্রভাব প্রবলভাবে বিরাজমান দেখিয়া, আপনারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন। সংস্কৃতের এই প্রবল বন্যা কোথা হইতে এবং কখন আসিয়া এই সুদূর জনপদ প্লাবিত করিল, চিন্তনীয় সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রদত্ত তালিকায় খাঁটী দেশজ শব্দগুলি পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে জনসাধারণের কথ্যভাষার মধ্যে এখনও নিত্য ব্যবহৃত হয়। অনুসন্ধান করিলে সুদূর পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায়ও ইহাদিগকে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। দুই একটি উদাহরণ হইতেই এই উক্তির সারবত্তা পরিস্ফুট হইবে। অনুন্নত সুরমা-উপত্যকার নিম্নশ্রেণী বলে—"এই পোনে যাও" (এই দিকে যাও),

"তুইন হেঙ্গল" (তুই কুকুর)

কিংবা—"চাল উঠি ফুক্কা করিল্ চালে, চালে উঠিয়া ছিদ্র করিল।" কিন্তু আপনারা বলেন—"আমার পানে চাও", লোকটা ভারি হেঙ্গলা" কিংবা "এই ফাকে আসি।" শব্দ এক; কিছু পার্থক্য উচ্চারণঘটিত এবং শব্দের আকৃতিগত। সংস্কৃতমূলক শব্দসম্বন্ধেও সেই কথা; অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত ভাষার স্রোত অলক্ষিতভাবে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রবাহিত।

সংগৃহীত দেশজ শব্দের তালিকা জনৈক দ্রবীড়-জাতীয় অভিজ্ঞ বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি এই তালিকায় কোনও দ্রবীড় উপাদান প্রাপ্ত হন নাই। অতঃপর এই তালিকা পূর্ব্ববঙ্গের মঙ্গোলীয়া প্রতিবেশীবর্গের—অর্থাৎ তিপরা, গারো কাছাড়ীগণের ভাষায় অভিজ্ঞ কতিপয় বন্ধুর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারাও আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। এক্ষণে শব্দগুলি আপনাদের বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি।

আলোচনা-সৌকার্য্যার্থ নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষা অবিকল যৎকিঞ্চিৎ এই উপলক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতেও আমরা কোনও দ্রবীড়ী, মোঙ্গলীয় উপাদান লাভে অসমর্থ হইয়াছি।

যে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর কথ্যভাষায় দ্রবীড় অথবা মঙ্গোলীয় উপাদান, শতভাগের শতাংশও লওয়া যাইবে কি না সন্দেহস্থল, তাহাদিগকে কি এখনও Drarids Mongoloids রূপে অভিহিত করিতে হইবে? আর পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তভাগে সুরমা-উপত্যকায় বিশাল কেডেল রাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে?

আমরা সুত্ হই, সুতপুত্র হই, যাহাই হই না কেন, ভাষার সাক্ষ্য অনুসারে আমরা না দ্রবীড় না মঙ্গোলীয়; কিন্তু আমাদের ভাষার অস্থিমজ্জায় যে আর্য্যধারা প্রবাহিত, এ কথা কে এখনও অস্বীকার করিবে?

দেশজ শব্দ

আউলা—"আউলা পুতার টানারে আর টানাইমু কতদিন।" "আউলা আউলা কথা।" "আউলা ঝাউলা করিও না।"

আওর—ঘরর্ আওরে (অন্তরালে)। জলের আওর (স্রোতের বিপরীত দিকে জল চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়া)।

আওয়া—"আওয়া (নূতন) পাতিল"। "একগুটা আওয়া সরা" "আওয়া দুধ" (জ্বাল না দেওয়া)।

আউয়া—"আউয়া চাণ্ডাল ভকা ডুম্ (মূর্খ) হাঙ্গে রাইতে একই ঘুম।"

আখাল—(উনন্)।

আচম্বিৎ—"আচম্বিৎ হইলাম", আচম্বিতের কথা" (আশ্চর্য্য)

আট্‌খুরা—"আচুক্যা (আশ্চর্য্যজনক) কথা"। ঝি আট্‌খুরা"।

আলঙ্গ—বস্ত্রাদি রাখিবার ছোট বাঁশের মাচান। ব্যাপার উপলক্ষে বসিবার জন্য বাঁশের সাহায্যে চাটাই দ্বারা ছানিযুক্ত মাচান।

আঙ্গর্‌খা—জামাবিশেষ।

ইয়ারা—এ যাত্রা।

ইকড়—বেড়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইতাল—এইগুলি।

উগার, উগাল—উগারি (উগালি) পালাও (উৎপাটিত কর); উগারের (উগালের) ধান (গৃহের মাচান) দুই তিন হাত উচ্চ মাচান—উগইর (উপাড়িয়া ফেলা)

উড়া—ছন উড়া (পতিত-ভূমি); চূণ উড়া পান (মাখান)।

ঊড়া বাঁশ—ঘুণে খাওয়া।

উবে—(উচ্চে) তিন হাত; "উবাইয়া বুর দিমু" (দাঁড়াইয়া ডুব দিব)

উরি—উরির বেনুন (শিম); উরিকুদাল—(ঝুড়ি)।

উঝা—(শিক্ষক, মন্ত্রবিৎ) সাপের উঝা; "ক্ষুদ্র নাগে দংশে যারে বহুৎ জিয়োও তারে। তুমার নাম উঝা ধনন্তরী)।"

এচু—(মৎস্য ধরিবার যন্ত্র)। এচু খলই (যন্ত্র ও পাত্র)।

এবতরি—(এখন পর্য্যন্ত)। "এবতরি আইল না-।"

এলুকু—(এখন)।

কুন্‌তা—(কিছু) খাইবার কুন্‌তা দেও।

কুক্‌রা—(Cock)

করুয়া—(curry) মাছের করুয়া (ঝোল থাকে না)

করে—করে করে আও (পশ্চাতে);

"করলাম রে বা কর্‌লাম" (ভীড়ের সময় ব্যবহৃত হয়)।

কাক্‌না—(ঝিনুক)।

কান্‌লা—(ফলিমাছ)।

কুলা—ধান ঝাড়িবার যন্ত্র।

কুল্যে—(কেবল) কুল্যে এক্‌টাকা।

কেচুলাটি—"জীরর মাটী" (কেঁচোর মাটী)।

কাল—কাল্‌ হইছনি (বধির); ভাত কাল্‌ হইছে (ঠাণ্ডা)।

কাড়া—"নাওয়ের ঝাড়া"।

কুরা—বড়ির কুরা (ছিপ); ধানের কুরা (চূর্ণ) কুরশিকার যাইতা (পক্ষীবিশেষ)।

কুপি—"কেরেছর কুপি" (বাতি)।

কুবাই—"কুবাই যাইতাম?" (কোথায়)।

খান্‌কা কথা— (অযথা)।

খুটি—"খুঁটি খায়" (Picking)। "খুটা দিল্‌"; বরুয়ার খুটা"।

খর—(টক্‌, অম্বল)।

খরা—অত্যধিক রৌদ্রতাপ ও অনাবৃষ্টি। "খরালি কাউয়া"

খলই—মৎস রাখিবার বাঁশের পাত্র।

খঙ্গিয়া—ক্রোধপরায়ণ।

খাটাল্‌—রন্ধনশালায় স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান।

খুরণ—"ছোট মাই খুরণ তুমি কুর লও মরে"।

খুপা—"বান্ধিল মোহন খোপা"। "পঞ্চ পাক্‌ দিয়া খুপা বান্ধিল সুন্দর"।

খইয়া—খইয়া (খসিয়া); খইয়া—ধান, মাছ, জাল। কাপড় খইছে।

খাইয়া—খাইয়া পান। (খাসিয়া)

খারি—"গাঙ্গের খারি" (শাখা); "গাছের খারি" (খণ্ড); খারি বিচইন্, কুলের খারি, পানের খারি (পাত্র)।

খুলি—(মৃদঙ্গ) খুল বাজায়; কুলার খুল (খোল)।

খুলি—"লবণর খুলি" (ঝরণা); মাথার খুলি।

খুয়া—খুয়া পইরছে (কুজ্ঝটিকা) খুয়ান গিছে (হারাণ)

গচা—"গচা খাইয়া ভাট্টা হইছইন্" (কাটা)।

গলই—নৌকার অগ্রভাগ।

গমাও—ঘর লেপন কর

গাইল—"গাইল পাইর্ছে" "গাইল্দি ধানভানে"।

ঘুঙ্গি—"ঘুঙ্গিলো সই"।

চরাট্—নৌকাতে বসিবার জন্য।

চাঙ্গি—গৃহের মাচান।

চাপ—(পলর)।

চুঙ্গা—বাঁশের

ছিকর—সিক্রীমাটী, পাপ্ড়ি খোলা, চারা (সন্তান-সম্ভাবনার সময় খাদ্যবিশেষ।)

চই— (সিম)

চর— "হাড়িয়ার চর" (পুচ্ছ) "সিলচর" (নদীগর্ভে পাথরের চড়া)

চাই—"মাছর চাই" (মাছ ধরিবার যন্ত্র); "হাতের চাই" (কীটবিশেষ)।

চাও—"কিতা চাও" (প্রার্থনা কর); "চাওরে বা" (দেখ)

চারা—"নাওয়ের চারা" (তলভাগ); "গাছের চারা" "পাতিলের চারা"; "চারা বিচ্‌রা"

ছিরা—"ছিবা কাপড়" (ছিন্ন)।

চাইল—চালনী; মাটির ঢিলা।

ছেবাইন—থুথু ফেলেন।

ছলা—একছলা টেকা; তানে ছলাইওনা (ক্ষেপাইওনা;) ছলা কাক্।

ছুবা—"বীন্যা ছুবা"; "নাইরকলর ছুবা।"

ছেদা—ছেদার (সজারু) গচা।

ছেঙ্গ—ছোট গচা (সাধারণতঃ বাঁশের), "হাত ছেঙ্গ কুট্ছি"

ছেম্‌ট—টেকাগুইন্ ছেম্‌টিলাও (স্তূপীকৃত করা)।

ছেম্‌লা—বারান্দা।

ছিঙ্গ্‌লা—বাশের কঞ্চি।

জির—কেঁচো; "জারজির"।

জামির—লেবু।
জিরা—(বিশ্রাম করা) "কিছু জিরাইয়া লও।"
ঝুরি—অপরিষ্কৃত অবস্থায় লাক্ষ্যা।
ঝেঙ্গ—ঝাল্; (বদ্‌মেজাজ)
ঝেলা—"ঝেলাগুরই অত বিক্রম্" (কোপন স্বভাব স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে)।
ঝাপ্—দরজার ঝাপ্
ঝাপি—"গুয়াপানের ঝাপি"।
টেক্—"গাঙ্গর টেক্ ও মূড়াদি যাও"। "শিয়াল টেক"।
টেকর—"তুমার কপালে এক টেকর্ দিমু"।
টিকর—(টীলা ভূমি) "গুটা টিকর"।
টেঙ্গা—(চুকা)।
টুমা—টুক্‌রা; "একটুমা গুয়া দেও।"
টান—কথায় জোর দেওয়া; শুষ্ক চড়া। "টান্‌দি মাতে; টান্ জমিন; বাজার টান; টান করি ধর"।
টেঙ্গরা—পার্ব্বত্য ধরণের ভূমি; সদাচারবহির্ভূত; মৎসবিশেষ।
ঠেঙ্গ—"বগার ঠেঙ্গ।"
ঠেঙ্গা—"ঠেঙ্গা লাঠির বাড়ী।"
ডর—ডরাইওনা (ভয়) ড'র (ডহ্‌র)।
ডুগা—ডাঁটা, ডুগীকরুয়া
ডেইয়া—"উছিৎ রইছে—ডেইয়া যাও।"
ডুবা—"ডুবালা কইয়ে উড়্ উড় বরে"; "আমি ড়ুবানাও বাইয়াব"।
ডেকা—"চেকা নাই বাগ্ চিনে না"।
ডাট্—"ডাট্ ডাট্ মাত কেনেরে বা?"
ঢেক্—"কলার ঢেক্"
ঢেপ্—হাপলার ঢেপ্।"
তাড়—"হাতে দিমু তাড় বাউ কানে দিমু সুণা" "তাড় গাড়ু দিলা গায় গায়।"
থুবাও—"হৌর গুণ থুবাইয়া লাও।"
দরঙ্গি—গৃহস্থ বাড়ীতে আহারাদির জন্য ঘরের বড় বারান্দা থাকে—উক্ত বারান্দার সামনের বেড়া।
দামা—"হালর দামা"।
দরম্—"দরম্ গাই ডাবি গেছিল্ (দল্ দল্ জমি)।"
মেনি—"যদি থাকে মেনি রক্ষা করব্ কানি"।

মুনি—(বেটা ছেলে) "ঝেলা শুচাঁদ যেমন, মুনি গুমরা"।

ধাক্কা—তাইরে ধাক্কা মারি বাড়ীর বার কর"।

ধুচইন্—বাঁশের পাত্র, দ্রব্যাদি ধৌত করিতে ব্যবহৃত।

নেত্—"নেতের পতাকা উড়ে ঘরে ঘর"; (তেনা)।

পর্—গাই প'র হইছে। রাইত প'র হইছে। (প্রসব, প্রভাত) "পূর্ব্বে বন্দিয়া গাম পূর্ব্বদিন করে যেই ভানু উদয় হইলে জগত পশর।"

পশার্—"পশারির দুকান"

পাইল্—"আমার পাইল্" (প্রতি); "হাপলার পাইল্" (ডাটা)

পাক্—"এক পাক্দি আও" সাতপাক্"

পাখাল্—পাখাল্ কুত্তা হামাইছে।"

পার্—ধান পার্ দেও।"

পারা—"ধানের পারা (স্তূপ) "এক পারা মানুষ," "দাস পারা" (পাড়া) (পল্লী) পাড়ে পারা।

পালা—"গাছপালা," "ঘরপালা" "এক পালা গান"।

পুতা—"পাটা পুতা;" "পুতা খুদিয়া পালি খাইতাম" (ভিত্তি)।

পাজন—"পাজনের বাড়ী" (লাঠির আঘাত)

পারস—"খাউরা হক্কল্ আইন পারস্ হইছে।"

পিড়িলা—পাখীবিশেষ।

পুতাইল—"পাটা পুতাইলে ছেচিলেও।"

পুরা—একপুরা ধান।

ফট্—হাপর ফট্ (ফনা); ফট্ খেইড় (জলক্রীড়া বিশেষ)।

ফাপর—"কান্দিয়া ফাপর হইল।"

ফাফ্রি—ফাফ্রি বয়ার (দমকা বাতাস)।

রুয়া—"ভাঙ্গা ঘরের রুয়া"।

লগ্যি—log।

বয়ার—বয়ারে (মহিষে) ঘা খাইন্ নি?

বাড়ী—"একই গদার বাড়িয়ে মুড়ি কাটি লইমু"।

বোচা—যে গরুর শিং নাই।

বাদ্—তার বাদে (তৎপর)।

বুর—"উবাইয়া বুর্ দিমু নুইয়া বুর্ দিমু না।"

বারছা—(ছিয়া)।

বন্ধ—মাঠ্ "বন্ধ গেছে"।

ভুবি—(লটকা)।
ভুট্—"চিতলের ভুট্" (কোল)।
ভাও—"মাছ কি ভাও আন্লায়"।
ভুতু—"ভুতু হেঙ্গল" (পাগলা কুকুর)
মারা—"ধান্ মারা দিছনি?"
মুকুর—"মুকুরাদি দেখিলাইছি" (উকি দিয়া)।
মেকুর—বিড়াল।
মেড়া—যে ভাত সুসিদ্ধ হয় নাই।
বক্রী—লাউ (মিষ্ট কুমড়া); আম (পেয়ারা) কলা।
সাদ্—"থুরা সাদ্ দেও" (সাহায্য করা)।
হাকম্—(বাঁশের সেতু)।
হাই—তর্ হাই নি। (স্বামী); "হাই য়ে ডিম্-দিছে নি?"
হেয়ত—জলসেচনের যন্ত্র।
হুঙ্গু—নাকে নাকে ঘর্ষণ পূর্ব্বক আদর করা—শিরোঘ্রাণ নহে। "কটুবইস্ গো আও হুঙ্গু দেই"।
হুরইন্—হুরইন দি মারমু তর কপাল।
হিঙ্গা—চুল শুষ্ক করিবার জন্য ঝারিয়া দেওয়া।
হেঙ্গা—"উল হেঙ্গা ফুল হেঙ্গা, তিন জাইত" (বিধবা বিবাহ)।
হেড়েঙ্গা—চুল শুষ্ক করিবার জন্য গামছা দিয়া ঝাড়িয়া দেওয়া।
হেঙ্গল্—"আমি হেঙ্গল নিবা" (কুকুর)।
হাঙ্গে—হাঙ্গে (সকল), "হাঙ্গে গাউয়ে আপ্নার নাম হুনি আইয়ার"।

সংস্কৃতমূলক শব্দ

আইল্—(আসিল)।
আইল্—(আলি) খেতর্ আইল্।
আই—(আ-গম্; আয়স্তি) "আইরে বাং"; জগতে আই"।
আইঠা—উচ্ছিষ্ঠ।
হাওর—(সায়র সাগর), "রাজার মল্লুক হাওরে খাইতেছে"।
আলিয়া—(অলস; অলস ব্যক্তির ব্যবহৃত অগ্নিপূর্ণ মৃৎপাত্র) "আলিয়ার আগুইণ"।
আৎকা—(অকস্মাৎ)-"আৎকা ঔ কথা হুনলাম্"।
আচানক্—(অসেচনক) আচানক ব্যাপার।

উর—(উরস্, উরু) "তাইরে উর লও"।

উম্—(উষ্ণ)।

উড়া—(উৎ-ডী) "উড়াল পক্ষী উড়ে যেন বিপুলার নৃত্য তেন।"

কৌক—(কঙ্কতিকা) "আবের কাঁকে য়ে কল্যায় বেস করে সীতি।"

কুক্‌রা—(কুক্কুট)।

কুব্‌ল—(কবল)।

কইলা—(কলসী কথ্; কহ্) "কৈলার হুকইন; বিয়া কইলা; তাইন ঔতা কইলা।"

কইত—(কুতঃ; কথ্, কহ্) কৈ'ত আইলায়; কথা কইত আছিল।

করে—(কৃ) হি কাম করের।

কাঠি—(কাষ্ঠ) "পগ্ কাঠি পুথি মালা ঝিলি মিলি কাচ", "গলার কাঠি; চাউলের কাঠি।"

কুর—(ক্রোড়, কুষ্ঠ) "তাইরে কুর লও," "তর কুর হইছে নি?"

কুপি—(কুল্) "তান বায় কুপিয়া উঠিল; কুপিয়া অইল।"

কাইত—(কুপ্) "কাইত হইয়া শোও"।

কাকাইল—কক্ষতল।

কালিয়ানা—গুরিয়ানা-(কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণের)।

খিরান্—(ক্ষীর) "গাই গু খিরাইছ নি?"

খুরল—(কোটর) "আপখুরা"

খুর—(ক্ষুর)

খইয়া—(স্খল)

খুয়া—(ক্ষুদ) "এগু টাকা খুয়া গেল্ গি" (হারান)

খুরা—(খুল্লতাত, কর্পর) "তাইন আমার খুরা লাগইন্।" "আপ্‌খুরা।"

খাই—(খাত) "গড়খাই"।

গতর—(গা) "গতরের বিষ"।

গাও—(গাত্র) "তা'ইন হা গাউৎ গেছইন" "গাও তুল পতা হইয়াছে"।

গুইন্—(গুলি)।

গুন্ (গুণ সূত্র; গুণয়তি)" "গুণর নাও"; গুণ কইরছে"।

গুড়া—(গৃ) "নাউয়ের গুড়া"; "গুড়া করি লাও"।

গুচলা—গোশালা; বর্ষকালে গরুকে ঘাস দিবার ঘর।

গমাও—গোময় লেপন করা।

গলিভাই—বন্ধ বিশেষ

চই—(চষ) "হাল চই", "চই পিঠা"

চাও—(চি) "কিতা চিওরে বা"।
চিরা—(চিপিটক); (ছিন্ন) দই চিরা "অচিরে করিলাও"।
চুরা—(চৌর, চূর্ণ) "হাং চুরায় কারমিশ কইল্যা"; "ভাইঙ্গা কৈল চুর"।
চিক্—ঝিকি মিকি করা, চিক্ চিক্ করে।
ছলবাকল—"ছাল নাই কুত্তা"।
ছেদ—(ছিদ) "এক ছেদে কাটিলাও"।
ছাওয়াল—(শাবক) "বুড়া কুল কুলা জামাই ঝিখিনি ছাওয়াল"।
ছেম্‌ট—সঙ্কলন।
জুই—দ্যুতিম্।
জুকার—জয়কার।
জেঠা—জ্যেষ্ঠ।
জিতো—(জিৎ; যৎ) "জিতা আইমু; জিতামাছ, জিতা কইছলায় আন্‌ছি।"
জুড়ান—(জুঠ)।
ঝাট—(ঝচিতি) "ঝাটে যাও"
ডাইন—(দক্ষিণ, ডাকিনী) "দাদিনা বাইছার যারজির ডাইনে"। তাইররে ডাইনে
ধইরছে"
ডাট—(দণ্ড) শক্ত।
ঢুপী—(dove)।
ডর—(ডহর; ভয়) "আমার ডর করে"।
দুয়াড়—(দ্বি-হার) "দুয়াড়া করি লাও।"
ফাড—পার্শ্ব, প্রস্থ।
ফুক্কা—ফুক্কা।
বান্ধাইল—বান্ধ "বান্ধাইল ঘাট" "বান্ধাইল খুড়া"।
বৌন্দ—বন্ধু; "জল ভরিয়া গৃহে আইলাম এখন বৌন্দে কই।"
বইন—ভগিনী, বস; "রামর বইন," "অতি বইন্"
বইনারী—ভগিনী—"তাইর লাগে বইনারী পাতাইছি"।
বড়ি—বটিকা, বড়শি।
বয়ার—বায়ু
বর্ত্তিয়া—বৃৎ + নিচ্; বার্ত্তা "বর্ত্তিয়া আন"।
বাইৎ—বমন।
বাইন্—বাদিন্; বাহিনী; বপন "ঢুলর বাইন, কাপড়ের বাইন" "রূয়া বাইন দিছি"।
বাউল—বাতুল।

বাউ—বায়ু।

বাদল—বাদর, ডাওরে বাদলে।

বর্ত্ত—ব্রত।

বিচইন—ব্যঞ্জন।

লিচ্‌রা—বি-চারণ।

বিচ্‌রাই—বি-চারি।

বিচার—(বি-চর) "দোষগুণ বিচার," "গাই গু বিচার"।

বাড়ী—বাটী।

বাতা—বাত "নাওয়া বাতা", "চালর বাতা"।

বাদ্—ব্যাধ; "বাদে বিসম্বাদে।"

বেইল—বেলা, সময়।

বেজ—ভেষজ, ব্যাজ; "ধন্বন্তরী বেজ"; "বেজ করিওনা।"

বিল—গর্ত্ত।

বুনি—বৃন্ত, বোঁটা।

বেউ—ভার।

বেইন—ব্যঞ্জন।

বোরো—বারি।

মানু—মানুষ; "যত বড় মনু তত বড় কথা"।

তেতই—তিন্তিড়ী।

তার—(তৃ—তদ্) "ছালুনে তার বান্ধছে, "তার কাটা, তার বাড়ী"।

তিতা—(তিন্তি = আর্দ্র হওয়া); "ভিজা তিতা আইয়ার"।

তিক্ত "হিম্ তিতা নিম তিতা আর তিতা জার"।

থুবাও—স্তূপীকৃত "চাউল গুইন থুবাই লাও"।

তেনা—নেতা, নেকড়া।

তেড়া—বেঁকা "তেড়া তেড়া কথা কও দেখি"।

দাও—দায় দা

দারু—দারু, তরু "দারু লইতায় নি"; "দারু খাইছে"

দর—দৃঢ়।

নল—নাল।

নাইল—ঐ

নিৎ—নীতি, নিত্য, নু। বর্ত্ত নীৎ; নিৎ নিৎ; নীতিল।

নেনা—নন্দন।

পশার—প্রসার।

পাউরিয়া—পাশরিয়া।

পাইল্—পালি, শ্রেণী।

পাক্— পচ্ "পাক্; হইছে নি" "ঘূর্ণি পাক্"।

পাখাল—প্রক্ষালন, জলে ধ্বংস হওয়া "হাৎ পাও পাখাল।" "আমার জমি পাখাল গেছে"; "ধুইয়া পাখালাইয়া লাও।"

পার—পারাবত, প্রহার; "জুর পারর বাচ্চা" "কুচাদি পার দিছে।" "হংস ডিম্ব পার দিলা আর যে কদলী।"

পুতা—প্রথ; নোড়া; ঘরের ভিত্তি।

পুর—পুরি।

পুলা— পুত্র।

পোন—পানে, দিক্।

পাড়া—পাদ।

পালা—পালী।

পৈথান—পাদস্থান "পৈথানের বালিস"।

ভাও—ভদ্র; "তান লাগে আমার ভাও নাই।"

ভেদ—ভূ।

ভুতু—ভুতগ্রস্থ; "ভুতু হইছ নি?" (পাগল।)

ভুইচাল—ভু-চাল; ভূমিকম্প।

মেকুর—মার্জ্জার

মসী, মই—মাতৃস্বসা।

মুড়—মুড় "বউয়র মুড়", "ঔ মুড়া গু মুড়াদি যাও।"

যেতুৎ—যাবৎ

রুই—রুহ্

রুয়া—রূহ + নিচ্।

রঙ্গ—তামাসা, "রঙ্গিলা বন্ধুরে রঙ্গকর. কত।"

বাও—রাব

লাইট্যা—লম্পট।

লুড়ি—লুঠ, লুণ্ঠ।

লাগান—লগ্; "তাইন আমার নামে লাগাইছইন্"। "গাছ লাগাইছইন্।"

শিল—শিলা "শিলাচর" শিলর তলর কই।" সিলেট শিলা + ইট জয়ন্তিয়ার প্রস্তর গঠিত শিল নোড়া প্রভৃতি বিক্রয়ের কেন্দ্র।

সাদ—সজ্জ, সৌভাগ্য "সুয়াগ সাদ্‌ছে"; "সাদ সারদা খাইছে"
হেরি—সর্ষপ হোর (শ্বশুর।)
হুরু—ছোট—"হুরু লুরু মাছ গুইন্‌।"
হাওন্‌—শ্রাবণ।
হুরতা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।
হাঞ্জাইল—সন্ধ্যা।
হুকইন্‌—শুষ্ক মৎস্য।
হেয়োৎ—হেমন্ত
হাগ্‌—স্বর্গ; "শাক হাগের তারা হাগ্‌ তরকারী।"
হিতান্‌—শিরস্থান।
হুদা—শুধু, "হুদা ভাত খাইছি।"
হুরইন্‌—ঝাঁটা
হুব—ইচ্ছা, "রুচি খাওয়াত হুব নাই"।

খ। দক্ষিণ শ্রীহট্ট

অদৃষ্ট (উপকথা)।

নিত্যই বিক্যাৎ যায়্‌। বরাম্যন্‌ আর্‌ ও বিক্যাৎ য়ায়। তেউ আর্‌ দিন্‌ বিক্যাৎ গেল। তে বার বার ঘাট পুকুরীৎ যায়। তেউ বাড়ীৎ আইত চায়্‌ আর্‌ কয়্‌ "আর বিক্যা কর্‌তাম্‌ পার্‌তাম্‌ নায়্‌।"

তেউ বাড়ী ধার আইছে। তেউ বিন্না ছুবার্‌ ধার গ্যাট হইছে। বইল্‌ যদি তেউ কমর্‌ তুলত্‌ পারে না। ছুবাৎ ধরি টান্‌ দিছ্রে, আর ছুবা উগ্‌লিয়া পড়্‌ছে টাশ করিয়া। তেউ উঠি গেল্‌ গিয়া। চাইয়া দেখে ছুবার্‌ তল হাট্‌টা হন্দুক্‌। দেখি ছুবাদি ঢাকি থইল্‌।

অউ বাড়ীৎ আইয়া বাবজি টাইন্‌ কইল, "সক্কাল গ্যর খান্‌ গমাও।"

বাব্‌ণি পাক্‌ করে আর কয়, " আর্‌ আর্‌ দিন কইন্‌ না কুস্তা, আইল্‌ দেখি কয়্‌, "সক্যাল্‌ করি পাক্‌ করি লাও।"

আরও = আবারও = অপর একদিনও
তেই, তেই = তজ্জন্য
তে—সুতরাং
করতাম পারতাম্‌ নায় = করিতে পারিব না।
উগ্‌লিয়া—উৎপাটিত করিয়া
সক্যাল = শীঘ্র
লাও = নেও

লগে = সঙ্গে

ঠাকুর = ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিতে ব্যবহৃত।

কিতা = কি

আও = আস

চুরায়—বহুবচনে

টেকা = টাকা, ক প্রায় উচ্চারিত হয় না।

অল্যা—এই প্রকার হলা

বাব্‌নে কইল্ 'সক্যাল্ পাক্ করিলাও, আমারলগে তুমি অ যাইতায়্।"

তেউ তাই প্যাকেই কয়্ "ঠাকুর বউকা কিতা?"

তেউ হাৎ চুর তার্ বাড়ীধার আর্ এক্ বাড়ী চুরি কর্‌তা ফড়ামিশ্ কড়্‌রা।

তেউ বাব্‌নি কয়্, কও ঠাকুর কিতা, নইলে পাক্ উক্ কর্‌তাম্ নায়্।"

তেউ বাব্‌নে কইল্, "অউ ছুবার ধার ঘাট বইছ্‌লাম্, ছুবা আইল্ উগ্‌লিয়া, ছুবার্‌তল হাট্‌টা হন্দুক, ঔ হাৎ হন্দুক্ আন্‌তামগি।

ঔ হাৎ চুরা কইল্ "বাবন্ আন্‌ত গি?

আও আমরা লই আই গি।

অউ গিয়া হারি হন্দুক খুলি দেখইন্ খালী হাপ্। তেউ তারা, হাৎ চুরায় ফরামিশ করি হন্দুক বইয়া আনিল্। আনি হারি চাল্ উঠি ফুক্কা করলি।

তেউ হন্দুকর হাপ গ্যর ঠালি দিল্।

তেউ টে'কা পড়া আরম্ভ লইল্।

তেই বাব্‌নে কয়্ বাব্‌ণি "দেওরায় দিলে অ্যলা চাল করি দেইন।"

(দক্ষিণ শ্রীহট্ট হইতে লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত।)

শ্রীহট্ট সহর

দ্বারিকার যেতুৎ গাউৎ আছ্‌লী তেতুৎ খালি খাইছইন্ পাকাইছইন্ আর্ গদা কীর্ত্তন্ করছইন্; অখন্ আইছইন পরীক্ষা দিতা—দেখইন্ আগেও মানুঃ করেও মানু তেতুৎ কইন্ ও মানু পারাঃ!

অক্ষরের উচ্চারণ

১। ক, ভ, ধ, ঝ প্রভৃতি কয়েকটী অক্ষর মহাপ্রাণ; কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের গতি অল্পপ্রাণ অক্ষরের দিকে।

ক—কাটি পালাইমু

ভ—বাৎ, বিক্যা,

ধ—বান্দ, পিন্দ, ঔষদ

ঝ—জল

(ভইন্ শব্দে, বহিন্ শব্দের 'ব' ও 'হ' একত্রে 'ভ'—এর অনুরূপ)।

২। কয়েকটী অল্পপ্রাণ অক্ষরের গতি মহাপ্রাণ অক্ষরের দিকে।

চ—ছইল্‌তা, ছুর্

ক খাসচ্ খলম্ খালি, খিতারে বা?

ফ কিতারেবা ফাগলরাম।

৩। কয়েকটী অক্ষর অস্পষ্টভাবে যৎসামান্য উচ্চারিত হয়

ক কইল,

৪। কয়েকটী অক্ষরের উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না

জ, য, যখন আইছি। কাজ নাই

বাক্য 'বাকিঅ' বৎ উচ্চারিত হয়। ই + অ = য।

এইরূপ স্থলেই 'য' এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ পাওয়া যায়।

৫। অ, আ, ও, গ, ট, স, হ, প্রভৃতি কয়েকটী অক্ষর অপর অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয়

অ = এ সরেস্বতি বেনে,

অ = ঐ কৈ তর পৈরায় খৈলা সৈত্য সৈত্য

কৈন্যা (কনিআ; ই + অ = য়া 'দ্রুতোচ্চারণং সন্ধিঃ'।

ঔ = উ পুষ

আ = অ মসি, মই, খসি

খ = ং অহণ

আমরা ত চুরেরে কইচুর অপনাইন্‌ত হুণতে হুণইব চুর। (মালা পেতে চুর) চোলে ধইরা তুল।

ও = উ খালখুরা কুনদুষে (গুণাভাব cf চুর্ আর্য্য প্রভাব) পুলা পুরি, তুম্‌রার্ লেপ তুষক, ধুপা বাড়ী, থাল, লুটা

ট = ত ইত হিতা হোতা (cf সংস্কৃত স্বার্থে তল)

ম = ব বাবন অব্

স = ছ ছিলাহ ভাই ছাব্ (ছিরি উজি 'স' এর বিযুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ = ছ)

স = ক কুতা

হাওন। তুমরার হৌ (সেই মকরদমার কিতা অইল্ (হইল) বা?

স = হ হাপ হিয়াল হুয়র। পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় হ অক্ষরের উচ্চারণ সুস্পষ্ট নহে। হাব্বুই হক্কল।

৬। কতকগুলি অক্ষরের উচ্চারণ হয় না

(১) স—বা, খা, হা, মই, তব্দ আরি পরি, যুগযাইট, চুয়াকাইট আউকগার্ড ব্যঞ্জনবর্ণ বর্জ্জনের রীতি হি (সে) আমার লগ নি তামা (তামাসা) করত আছিল? শব্দ উচ্চারণ করিতে শ্বাস প্রশ্বাস প্রথমে ঠিক থাকে কিন্তু শেষদিকে মাত্রা মৃদু হইয়া পড়ে—বাস উচ্চারণ করিতে বাঙ্গালায় 'বাস্' এবং সুরমা উপত্যকায় বা। শ্বাস শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে রক্ষিত হয় নাই।

(২) হ—নইলে দুয়াই বার্কর উক্কা বিস্যইৎ

(৩) র মিতা, বিনে, দড়, হৎ, পতার বারন (বরাম্যণ) ভাদ, কাত্তি, প্রাকৃতে ভিন্ন বসীয়ানাং সংযুক্ত বর্ণোনাস্তি। eg আত্মা (সং) বব = অং; প্রা ধৃ—অ আত্তা চৈৎ

(৪) ল ফাল্গুন।

কারক বিভক্তি

১। এ যে—রামে কয়, চণ্ডীরে আয়ের্
আয়—দেউরায় দেইন কাউয়ায় কইল্।
ন—তাইন্ গেছইন্
বহুবচনে—ঠাকুর হক্কল যোনীৎ বইছইন্।
তোমরা—তুমি তাইন, তাইন তাইন তাহারা
যাহারা যাইন যাইন। হাৎ চুরায়। (সাত চোর) ভাই আইন = ভ্রাতারা

২। এ—তানে দেখ্ছাম্
রে—তাইরে কুরলও

৩। এ—মুখে কথা কও
দি—ছুবাদি ঢাকি থইল
আতাৎ—তান আতাৎ কাম্খান্ করাই লাও

৪। রে—ছালিয়ারে এগু পইসা দেইন
এ—তানে টেকাও দিলাও

৫। ত—ঘরত বার করি দেও
তন্—ঘর্তন্ বার কর
থাকি—ঘর থাকি বার হও

৬। অর—গাছর জামির রামর বাড়ী
বাবনী টাইন্ বাড়ী ধার

৭। ৎ—ঘাট পুক্রীৎ গেল বিক্যাৎ, দুযাৎ কাছাৎ গুরীৎ

অ—ধার, তল, গাছ, ঘাট
সম্বোধন রে, রেবা রেবো—অরে বা ছনি যাও।
কি তা গো—কি তা গো রামর্ মা!

ভাষায় আরব্য ও পারস্য প্রভাব

শ্রীহট্ট দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনাধীন ছিল। ফলে জনসাধারণের ভাষায় বহু আরব্য ও পারস্য শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাছাড় জিলা কাছাড়ী রাজগণের অধিকৃত ছিল; কিন্তু এই স্থানের বাঙ্গালী অধিকাংশই শ্রীহট্ট হইতে উপনিবিষ্ট; সুতরাং ভাষায় মুসলমানী-প্রভাব এস্থানেও প্রবল।

মুসলমান অধিবাসীবর্গ আরবী ও পারস্য শব্দ হিন্দু অধিবাসীবর্গ অপেক্ষা অধিকতর ব্যবহার করিয়া থাকে।

ক। অনেক শব্দ হিন্দু মুসলমান সকলেই তুল্যরূপে ব্যবহার করে। এই সকল শব্দ নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—

১। জমিদারী সেরেস্তা ও আইন আদালতে ব্যবহৃত শব্দ

না আ আ পা আ পা
লোক লস্কর, দোহাই তলব, খবর, জল্দি, কবুল, ফর্গ, কাগজ, কলম, কালি, দোয়াত,

পা আ
সাবুদ, দুরস্ত, বেতমিজ, বেচসম, বেলাজ, নজর, রিযাইৎ

২। সাংসারিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ

আ পা আ
দান খয়রাৎ, ভাই বিয়াদার, পুঁথি কিতাব, বাসন, বর্ত্তন, খেশকুটুম, দুস্ত আসনা, শিকমৎ বরাৎ, জোর জবরদস্তি, খানা পিনা,; নামবদনাম, লাউকরি খরি, চলাচল, নিমক হারাম।

পা উ পা
থুরা, আনাজ, রুই, গিলাপ, ছান্তি, পানি, কটরা,
রেকাব, আইন, ইয়ারানা, খুৎ, জাঙ্গাল, কিচ্ছা, পয়মাল (শূকর)

কয়েকটী শব্দ মুসলমানেরা হিন্দুদিগের ন্যায় ব্যবহার করে না—

কদু (লাউ)	নিমক (লুন লবণ)	চাচা (কাকা খুরা)
বক্রী (ছাগী)	কেল্লা (মাশ্বি)	ছালুন (বেনুন)
লও (রুধির, রক্ত)	গোছলকর (হিনা কর)	টেঙ্গা (চুকা)
কুরলও (উরলও)	রসুই (পাক)	মামু (মামা)

ফুফা (পিসা)	ফুফু (পিসি)	দোস্ত (বন্ধু)
মাফ্ (মাপ)	খুসী (সুখী)	গোস্ত (মাংস)
পাকাইছে (বান্ধছে)	নছিব (অদৃষ্ট)	অন্দর (ভিতর)
খদার কছম (ভগবান জানে)	নেক বদি (ভাল মন্দ)	চেরাগ (বাতি)
দরদ মন্দ (ব্যথার লোক)		দরগায় চেরাগী

সুরমা উপত্যকার কথ্য-ভাষা নিম্নোক্ত তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ক) হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের ভাষা

(১) হবিগঞ্জের ভাষায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কিশোরগঞ্জের প্রভাব দৃষ্ট হয়। সামাজিক আদান-প্রদানেও হবিগঞ্জ উহাদের সহিত বিশেষরূপে জড়িত।

(২) সুনামগঞ্জের ভাষায় কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার প্রভাব দৃষ্ট হয়। ছাতক সুনামগঞ্জের অন্তর্গত হইলেও উত্তর শ্রীহট্টের ভাষার সহিত উহার ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

খ। (১) শ্রীহট্ট সহর ও উপকণ্ঠ—এই স্থানের ভাষায় আরবী ও পারস্য ভাষার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

(২) দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভাষায়, উত্তর শ্রীহট্টের ভাষা অপেক্ষা আরবী ও পারস্য ভাষার প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প। কাছাড় ও জয়ন্তিয়া সীমান্ত ব্যতীত করিমগঞ্জের অবশিষ্ট অংশের ভাষার সহিত উত্তর ও দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

গ। (১) জয়ন্তিয়া পরগণা উত্তর শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহার সহিত শ্রীহট্টের অপরাপর অংশের সামাজিক সম্পর্ক এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভাষায়ও এইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে।

(২) করিমগঞ্জের পূর্ব্বাঞ্চল ও জয়ন্তিয়া হইতে উপনিবেশ ফলে এই তিন স্থানের ভাষায় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক আদান-প্রদানের অভাবে ভাষায় স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছে। কামরূপের প্রভাব উত্তর শ্রীহট্টের ন্যায় এই অঞ্চলেও বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু কামরূপের প্রাধান্যের পরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ বঙ্গীয় নৃপতিগণের অধিকারে থাকায় সুরমা উপত্যকার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ত্রিপুরা ময়মনসিংহের ভাষায় সহিত এই অঞ্চলের ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

এক্ষণে উপনিবেশের কথা। অতি প্রাচীন কালেও সুরমা উপত্যকায় আর্য্য উপনিবেশের সাক্ষ্য একাধিক পর্ব্বত গুহা এবং পর্ব্বত পৃষ্ঠে স্থাপিত অসংখ্য শিলামূর্ত্তিই ঘোষণা করিবে। নিম্নশ্রেণীর ভাষা আলোচনায় ও প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কামরূপ এবং প্রাচীন ধর্ম্মনগর রাজ্যের সহিত এই উপনিবেশ বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর বল্লালের রাজত্বে বহুব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য, বঙ্গে মুসলমান

শাসকবর্গের কর্ম্মচারিরূপে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গদেশ হইতে শ্রীহট্টে বাসস্থাপন করেন। মাহিষ্যগণ হিন্দুযুগেই পাটিকারা ও বঙ্গ হইতে শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হ'ন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে কাছাড়ে সর্ব্ব জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৫০ সহস্রের ন্যূন ছিল। সমতল কাছাড়ের বাঙ্গালী অধিবাসীগণের অধিকাংশ করিমগঞ্জ এবং জয়ন্তিয়া পরগণা হইতে উপনবিষ্ট হইয়াছে। আসাম ও ধর্ম্মনগর হইতে আগত ব্যক্তিগণ সংখ্যায় অধিক নহে। সমাজের নিম্নস্তর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মমত প্রবল—এই স্তরে "গুরুখের" প্রভাব এখনও রহিয়াছে। সমাজের উচ্চস্তরে তান্ত্রিক শাক্ত মত প্রবল। ১৪শ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে শ্রীহট্টে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়; কিন্তু ইতিমধ্যেই মুসলমান অধিবাসিগণের সংখ্যা অন্যান্য সর্ব্ব জাতীয় অধিবাসী অপেক্ষা অধিক।

সাহিত্য ও চিত্রশিল্প

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সাহিত্যের সহিত শিল্পকলার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ কথাটা বড় একটা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আজকাল সাধারণতঃ সাহিত্য বলিলে আমরা গদ্য বা কাব্যই বুঝি; আর শিল্প বলিলে ঘর সাজাইবার চিত্র বা প্রদর্শনীতে দেখান বা কৌতুকাগারে (museum) রক্ষিত শ্রমসাপেক্ষ (industrial art) সুদৃশ্য শিল্পবস্তুর কথাই মনে হয়। বাহির হইতে এ দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোন সংযোগ লক্ষিত হয় না। কাজেই আমরা এ দুইটিকে পৃথক ও পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি; কিন্তু সামান্য সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, বস্তুতঃ সাহিত্য ও শিল্প অভিন্ন; এ দুইয়ের ভিত্তি একই—উভয়েই একই সূত্রে গাঁথা।

সাহিত্যের গঠন ভাষার উপর। ভাষা যেমন ভাব-প্রকাশের একটি মার্গ, কলাবিদ্যাও তেমনই ভাব-প্রকাশের অন্যতম উপায়। এই হিসাবে সাহিত্য ও শিল্পের ক্রিয়া একই। শিল্পের উপর সাহিত্যের প্রভাব আদিকাল হইতেই নিয়ত চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের সহিত শিল্পের এই সম্বন্ধ অভেদ্য। সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে ভাষার কথা কহিতে হয়। আগে ভাষা পরে সাহিত্য। সাহিত্যের অনেক রূপভেদ। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সাহিত্যের অঙ্গ। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এ ইতিহাসের প্রকৃত আরম্ভ কোথায়, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যেখান হইতেই আমরা সে ইতিহাসের আরম্ভ ধরি না কেন, তাহাতে ধর্ম্মের প্রাধান্য বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। সকল রচনা ও শিল্পের মূলে ধর্ম্মের প্রবাহ লক্ষিত হয়।

লিখন-প্রণালী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও শ্রুতি ছিল। শ্রুতির কোন ইতিহাস নাই। বেদ প্রথম রচনা। সাহিত্যের ইতিহাস এই সময় হইতে পাওয়া যায়। শ্রুতিকে সাহিত্যের মধ্যে না ধরিলে বেদ হইতে সাহিত্যের জন্ম। এই অনাদিকাল হইতে ভাষা বা সাহিত্যের সহিত কলাবিদ্যার সংযোগ পাওয়া যায়। সঙ্গীতকে সাথী করিয়া বেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদপাঠের সহিত সামগান গীত হইতে লাগিল। বৈদিক সময়ে সঙ্গীত ছাড়াও অন্য কলাবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সহস্র দারুময়-স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের-প্রকোষ্ঠের উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকার তন্তুবায় ইত্যাদির কথাও আছে।

বেদের পর রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মহান্ যুগান্তর আনিয়াছিল। এই দুই মহাকাব্যের সৃষ্টি না হইলে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের কি অবস্থা হইত বলা যায় না। ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের ধ্বংসাবশেষ যাহা কিছু আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের অধিকাংশের সৃষ্টির কারণ রামায়ণ ও

মহাভারত। এককালে যেন এই দুই মহাকাব্য সকল শিল্পের প্রাণস্বরূপ ছিল। রামায়ণ বা মহাভারতের সমসাময়িক কোন শিল্পবস্তুর চিহ্ন পাওয়া যায় না; তবে চিত্রশালা ও ভাস্কর্য্যের উল্লেখ আছে। প্রমাণাভাবে ইহাকে সাহিত্যিক বর্ণনার মধ্যে সামিল করিলেও এই দুই মহাকাব্যের সারবত্তা ও ভারতশিল্পের উপর তাহাদের প্রভাব ভুলক্রমেও লঘু বলিয়া মনে হইতে পারে না; কারণ ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যেখানে যাহা কিছু পুরাতন শিল্পকলার চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব লক্ষিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে আর একটি নূতন যুগের সৃষ্টি। এই যুগে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প সবই কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বের কোন শিল্পকলার চিহ্ন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু এ প্রমাণাভাব থাকিলেও এ কথা স্পষ্ট বলা যাইতে পারে যে, শিল্পচর্চায় কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই, বরং কালের সহিত শিল্পসাধনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কয়েক শত বৎসর পর হইতেই পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন পালিগ্রন্থে চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বের। কথিত আছে এই চিত্রগুলি গৌতম বুদ্ধের মনোনীত ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন রাজকীয় ধর্ম্ম হইল, তখন ধর্ম্মের সংযোগে শিল্পের আদর যে কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ সমস্ত ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। অশোকের সময়ের অক্ষয় কীর্ত্তি এখনও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী হইতে ৭ম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল বৌদ্ধধর্ম্ম-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাতে তৎকালে ভারতশিল্পের কি অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ-হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত বৌদ্ধমঠ অজন্তায় যে অসংখ্য চিত্র আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সে সময়ের চিত্রশিল্পের অবস্থা কিরূপ পরিণত ছিল, তাহা বুঝা যায়। এই চিত্রগুলি এখন জীর্ণ, পরিত্যক্ত ও লুপ্তপ্রায়। কালের করাল স্পর্শে চিত্রগুলি প্রত্যহই অল্প অল্প করিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুবৃহৎ পতিত বৃক্ষকাণ্ড দেখিলে যেমন এককালে সেই বৃক্ষ কত শাখাপল্লবিত, ফলপুষ্প পূর্ণ ছিল মনে হয়, তেমনই এই মহান চিত্রশিল্পের লুপ্তোন্মুখ ভগ্নাবশেষ দেখিলে তাহার অতীত গৌরবের কথা মনে পড়ে। অজন্তার চিত্রগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক। চিত্রের বিষয়গুলি অধিকাংশই জাতক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এতদ্ভিন্ন গৌতম বুদ্ধের জীবন-ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই শিল্পের উপর সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে। সিদ্ধার্থের জন্ম, বাল্যক্রীড়া, যশোধরার সহিত বিবাহ, সংসারে বৈরাগ্য, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন, নূতন ধর্ম্মপ্রচার ও নির্ব্বাণ প্রাপ্তির চিত্র অসংখ্যস্থানে অসংখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর দাক্ষিণাত্যে যে শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, তাহার প্রভাব

সে সময়ের শিল্পে ফুটিয়া উঠে। সে সময়কার যে সকল ভাস্কর্য্য দেখা যায়, তাহা শৈব-সাহিত্যের রূপান্তর বলিলেই হয়।

উত্তর ভারতে মোগলদিগের প্রাদুর্ভাবে ভারতীয় শিল্পে একটি নূতন তরঙ্গ ছুটিয়া ছিল। বৌদ্ধ ও মোগল শিল্পের মধ্যে ভারত শিল্পের ইতিহাস নাই। এই সময়ে যে শিল্পচর্চ্চা লোপ হইয়াছিল এমন নয়। সে সময়ের শিল্পের কোন চিহ্ন না থাকিলেও ইহা বলা যায় যে, শিল্পচর্চ্চা অবিচ্ছিন্ন ছিল। ইহার প্রমাণ নেপাল ও তিব্বতে পাওয়া যায়। অজন্তায় যে শিল্পের আকস্মিক বিচ্ছেদ দেখা যায়, নেপাল ও তিব্বতে আজও সেই শিল্প বর্ত্তমান। অজন্তা ও তিব্বতের শিল্প একই, কেবল ধর্ম্ম ও সাহিত্যের রূপান্তরের জন্য সামান্য প্রভেদ আছে। একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, যদি অজন্তার শিল্প হঠাৎ পরিত্যক্ত না হইত এবং মোগলদিগের প্রাদুর্ভাব এদেশে না হইত, তাহা হইলে ভারতশিল্পের আধুনিক অবস্থা কতকটা তিব্বতীয় শিল্পের মতই হইত। মোগলগণের ভারতবর্ষে আগমনে প্রাচীন শিল্পচর্চ্চায় বাধা পড়িল বটে, কিন্তু সেই সময় হইতে আমাদের দেশের শিল্প একটা অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল। আকবরের সময়ের চিত্রকলা যাবনিক হইলেও, তাহা সম্পূর্ণই ভারতবর্ষীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ শিল্প সমসাময়িক সাহিত্যের সহিত অভিন্নরূপে মিলিত ছিল। শাহনামা, আমীর দাস্তান ইত্যাদি পারসিক পুস্তক চিত্রিত করায় এই চিত্রশিল্প ব্যবহৃত হইয়াছিল। আকবরের আদেশে রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্য কয়েকটি ভারতীয় পুস্তকও চিত্রত হইয়াছিল।

মোগল শিল্পের সমসাময়িক আর এক শিল্প ছিল। সে রাজপুত শিল্প। এ শিল্প প্রকাশের স্থান ছিল রাজস্থান ও পাঞ্জাব। এ শিল্পকে বৈষ্ণব শিল্পও বলা যাইতে পারে; কারণ ইহার মূলে প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও কাব্যের সংযোগ দেখা যায়। এ শিল্পেও মহাভারতের প্রভাব অপরিমেয়। উত্তর পাঞ্জাবে কাংড়ার চিত্রাবলীর বিষয় অধিকাংশই এই দুই মহাকাব্য হইতে গৃহীত; কাংড়ায় অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কত শত সহস্র চিত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য চিত্র প্রতিবৎসর ভ্রমণকারিগণ পাঞ্জাব হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে, অথচ এ শিল্পভাণ্ডারের শেষ নাই। এখনও রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কাংড়ার শিল্পীদিগের সহিত এই দুই মহাকাব্যের কি ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। প্রত্যেক অধ্যায় হইতে কত শত চিত্র যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আজকাল আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত চেষ্টা করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু এই শিল্পীদিগের এই দুই মহাকাব্য কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাংড়ার চিত্রাবলীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলির অন্তরে বৈষ্ণব কাব্যের রসোচ্ছ্বাস। চিত্রগুলির পশ্চাতে লিখিত অজ্ঞাত কবিদের সুললিত দোঁহা সময়ে

সময়ে পাওয়া যায়। শ্রীমতীর অনুরাগ, অভিসার, মাধবের সহিত রাধার মিলন, মানভঞ্জন, মাধবের মান ইত্যাদি বৈষ্ণব-কবিদিগের প্রিয় বিষয়গুলি অঙ্কিত হইত।

কাশ্মীরেও এই শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রবল হওয়ায় তন্ত্রবিষয়ক চিত্রই অধিক দৃষ্ট হয়। তন্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক চিত্রিত হইয়াছিল। ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে পুরাতন শিল্পের ইতিহাস শেষ হইয়াছে।

আধুনিক সময়ের চিত্রশিল্প এক পরিবর্ত্তনশীল সময়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। ইউরোপীয় শিক্ষায় আমাদিগের সনাতন চিত্রশিল্পপ্রথা আমাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে। দোষ আমাদেরই, কারণ আমরা স্বেচ্ছায় জাতীয়শিল্পের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছিলাম। ইউরোপীয় শিল্পের বীজ আমাদের দেশে রোপিত হইলে কি কুফল ফলিতে পারে, রবিবর্ম্মার চিত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ ও ভারতবর্ষের শিল্প-আদর্শে কোন সাম্য নাই। সকল শিল্পের মোহিনী শক্তি আসিতে পারে না। নকল ইউরোপীয় শিল্প যে ভারতবর্ষে কৃতকার্য্য হইবে না, তাহার আর একটি কারণ যে, উহা সাহিত্যিক ভাবের বড় একটা ধার ধারে না। রবিবর্ম্মার চিত্রে অল্পভাষায় যাহাকে চটক বলে তাহার অভাব নাই; কিন্তু প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উহার কোন মূল্য নাই। কল্পনা ও ভাব সৌন্দর্য্য চিত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। রবিবর্ম্মার চিত্রে তাহার কোন আভাস নাই।

বাঙ্গালাদেশে চিত্রশিল্পের এক নূতন যুগ দেখা দিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের সৃজিত চিত্রশিল্পের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এ শিল্পের বিষয়ে যে সকল মতান্তর আছে, তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। দোষ গুণ সকল বস্তুরই থাকে। বাঙ্গালার এই তরুণ শিল্পের দোষ গুণ দুই-ই আছে। পরিত্যক্ত ভারতশিল্পের জাতীয় আদর্শের অনুসরণে এই শিল্পের আবির্ভাব। এই জন্যই এ শিল্প আমাদের জাতীয় শিল্প। এই শিল্পের আরম্ভ হইয়াছে মাত্র—পরিণতির এখনও বিলম্ব আছে। কেবল এই কথাটি মনে করিয়া আমরা যদি এই শিল্পের বিষয় আলোচনা করি, অপরিণতির জন্য যে সকল দোষ চোখে পড়ে, সে গুলিকে সহ্য করিয়া ইহার মধ্যে কোন গুণ আছে কি না, তাহা বিচার করি, তাহা হইলে এই শিল্পের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়। স্বীকার করি, এ চিত্রশিল্প আমাদের অনেকেরই মনোনীত নহে; কিন্তু ইহা ত একান্তই স্বাভাবিক। পরিচয় না থাকিলে কোন বস্তুর মর্য্যাদা বুঝা যায় না। এই শিল্প জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইলে দিনে দিনে ইহা আদর ও সহানুভূতি পাইবে। এই নবশিল্পের আন্দোলনের সহিত আমাদের সাহিত্য সংযুক্ত রহিয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য এখন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের এক সময়ে আবির্ভাব আমাদের জাতীয় জীবনে একটী মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত। সাহিত্যের সহিত শিল্পের চর্চ্চাও এই সময়ে বর্দ্ধিত হইলে এই নূতন চিত্রশিল্পের বিচিত্রতা নানরূপে প্রকাশ পাইবে। অভুক্তি অপেক্ষা অনাদর আরও দূষণীয় ও অপকারক। যে শিল্পের

প্রাণের পরিচয় আজ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছে, তাহার অনাদর না করিয়া যদি অযথা অত্যুক্তি বা প্রশংসা করিয়াও তাহার সমাদর করা যায়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধন করা হয়। এই নূতন শিল্প লইয়া আমাদের দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ইহা বেশ স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে উহা নির্জীব নহে, বরং জাতীয় উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাণিত। যে বস্তু লইয়া কোন আন্দোলন হয় না তাহা প্রাণশূন্য, নির্জীব। আন্দোলন ও আলোচনায় পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহার অস্তিত্ব পাকা রূপে গড়িয়া যায়।

সাধারণতঃ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা আমরা বুঝিয়া দেখি না। শিল্পের প্রকৃত রূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ। সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিলে প্রাণের পরিণতি হয়। জাতীয় জীবনে শিল্প এক প্রধান অঙ্গ। ইহা পরিত্যাগ করিলে জাতীয় জীবন পূর্ণ হয় না। আজ এই সম্মিলনে সাহিত্য চর্চ্চা হইতেছে। শিল্প সাহিত্যের রূপান্তর। সাহিত্যের সহিত শিল্পের চর্চ্চাও যদি আরও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণতার দিকে আমরা আরও শীঘ্র অগ্রসর হইব।

সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

শ্রী শরৎচন্দ্র সিংহ

ভারতের শোণিতের মধ্যে সঙ্গীতের বীজাণু বর্ত্তমান, একথা অস্বীকার করবার যো নাই, তবে প্রাকৃতিক বিধানে শক্তির ন্যূন্যাধিক্য হ'য়ে পড়ে।

সেই আদ্দিকালের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া কল্লে দেখা যায়,—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মহাভারত রামায়ণ ইত্যাদি, সবই গান। দুনিয়ার দৌলতখানায় যেমন অফুরন্ত রত্ন সঞ্চিত; গোড়া থেকে যেমন লোকে দেখ্‌চে, নিচ্চে, ব্যবহার কচ্চে, সেই রকম আমাদের ঐ সব পুরাণো জ্ঞানসমুদ্রে অসীম গভীরতার মধ্যে থেকে অনন্ত রত্নরাজি কত কত যুগ যুগান্তর ধরে আমরা দেখ্‌ছি, তুলে নিচ্চি, বিলোচ্চি, তবুও ফুরোচ্চেনা, নিতুই নূতন বলে বোধ হচ্ছে। এমনিই মজা আবার ওই পারের তাঁরা, যাঁরা "বেদকে" চাষার গান বলে নাক তোলেন, ও যাঁরা খুঁটে খেতে শিখেই ধরাকে মধুপর্কের বাটী বলে ভুরু কুঁচ্‌কে নজরকে সীমাবদ্ধ করে, কেবল দিগ্বলয়-রেখার জরিপ কচ্ছেন। এই তাঁহাদেরই মধ্যে দুই চারি জন ভারতের সঙ্গীতটাকে কি রকম চোখে দেখেন, তারই দু একটী উদাহরণ দিচ্ছি।

"বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোণার টোপর মাথায় দিয়ে" সেই রকম খামকা ১৩২০র এক বাদলার দিনে, Royal Asiatic Society-র Bengal Branch-এ সাহেব কৃপাপরবশ হয়ে (Westharp সাহেব, তিনি আবার Muc. Doc.) বলে গেছেন, যে ভারতীয় সঙ্গীতটা ফ্লুট বা বাঁশী আর ঢাক ঢোল বা খোলের সঙ্গতে গ'ড়ে তোলা একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। আবার বলেছেন, প্রাচ্যের সঙ্গীতটা তাদের পবিত্র দেবস্থানের প্রাচীরের গণ্ডী মধ্যে অবস্থিত, সেখানে বিদেশী বা বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং এটা কোলাহল না হ'য়ে যেতে পারে না (তবুও করুণানিদানেরা প্রবেশ করতে ছাড়েনি।) তবে এ কথা হ'চ্ছে এই যে, এইরূপ ধারণার মূলে সত্যিকারের মূর্ত্তি, জাপান-সম্রাটের মত কনুরু পর্দ্দার আড়ালে দেখা, দেন সেটা দেখ্‌তে হবে। এই অকাট্য ধারণার কুণ্ডু, কটী ঝরণার জল পেয়ে টৈট্‌ম্বুর হয়েছে, সেটা অনেকেই বোধ হয় জানেন। Capt. Willard ও Capt. Day-র কেতাবাদি, জাহাজে চড়বার আগে, একপ্রস্থ প্রায় কণ্ঠস্থ ত' করেছেনই, তার উপর সত্যবালা দেবী প্রভৃতির গান বাজ্‌না এখানে এসে শুনছেন, চীন, জাপান ঘুরে সে মোস্‌রাণী প্রাণে নিয়ে বোম্বাই থেকে সটান এখানে এসে, (লাইবেল হবার ভয়ত নেই) সুতরাং নিরপরাধ ভারত-সঙ্গীতের বেওয়ারিশ দেহে যে রকম ব্লানটা ব্‌লেছেন, সে বিষ ঝাড়্‌তে গেলে, সংযম হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। তাঁর মতে, ইউরোপের বিশ্বাস, ভারত সঙ্গীত আরম্ভ হ'য়েছে সেইখানে, যেখানে

ওদের আস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ শেষ হ'য়েছে। প্রথমে শুন্‌তে গেলে, একটু বিচঞ্চল হতে হয় বটে; তবে একটু তলিয়ে দেখ্‌লে, কথাটী ঠিক বলে বোধ হয়। কেন না হাঁটি হাঁটি পা-পা কর্‌তে কর্‌তে তবেত চুরে রাং চাং। গোলাম পালোয়ান যখন Paris Exhibition-এ কুস্তি লড়্‌তে গেছ্‌লো, তখন অনেকেই তার গাটিপে সরে পড়েছিল; এই বলে যে,—ভারতের কুস্তি ও ইউরোপের কুস্তি অনেক তফাৎ; তাখৎ থাক্‌লে কি হয়? টাং ওড়ানো বড় শক্ত কাজ। তোড়জানা না থাক্‌লে, প্যাঁচ সাফ হয় না। Capt. Day যিনি মওলাবক্‌সের গান বাজ্‌না শুনে, আর দক্ষিণী সঙ্গীত শুনে বই লিখেছেন, উত্তরের সঙ্গীত বড় একটা বেশী শোনেননি। Capt. Willard ও তথৈবচ, যিনি এই কোলাহলরূপ হলাহল আকণ্ঠ পান করে বিলাতী নীলকণ্ঠ হয়ে কেতাবাদি লিখে গেছেন, তিনিও ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেন নি। কেন না ইউরোপ যত দিন না গুরু অশৌচ, শুধু পায়ে, হবিষ্যি খেয়ে, হর্তুকি মুখে দেন, ততদিন ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত তাঁরা ধারণায় আনতে পার্‌বেন না। ভারতের সঙ্গীতের অন্দর-মহলে যাঁদের প্রবেশাধিকার নাই, তাঁদের পক্ষে আমাদের সঙ্গীতের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার, বিভ্রাটের পর্য্যায় স্থান পায় নাকি!

আমরা সেটীকে উৎপাত বলি। তবে উৎপাত ত্রিবিধ, দৈব, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব। এটা কোন্ জাতীয়, সেটা আপনারা সবাই বুঝতে পাচ্ছেন।

আওয়াজ সব প্রাণীরই গলা থেকে বেরোয়। বিধাতার শ্রেষ্ট সৃষ্টি, মানব। সেই মানবের কণ্ঠের গঠন-প্রণালী অনুশীলন কল্লে, বেজায় আশ্চর্য্য হতে হয়; আর তাই বোধ হয় মানবকণ্ঠ থেকে সব রকম স্বর উৎপাদন হয়; কখন্ কোন্ অবস্থায় কি ভাবে, কি শব্দ উচ্চারণ হয়, যা শুনে, সব প্রাণী মোহিত হয়, পোষ মানে, ভয় করে, ভালবাসে ও ভক্তি করে। তাই বোধ হয় আমরা মন্ত্রের শক্তি মান্‌তে বাধ্য।

তবে উত্তরে ও শীতপ্রধান দেশে, যেখানে লোকে কম কথা কয়, কম হাসে, সেখানে পেশীর ক্রিয়া প্রচুর হয় না বলে, কথা কইতে কইতে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়। ডচ ও আফ্‌গানদের প্রতি দৃষ্টিপাত কল্লে এটা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং তাদের ভাষাও সেইরূপে আড়-মাদরাটে গোছের গড়ে উঠেছে। আবার এদিকে ভারতবর্ষের আর গ্রীস, ইতালী ও অন্যান্য দক্ষিণ দেশে, যেখানে প্রকৃতি পেলবতায়, রমণীয়তায় প্রসিদ্ধ, সেখানে ভাষার মোলায়েমত্ব ও কোমলতা অবশ্যাম্ভাবী।

মানবের আকৃতি প্রকৃতি যেমন এক রকম হয় না, সেইরূপ তাহাদের স্বাভাবিক পাদবিক্ষেপও একরূপ হয় না। তবে দেখা যায় শিক্ষা ও অভ্যাসের সৌষ্ঠবে, পাহারাওয়ালাদের কুচকাওয়াজের সময় প্রায় খুঁতযুক্ত একরূপ হয়। মানুষের ও ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ থেকে বেশ বোঝা যায়, একটা জোর একটা মৃদু। তবে মানুষ ও ঘোড়া অনেক রকমের আছে বলে, ছন্দও ঠিক সেই অনুপাতে অনেক রকম। হিসাব

৭২৫ রকম পাওয়া গেছে। ছন্দে যতি ও বিরাম আছে বলে সঙ্গীতের অঙ্গে স্থান পেয়েছ। ছন্দের গঠন-প্রণালী নানা রকম পাদবিক্ষেপ থেকে প্রণিধান করা যেতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন জাতির আভ্যন্তরিক ও বাহ্য বাসনা থেকে, তাদের ছন্দপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। মাঝিরা দাঁড় টান্তে টান্তে তালে তালে যে গান গায়, মজুরেরা ছাদ পিট্তে পিট্তে যে গান গায়, ভুনোওয়ালারা যাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে যে গান গায়, ইত্যাদি; তা থেকে বোধ হয় ছন্দই তাদের গানের ভিত্তি।

গাছের ফল আর মানুষের দেহ, দাতাকর্ণের মত করাতে চিরে ফেল্লে, দেখা যায় যে, দুটো ভাগ কেমন সমান হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত ও কবিতা মা সরস্বতীর দুটী দয়া, যাকে সুকুমার বা ললিতকলা বলে অভিহিত করা যায়। তার দুটো দিক, একটা আনন্দ ও অপরটা শিক্ষা দেয়। এখন সেটা খাবার জিনিষ হয়ে পড়েছে। তবে তাতে তেউড় গজায় না।

পুরাণাদি কবিতায় লিখে স্মৃতির উন্মেষ ও রক্ষাকল্পে সাহায্য করেছে। যাঁরা র'চে গেছেন, তাঁরা যে কতটা বেশী মস্তিষ্ক নিয়ে ঘরকন্না করতেন, এখন বেশ বোঝা যায়। তাই প্লুটার্ক বলে গেছেন, আগের লোকেরা ছন্দে শিক্ষা দিতো, হেরোডোটাসেঁর পূর্ব্বে গ্রীকেরা ছন্দে ইতিহাস লিখ্তো। ইজিপ্ সিয়ানদের কাছ থেকে তারা শিখেছিল, আর ইজিপ্ সিয়ানরা বলে, এটা তারা বার করেছিল হিন্দুদের কাছ থেকে।

ভারতের শ্যামকোমলতার মধ্যে থেকে প্রাণের ভাব যখন গানের মুখে বেরিয়ে পড়ে, তখন সে ছন্দের ছকে কথা সাজিয়ে বসায় ও গায়; তখন পা তালে তালে আপনি নেচে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সুদশুদ্ধ পুষিয়ে দেয়। আবার এই ছন্দে, কবি ও গাহক এবং বাদককে, ভ্রাতৃসম্বোধনে, এক পরিবারভুক্ত করে,—তবে মাস্তুতো, পিসতুতো, মামাতো, খুড়তুতো হিসাবে।

সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের, সকল বর্ণের জাতীয় সঙ্গীতাদির গতি পর্য্যবেক্ষণ কল্লে দেখা যায়, সেই সেই জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মের ও সেই সেই দেশের আবহাওয়া, খাদ্য, ব্যবসায় ও অভ্যাস রীতিমত সাহায্য করে।

সভ্য ও অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির সঙ্গীত হ'তে তাদের স্বাভাবিক ছন্দ ও সঙ্গীতপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ বাদ্যযন্ত্র তাহারা ভালবাসে তাহা হতে ভালমন্দের মীমাংসা করা যায়। কামস্কাট্কা থেকে বর্ম্মা পর্য্যন্ত সকল জাতি যে সঙ্গীত ভালবাসে, তার হিসাব আছে।

ত্রিপুরাসুর নিহত হ'লে, মহাদেব আনন্দে উল্লাসিত হ'য়ে, শঙ্কর-বিজয় বলে একটী নূতন রাগ সৃষ্টি কল্লেন। তখন ব্রহ্মা দেখলেন তাণ্ডব সুরু হয় বলে, অমনি ধাঁ করে তিরপুরোর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদঙ্গের দুমুখ ছেয়ে বোঁ করে গণেশের কোলে তুলে দিলেন। তখন "তাদিৎক্ষুণ্ণা চতুঃবর্ণা বিধিরন্ধ্রাৎ বিনির্গতাঃ"। গণেশের হাতে সেই

ভরাট বোল শুনে মহাদেবের শ্রীচরণ তাণ্ডবে মেতে গেল। ক্রমে ছ'টা রাগ সৃষ্টি হল। শিষ্যও জুটে গেল। তার মধ্যে নারদ মহতী বীণা কাঁধে তুলে নিলেন; ভরত নাটক সৃষ্টি কল্লেন; হুহু আর তুম্বুরু (যিনি তানুপুরা সৃজন করেন) এঁরা যন্ত্রবাদনে শ্রেষ্ঠ হ'লেন, রম্ভা যিনি পার্ব্বতীর নিকট নৃত্য শিখে, লাস্য নাম দিয়ে, যৌবত আর ছুরিত শেখাতে লাগলেন। এই রকম ১৮ জন সংহিতাকার, এঁরা সঙ্গীতের বিজ্ঞান লিখ্‌তে লাগলেন। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ, কটীর পর আর কোন মিঞার দেখা নেই। সেই কতদিনের কথা হ'য়ে গেল, সেই বিজ্ঞান আজও চলে আস্‌ছে। সেই গমক, সেই মূর্চ্ছনা, সেই তান, সেই অলঙ্কার। সেই ছত্রিশ রাগিণী, তারা হল স্ত্রী; আর ভারতের ৪৮টী রাগিণী তারা হল পুত্র। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে পূর্ণাবতার, তখন ১৬০০ গোপী এক একটী করে রাগিণী সৃজন কল্লেন। ইন্দ্রসভায় গন্ধর্ব অপ্সরারা ভরতের নাটক, দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে এনে অভিনয় দেখিয়ে দিতেন। তারপর সকলকে জলযোগ রূপ অভিযোগ করিয়ে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিতেন। এখনকার মত সকালে সকালে অভিনয় শেষ হোত না।

তারপর ব্রহ্মা চারখানি বেদ ও চারখানি উপবেদ রচনা করেন; তার মধ্যে গন্ধর্ব্ব বেদ অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্র (যাকে আমরা গন্ধর্ব্ব বিদ্যা বলে থাকি) সামবেদ থেকে তুলে নিলেন। মা সরস্বতী সুকুমার ললিতকলা একচেটে করে দখলে রাখলেন। তাঁর কৃপা না হ'লে আর ডবল প্রমোশন পাবার উপায় নেই।

ভগীরথ শাঁক বাজিয়ে গঙ্গা আনেন; লব কুশ বীণার তারে ঘা মেরে সুর ছেড়ে বাল্মীকির শিক্ষায় রামের সাম্‌নে রামায়ণ গান করেন। রাবণ রাবণাস্ত্রম বলে বেহালার মত যন্ত্র সৃষ্টি করেন; তবে সেটা কার সময়ে, টপ্‌কে ওপারে নিয়ে নাম পাল্‌টালে, তার কিছু হিসেব যদি কারুর জানা থাকে, তা'হলে ব'লবেন। মহাভারতে লেখে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জ্জুনের দেবদত্ত; যা শুনে শত্রুরা স্তব্ধ হ'য়ে যেত, নকুলের সুমেধা, আর মহাদেবের মণিপুষ্প ও অন্যান্য যন্ত্র, এসব যুদ্ধের সময় বাজ্‌তো। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী, যা শুনে যমুনা নেচে উঠতো, গোপীরা গৃহকাজ ভুলে যেত। দেবরাজের দেখাদেখি ভারতের রাজাদের নাট্যশালা ও সঙ্গীতশালা যে ছিল, মৃচ্ছকটীক ও মালবিকাগ্নিমিত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

তারপর অনেকটা সময় বাদ দিয়ে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা যখন আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয় ও তারপর যখন ১৩১০-এ সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক কফুর এদিকটা জয় করতে বাকী রাখলে না, তখন এখানে গানবাজনাটা উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে। কতকটা লুটেপুটে নিয়ে যখন কাফুর ঘরে ফিরে যায়, তখন রাস্তায় এত সুবিধে ছিল না, রেলও ছিল না; কাজেই সৈন্যাদির কষ্ট লাঘব করিবার জন্য অনেক গাইয়ে গুণী ও হিন্দু-সঙ্গীতের আচার্য্যদের সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। তবে তাদের ফেরবার খবর আর পাওয়া

য়ায় নি। ১৪৮৬-১৫২৬ এ গোয়ালিয়রে রাজা মান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও সৌখিন সমজ্‌দার ছিলেন। ধ্রুপদ যে ঢংয়ে চলে এসে আজও পর্য্যন্ত গাওয়া হ'চ্ছে, এটা তিনিই সৃষ্টি করার প্রধান উদ্যোগী। ১৫৫০-১৬০৫ আকবরের সময় সঙ্গীতের খুব উন্নতি হয়। অদৃষ্ট যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন প্রতাপ দাপ্‌টে বেড়ায়; ভয়, ভক্তি, ভালবাসাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে দলে আনে। হরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেন, আকবরের সভার নবরত্নের একটী রত্ন, যার জলুস এখনও বর্ত্তমান আছে; তবে কি পরিমাণে, তা বোঝাবার আবশ্যক হলে, টোড়রমলকে এসে হলফ কর্‌তে হয়। তবুও যা পাচ্চি তাহাতেই প্রাণ ভরে আছে।

কাশ্মীরের রাজা জইনউল আবিদিন, ইরাণ ও তুরান থেকে ওস্তাদ আনিয়ে সভা আলো করে ব'স্‌তেন।

গোয়ালিয়রের রাজা মান ও তাঁহার পুত্র বিক্রমজিতের সময়ে ছিলেন বক্‌সু, যিনি নায়ক উপাধি পান; যেটী তানসেনের ভাগ্যেও ঘটেনি।

পারস্যের বিখ্যাত কবি খসরু, যিনি আলাউদ্দিনের সময় ভারতে এসে পড়েন, একদিন দিল্লীতে মায়ফেলে, দক্ষিণী ওস্তাদ নায়ক গোপালকে সঙ্গীত-সংগ্রামে হারিয়ে দেন। হিন্দুদের ৭২ রকম বীণের মধ্যে ত্রিতন্ত্রী বীণাকে সেতার নাম দিয়ে বাজাতে সুরু করেন, আর রাগাদির ১২ মোকাম ধার্য্য করেন। তারপর পরবর্ত্তী ওস্তাদেরা ২৪ শোভা আর ৪৮ গুস্যায় ভাগ করেন। তাঁরই চেষ্টায় ত্রেবট, তেরাণা, গজল, রেক্তা, কওল, কোলবাসা, গুল্‌নক্‌স প্রভৃতির চলন হয়। একবার তানসেনের সঙ্গে বাদসার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি রেওয়ার অধিপতি রাজারামের কাছে চলে যান; ফের আকবরের হুকুমে চলে আস্‌তে হয়; তবে রাজারামের কাছে যে যত্ন খাতির পেয়েছিলেন, সেরকমটী কোন ওস্তাদের বরাতে কখন ঘটেনি। এক ক্রোর টাকা বক্‌সীস্‌, তার উপর খানিকটা পথ রাজারামের কাঁদের পাল্কীতে চড়ে। সেই পর্য্যন্ত তানসেন ভাল হাতে আর বাদশাকে সেলাম করেননি। এমনই মনের তেজ। তার কারণও ছিল। ৩৬ জন গুণী গোয়ালিয়র, মশাদ, তাব্রিজ, আর কাশ্মীরের ওস্তাদেরা আকবরের সভায় ঝাড়লণ্ঠনের মত শোভা পেতেন; তার মধ্যে তানসেন ও তাঁহার পুত্র তানতরঙ্গ পড়েন। রাজারামের পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত হ'লে বক্‌সু কলীন্‌জয়ের রাজা কিরাতের কাছে চলে যান। তার পর আবার (১৫২৬-১৫৩৬) গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট থাকেন। রামদাস ও মহাপাত্র দুজনেই লখ্‌নৌতে ইসলেমসার কাছে ছিলেন, পরে আকবরের সভায় যান। মালোয়ার রাজা রাজবাহাদুর, ইনি বাজখাঁই ঢংয়ের সৃষ্টি করেন। বীরমণ্ডলখাঁ, ইনি সুরমণ্ডল বাজাতেন। কাসিম, যিনি কুবুজ ও রবারের মাঝামাঝি একটা যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে বাজাতে আরম্ভ করেন। আকবরের সময়ে কত যন্ত্র বাজতো, আইনীতে তার উল্লেখ আছে।

বিহার ত্রিহুটের রাজা শিবসিংহের সময়ের বিদ্যাপতির গানও আকবর শুনে কাণ পবিত্র করেছেন। এই সময়েই মীরার গানের প্রসিদ্ধি ছিল। ইতিহাস বলে, আকবর তাও কোন সুযোগে শুনেছেন। রামদাসের পুত্র সুরদাসের ১২৫,০০০ বিষ্ণুপদী এই সময়ে রচনা হয়। তার পর জাঁহাগীরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭) জাঁহাগীর দাদ, ছত্রখাঁ, পারউইজদাদ, খুরমদাদ, মাখু, হামজান, (তুলসীদাস কবি এই সময়ে মারা যান) এই সব ওস্তাদের নাম পাওয়া যায়। তারপর সাজাহানের সময়ে জগন্নাথ কারবাই উপাধি লাভ করেন, সইরাংখাঁও ছিলেন। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর জামাতা লালখাঁ "গান সমুন্দর" উপাধি পেয়েছিলেন। জগন্নাথ ও দইরং ওজন ক'রে রূপা ও ৪৫০০ করে টাকা বক্‌সীস পেয়েছিলেন।

তারপর গানবাজনার হিরণ্যকশ্যিপু আওরাংজেবের হুকুমে দরবারে গাইয়ে বাজিয়ের দুর্ভিক্ষ হল। একদিন সব ওস্তাদে মিলে মতলব করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একটা কফিন কাঁধে করে বাদসার বার দেবার জানালার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন যে "রাগ রাগিণী মরেছে," "আমরা তাকে গোর দিতে নিয়ে যাচ্ছি।" এই কথা শুনে বাদসা খুসী হয়ে বল্লেন, "বেশ, খুব গভীর করে গোর খুঁড়ো, খরচা যত লাগে আমি দেব; দেখো যেন ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি কাণে না পৌঁছায়, তাহ'লে বড় ভাল হবে না কিন্তু।"

আওরাংজেবের পর (১৭০৭-১৭৫৭)-১০ জন সম্রাটের সময়টা বড় মন্দ ছিল না। শেষ সম্রাট মহম্মদ সা খুব সৌখিন ছিলেন। তাঁর সময়েও ভাল ভাল গুণীরা দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে জড়ানো অনেক গান আমরা শুন্‌তে পাই। এই সময়ে শোরীর ভনিতা দেওয়া গান হোসেন গোলামনবী রচনা করে গাইতে সুরু করেন। তবে একটা সুখের কথা, মুসলমানেরা সঙ্গীতের পুস্তক কেউ বড় একটা লেখেননি, কেবল মির্‌জা খাঁ "তোক্‌তুল্‌ হিন্দ্‌" লেখেন। তখনকার সঙ্গীত এখনও পর্য্যন্ত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলে চলে আস্‌ছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হতে বহু ধর্ম্মসংস্কারক গীতি-সাহিত্যের মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছেন। তার মধ্যে কবীর (১৩৮০-১৪২০) সেকেন্দর লোদীর সময়ে হিন্দিতে ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক গান রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার বীরভূমে জয়দেব সংস্কৃতে গান রচনা করেন। ১৪৯৬-এ শিখগুরু নানক গান রচনা করেন। ১৫৪৪-এ দাদু আমেদনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৯-এ তুকারাম মারাঠী পদ্যগীতি রচনা করেন। বিদ্যাপতির সমসাময়িক বীরভূমের ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস বাংলা কীর্ত্তনের মূল গান রচনা ক'রে সাহিত্যের গৌরব সম্পদ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ১৪৮৬তে বাংলার নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাবের বাণ ডাকিয়ে গেছেন, সে কথা বল্‌তে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না হলে বলা চলে না।

আরও দুচার জন বিলাতী পণ্ডিত যাঁরা ২।১০ দিন ভারতের গানবাজনা শুনে কলম ডেলে গেছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন হ'চ্ছেন Capt Willard। তিনি বলেন, পাছে ৬ রাগ ৩৬ রাগিণী ছাড়া অন্য অন্য রাগিণীর লোপ হয় বলে পরবর্ত্তী রাগিণীরা পুত্র আখ্যার জাতে উঠছে, আর খামখেয়ালী নাম দেওয়া হয়েছে। রাগের সঙ্গে রাগিণীর কোন মিল নাই। ভৈরবের ছয় পত্নী, ভৈরবী, টোড়ী, রামকেলী, গুণকেলী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী। মিল খুঁজতে গেলে ভারতের মাটীতে জন্মগ্রহণ করতে হয় একথা আগে বলেছি, তবে একটু ঘুরিয়ে। এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। সঙ্গীতজ্ঞ গুণীদের ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা ঃ

১ম। নায়ক—যাঁর প্রাচীন (যন্ত্র ও কণ্ঠ) সঙ্গীতে পূর্ণ অধিকার আছে, দুই অংশে অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধ ও উপপত্তিকে যিনি ক্ষমতাসম্পন্ন।

গীত, সুগীত, ছন্দ প্রবন্ধ, ধুয়া ও মাঠা সব জানেন ও উপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ, দুয়েতেই আচার্য্য বলে খ্যাত।

২য়। গন্ধর্ব্ব—দেশী ও মার্গ দুই জানেন।

৩য়। গুণী বা গুণকার—যিনি কেবল দেশী জানেন।

৪র্থ। কলাবন্ত—ধ্রুপদ ত্রিবট ইত্যাদি গায়িতে জানেন।

৫ম। কওন—তেরেণা খেয়ালাদি গায়িতে পারেন।

৬ষ্ঠ। পণ্ডিত—যিনি কেবল সঙ্গীতের উপপত্তিক অংশ জানেন।

এমন সব লোকেরা গান বাজনা শুন্‌লে বা তাদের কাছে বসে থাক্‌লে তবে কিছু বোধগম্য হয়। তারপর শিক্ষা না হ'লে আচার্য্যের বেদীতে বসে ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা পৌছায়, নৈলে নয়।

তখন—সূর্য্যের কিরণকে বিশ্লেষণ করলে যেমন লাল নীল হল্‌দে এই তিনটে রং ধরা পড়ে; সেই রকম প্রত্যেক ধ্বনি বা আওয়াজ যা আমাদের কাণে পৌছায়, তার ভেতর প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম অর্থাৎ সা গা পা এই তিনটী সুর বোঝা যায়, তাকে সম্বাদী বলে।

দেহের গঠন যেমন সাত ভাগে বিভক্ত যথা—মেদ, মাংস, মজ্জা, অস্থি, শুক্র, বসা ও শোণিত। ওদের Alex Macalister বলে, ৬ রকম ঃ—Skeletal Muscular, Nervous, Digestive, Circulatory and Genitourinary। তবুও আমরা এক ডিগ্রি ওপরে আছি. সেইরূপ সাতটী স্বরের উৎপত্তি বোঝায়। ইউরোপে যেমন Major, minor আর semitone বলে, আমাদেরও তেমনই সা মা পা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চারশ্রুতির সুর, রেধা ক্ষত্রিয় ৩ শ্রুতির, ও গান ২ শ্রুতি সুর ব'লে বৈশ্য নাম রাখা হয়েছে। বিকৃত অর্থাৎ কোন সুরকে পতিত বা শুদ্র বলা হয়। আবার এক এক সুর থেকে এক

এক রাগ সৃজন হয়েছে যথা ঃ—সা থেকে ভৈরব, রে থেকে মালকোষ, গা থেকে হিন্দোল, মা থেকে দীপক, পা থেকে মেঘ, ধা থেকে শ্রী, কেবল নি'টী ভীষ্মদেব। কোন্ কোন্ প্রাণীর আওয়াজ থেকে কি কি স্বর বা সুর নেওয়া হয়েছে, তার কথারও হিসাব আছে, যথা ঃ

সা—ময়ূর মতান্তরে গর্দ্দভ
রে—ষাঁড়
গা—ছাগল মতান্তরে গাভী, ভেক।
মা—শৃগাল মতান্তরে ভেক
পা—কোকিল
ধা—ঘোড়া
নি—হাতী।

আবার এ সাতটীর বর্ণ আছে, যথা ঃ

সা—কৃষ্ণ বর্ণ
রে—ধ্রুম্র বর্ণ
গা—কনক বর্ণ
মা—শাদা বর্ণ (কুন্দফুলের ন্যায়)
পা—পীত বর্ণ
ধা—ধূসর বর্ণ
নি—হরিৎ বর্ণ

ভাল ছবিতে রকমারি রঙ্গের সমাবেশ দেখ্‌লে যেমন চোখের যুৎ আসে, সেই রকম রাগাদির সুরের সমাবেশ যদি নির্ভুল হয়, তাহ্‌লে কাণের ও মনের শ্রীসৎ এসে আরাম হয়, যেমন ভাল ছন্দের কবিতা বা গান। উচ্চারণ মিল থাক্‌লে তা কি মাত্রা ছন্দে, কি অক্ষর ছন্দে, শ্রুতি মধুর না হ'লে ভগ্ন ছন্দ, ভগ্নবৃত্ত, যতিভ্রষ্ট বা ভগ্নযতি হয়ে পড়ে। লয় দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত, মোটামুটী এই তিন প্রকার। তারপর দ্রুতমধ্য, দ্রুতবিলম্বিত ও মধ্য বিলম্বিত। দীর্ঘস্বর হ'লে গুরু যথা ঃ আ ঈ উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ আর হ্রস্ব স্বর হ'ল লঘু ঃ—অ ই উ ঋ ৯। সঙ্গীতে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত, ৫ রকম মাত্রার উচ্চারণ আছে। কবিকল্পদ্রুমকর্ত্তা বোপদেব বলেন, ছন্দ ধাতুর অর্থ সম্বরণ। ভাবরস অলঙ্কার যখন কবিতার ভাষায় এক পরিচ্ছদে রচিত, তখন ছন্দঃ নাম পায়। সঙ্গীত হলে মাত্রা তালের হিসাবে ঢক্‌কে ঢক্ বজায় থাকে। "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল বাঘ বিস্তর" ইত্যাদি ভাল গাইয়ের মুখে, বাহার বাগেশ্রীতে শুন্‌লে রাগ বজায় থাকে বটে, তবে শ্রুতিমধুর হয় কি? তবে সেই সুর যদি কোন মনোমদ ছন্দে বসে, তাহ'লে ইষ্টদেবতার ধ্যানে বসে সোণার নুপুর পরিয়ে

দিতে পাল্লে, মনে যে আনন্দ হয়, মনের ভেতর অনাহত নাদের যে ক্রিয়া হয়, ঠিক সেই রকমটা হয়।

এক একটী গানে যেমন মাত্রার হিসাবে তালটী মাখাচোখা হয়ে বসে যায়, বাজিয়ের কোন কষ্ট হয় না, যারা শুন্‌নে-ওয়ালা, তারা বেশ বুঝতে পারে। কোন্‌টা চৌতাল, কোন্‌টা ধামার, কোন্‌টা ঝাঁপতাল, তেওরা, কাওয়ালী, একতাল যৎ ইত্যাদি। একাক্ষরা সমান মাত্রা শ্রীদুন্দদ্ব্যক্ষরা কন্যা এসব তৃতালীতে বেশ খাপ খায়। দুধারে গুরু মধ্যে লঘু মৃগীচ্ছন্দ তিন-অক্ষরা, ঠিক যেন সেতারের ডেড়ি চলেছে। ডারাড়া এও তৃলালী, চার অক্ষরে সতীচ্ছন্দ ঝাঁপতাল ৫ মাত্রা। পঞ্চক্ষরা—পংতিচ্ছন্দ সুরফাক্তা—প্রিয়াচ্ছন্দঃ ত্বরিত্যাত্রিচ্ছন্দঃ।

ছয় ক্ষরা—গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ১০ মাত্রা শশিবদনা চ্ছন্দঃ সোমরাজি চ্ছন্দঃ।

৮ ১০

সপ্তক্ষরা—উষ্ণিক্ মধুমতীচ্ছন্দঃ ৮মাত্রা ৬ + ১

ল গু

অষ্টাক্ষরা—মানবক—গজগতি, সমানিকা, বিদ্যুন্মালা।

নবক্ষরা—বৃহতীচ্ছন্দঃ

দশাক্ষরা—পঙক্তিচ্ছন্দঃ, তরিত্যাতিচ্ছন্দঃ

একাদশাক্ষরা—উপেন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ

দ্বাদশাক্ষরা—তোটকচ্ছন্দঃ, ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দঃ, কুসুমবিচিত্রাচ্ছন্দঃ

ত্রয়োদশাক্ষরা—চণ্ডীচ্ছন্দঃ

চতুর্দ্দশাক্ষরা—বসন্ততিলকচ্ছন্দঃ, প্রহরণকলিকাচ্ছন্দঃ

পঞ্চদশাক্ষরা—শশিকলাচ্ছন্দ, তৃণকচ্ছন্দঃ

ষোড়শাক্ষরা—পঞ্চচামরচ্ছন্দঃ

সপ্তদশাক্ষরা—শিখরিণীচ্ছন্দঃ পৃথ্বীচ্ছন্দঃ, মন্দাক্রান্তা হরিণীচ্ছন্দ ঃ

ঊনবিংশত্যক্ষরা—শার্দ্দুলবিক্রীড়িত চ্ছন্দঃ

বিংশত্যক্ষরা—গীতিকাচ্ছন্দঃ

একবিংশত্যক্ষরা—স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ

বাংলা ভাষায় কবিতার অঙ্গে, পাকা হাত না হলে এসব চ্ছন্দ বসান বড় শক্ত কাজ, তবে গানে কতক বসে। এইরূপ ক্রমে অনেক দীর্ঘচ্ছন্দ আছে, তবে আমাদের সঙ্গীতে তার বড় অধিক ব্যবহার নাই।

চ্ছন্দোগ্রন্থে নন্দোৎসব আছে। আবার প্রথম চরণের সঙ্গে তৃতীয় ও দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে চতুর্থ চরণের মিল আছে, তাকে অর্দ্ধসমবৃত্ত বলে, আর যে রূপ চ্ছন্দে প্রত্যেক

চরণে লঘু, গুরু এবং বর্ণসংখ্যা নানা রকমের ব্যবহার হয়, তাকে বিষমবৃত্ত বলে, তা সঙ্গীতে চলে না।

ভাল ভাল যন্ত্রীর রাগালাপের পর জোড় যখন চলে, বা তালপরণ বাজে, তখন ছন্দের নানা প্রকার কায়দা শোনা যায়। মৃদঙ্গের সঙ্গতে, অর্থাৎ যখন ধ্রুপদ গাওয়া হয়, তখন যাঁরা ভাল সঙ্গত জানেন, তাঁরা অস্থায়ীতে এক ছন্দের বোল, অন্তরাতে অন্য ছন্দের বোল, সঞ্চারীতে ডেড়ী ও আভোগে তার দুনের বোল বাজান, তখন ছন্দের নানা রকম বোল কাণে লাগে।

সেইরূপ উৎকৃষ্ট দক্ষ অভিনেতার এক এক পংক্তির আবৃত্তিতে এক এক রাগে এক এক পরিচ্ছেদের কথা, ভাব ও তাহার অর্থবোধ হ'য়ে যায়। গিরীশ বাবুর মুখে যাঁহা "আমরা সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, আহা হা" শুনছেন, তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারবেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুর মুখে "I am sorry রাজা" ও ঠিক সেই রকম। কবি প্রাণের ভাষায়, মনের আবেগে যখন গেয়ে ওঠেন "ব্যথা হারী বলে হরি ভালবাস কি হে ব্যাথা দিতে।" সঙ্গীতাচার্য্য যখন জয়জয়ন্তীর দুখানা গান্ধার পাশাপাশি বসিয়ে প্রাণের করুণ তন্ত্রীর কোমলতা নিঙড়ে টেনে বার করেন, তখন যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। সেখানে সাজান বাগান "Sorry" আর "ব্যথাহারী" নয়টী রসের মধ্যে করুণটা একচেটে করে বসে থাকেন। তবে শোনবার মত করে শুনতে হয়; আর যিনি লিখতে জানেন, তিনি লেখবার মত করে লিখতে পারেন। প্রাণ ঢেলে লিখলে তাতে কথা যাঁর কৃপায় বসে, তাঁরই কৃপায় চারিপাশে সমাবেশ উৎকৃষ্ট রকম হইয়া যায়। তবে যেখানে নিছক ভাষার কারদানি, ভাব ও চিন্তা সেখানে বাড়ন্ত! আবার দেখা যায় ভাব ও চিন্তা ভাষার মুখাপেক্ষী। ভাব ও চিন্তাকে চলবার পথ করে ভাষাকে মটরে চড়তে দিতে নেই, বরং ভাষাকে পথ করে ভাব ও চিন্তাকে স্বাধীন করা উচিত। তাতে কাজ বেশী হয়। সেই রকম গানের পক্ষে বলা চলে, নাটকের পক্ষেও বলা চলে। আগে পরিকল্পনা, তার পর যথাসমাবেশ; তাহলেই আলোছায়ার নিবেশ আসে, তার পরই সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন রং-চড়ানোর ওস্তাদি দেখলে নয়ন মন পুলকিত হয়। একেই বলে অন্তরবাহ্যের সমীকরণ। তখন নকল আসলের ফারাক্ বুঝতে বিলম্ব হয় না। তখন আসলের পাশে নকলকে দাঁড় করালে পোড়ার গড়ন বলে চেনা শক্ত বলে বোধ হয়।

কথক ঠাকুরের মুখে গাধির পুত্র শকুনির কথা শুনে এসে, সাবেক যাত্রা অধিকারীরা পালা বেঁধে যখন গেয়ে গেছেন, তখন শকুনি ঠিক গাধিকা বাচ্ছা, আবার যখন নাট্যকার মহাভারত পড়ে শকুনির চেহারা এঁকেছেন, তখন শকুনির সৌবল, ধৃতরাষ্ট্র শ্যালক, কুরুপতি দুর্য্যোধনের মাতুল ও কুরু সাম্রাজ্যের কর্ণধার।—পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতির স্রষ্টা। সে শকুনি রাজনীতির অবকাশে

কূটনীতি শিখাইতেছে, তরল সরলতার আবরণে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে, প্রতিহিংসার অবসরের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি কৌরবীয় মহাবীরগণ অন্ধের ন্যায় শকুনির অঙ্গুলি হেলনে চালিত।

গুপ্তমন্ত্রণা অবসানে দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন চলিয়া গেলে মনে মনে চিন্তারঙ্গের অভিঘাতে শকুনির হৃদয়ের গুপ্ত কথা নাট্যকার যখন বহু আয়াস-গঠিত অধীত গ্রন্থের সম্যক বিচারফলে চরিত্র রচনা করিলেন, তখন শকুনি বলিয়া উঠিল ঃ—

কৌরব কল্যাণ প্রিয় সৌবল মাতুল
রহ স্থির কিছু দিন আর;
কঠোর দশন রহ তর্ক প্রহরী,
লেলিহান রসনায় রাখ সাবধানে,—
নিগড়ে আবদ্ধ করি।
অসতর্ক মুহুর্ত্তের সুযোগ-প্রয়াসী,
প্রতিহিংসা সতী!
রাখ মোরে তোমার চরণতলে,
কি কহ ভামিনী? ধর্ম্ম?
সে তো ভীরুতার অন্য নাম,
অন্য আবরণ।
কি বলিলে, পুণ্য?
হাহা হাহাঃ কিবা রূপ তব?
স্বার্থের নৃমণি তুমি প্রিয় সহচর।
পুণ্য, পুণ্য, এত কি গরিমা তায়?
পুণ্যপ্রিয় নর সে তো কাপুরুষ,
শঙ্কিত সন্দিগ্ধমতি,
সচ্ছন্দতা মনের কোথায় তার?
পুণ্যের প্রতাপে
দুর্ভাগ্যের নিপীড়ন ঘোর।
মিথ্যা, মিথ্যা,
শুধু উন্মাদ প্রলাপ ব্রাহ্মণের!
পুণ্য আলো, পাপ অন্ধকার,
কবির কল্পনা কাব্যের ললিতকথা
মাধুর্য্য ভাষার,
রাখ কবি সঞ্চিত করিয়ে তব,

ভাষার ভাণ্ডারে।
বিস্তৃত সাম্রাজ্য যার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
হয় আন্দোলিত, কর্ণধার সম্রাটতরীর,
তার কাছে দুর্ব্বল বিপ্রের ভাষা,
হতে পারে শ্রুতিসুখকর।
বংশধরগণ হেতু মম অভিধানে,
না রহিবে ভীরুতার প্রশ্রয় দানিতে।
পিতা, পিতা, অশরীরী ইষ্টদেব!
যদি থাক কোন লোকে,
দেখ বসি বংশধর রাজনীতি।
যত দণ্ড, যত পল ছিলে অনাহারে,
গণনায় তত অরি করিব নিধন।
পাণ্ডবকণ্টক করি সহায় সমরে,
কৌরবকণ্টক নাশ করিব সমূলে
ধনঞ্জয় শিবের ললাটবহ্নি
রাখ প্রহরণে;
বৃকোদর গদায় বাঁধিয়ে রাখ,—
ইন্দ্রের অশনি,
ভস্ম হবে কৌরবীয় চমূ।
অনুনয় কেন অন্ধরাজ?
কি বলিলে, ভগিনীর স্নেহ?
তাই বধিলে পিতারে তার,
অনাহারে ফেলি কারাগারে!
পতিব্রতা রমণীর স্বামী তুমি,
পত্নীঋণ শুধিয়াছ ভাল।
গান্ধারী বেঁধেছে বাস নয়নে তাহার।
স্বাধ্বী সতী ভগিনী আমার
কত দুঃখে ঢেকেছে নয়ন।
যুধিষ্ঠির যথার্থ সম্রাট তুমি,
রহ বাপু আর কিছু দিন,
কৌরবের চিতাভস্ম ধৌত করি,
সহস্তে মুকুট আমি পরাব তোমায়।

ভীষ্ম কি দেখ আমার পানে,
কাতর নয়নে?
চিন্তা কি গাঙ্গেয়?
করায়ত্ব মরণ তোমার।
কি বলিলে, পাণ্ডবের পিতামহ তুমি,
যুধিষ্ঠির রাখিবে তোমায়।
আছে কেশব সচীব,
শিখণ্ডী পাণ্ডব পক্ষে আছে কি স্মরণে?
কি কহ মুরারী সহদেব বধিবে আমায়
তত দিনে কেহ না রহিবে
কৌরবের বংশে বাতি দিতে
হাঃ হাঃ হাঃ
মৃত্যুর অপর পারে মহা-সম্মিলন।

ইহাও ছন্দঃ ইহাও সঙ্গীত; ইহাতেও সুর তাল সব বজায় আছে; তবে বলিবার ও শুনিবার প্রকারভেদ। ধেরে-কেটে ধরেকেটে ধেধেব ধেরে কেটের গম্ভীর মৃদঙ্গের ধ্বনি লীলায়িত ছন্দের আবৃত্তি মুখে উপগীয়মান।

শিক্ষাতত্ত্ব

শ্রী কালীরঞ্জন লাহিড়ী

শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে হইলে ইহার সহিত সামাজিক তত্ত্বের যে নিগূঢ় ওতপ্রোত সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না; কারণ সকল শিক্ষারই কোন না কোন একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে—যে উদ্দেশ্যে মানবসমাজের অথবা ব্যক্তিগত-জীবনের একটা বাস্তব অভাব দূর করিতেছে; তাহার সমস্ত পার্থিব· ব্যক্তিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাধনোপযোগী পথাভিমুখে কর্ম্মপ্রবণ করিয়া তুলিতেছে। এই সামাজিক অভিব্যক্তি কোন্ মূলভিত্তির উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সম্মুখে এইরূপ পূর্ণতার প্রবঞ্চনা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহা নানাবিধ উপায়ে মনীষিগণকর্ত্তৃক বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও অনন্ত বিরোধের ভিতর সামঞ্জস্য আনয়নে সকলের চেষ্টা বিফল করিয়া, চলিয়া আসিতেছে। এই সকল মতবাদের ভিতর যে কোন একটী সম্পূর্ণ অসত্য ও অপর একটী সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, এরূপ সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ মতালম্বিগণও সহসা তাহাদের ন্যায়বুদ্ধির উপর গুরুতর আঘাত না করিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। সামাজিক-তত্ত্বের উপর শিক্ষা স্থাপিত হইবে, ইহা লইয়া তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কোনদেশে কোনরূপ প্রকাশ্যভাবে মতদ্বৈধ হইতে দেখা না গেলেও, এই বিরোধের অস্তিত্ব ভারতে ও ইউরোপ-মহাদেশে গৌণভাবে লক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুর বেদ ও উপনিষদে যেরূপ ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্বতঃই মনে হয় মানবের নিজের ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য-রক্ষাই সমস্ত জীবনের ও শিক্ষাজ্ঞানের চরম নিশ্রেয়স উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রভাব যেন কাল ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক সাহিত্যে মানবের সামাজিক সত্ত্বারই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার ঐকান্তিক প্রয়াস উপলব্ধি হয়। এরূপ শিক্ষাতত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন কেবল জনৈক দার্শনিক লেখকের কল্পনাপ্রসূত স্বীকার করিলে জগতের অনন্ত রহস্য কিয়ৎ পরিমাণেও উদঘাটিত হইতে পারে না। জনসাধারণের অব্যক্ত প্রয়োজনেই ক্রম-বিকাশের অনুকূল পথে মানবকে অজ্ঞাতসারে লইয়া যায়। উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ যখন ভারতবাসীকে নিতান্ত একঘরে করিয়া তুলিয়াছিল, যখন উহার পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও প্রাণের অব্যক্ত পিপাসা মিটে নাই, তখন অধ্যাত্মবাদের জড়তা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে সমাজের ভিতর অস্ফুট প্রয়াস অতি গোপনে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের দিকে অলক্ষ্যে সেই বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছিল। সেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক স্ফুরণ সাহিত্যের আকারে পৌরাণিকতত্ত্বে নিবিষ্ট হইতে দেখা দিলে, জনসাধারণ তাহাকে আদরে বরণ করিয়া লইল। ইউরোপ-

মহাদেশে জড়বাদী সফিষ্টদিগের ব্যক্তিত্ববাদ যখন প্রত্যেক গ্রীকবাসীর স্বার্থাভিমানকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছিল, তখনও যেন গ্রীক-আকাশে একটা অভাবের নিবিড় ছায়া সমস্ত গৌরবের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। আরিষ্টটলসেই অভাবটা বিশ্লেষণ করিবার জন্য বোধ হয় গ্রীস-দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম আসিয়া কহিলেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ হইতে মানুষের ভিন্ন সত্ত্বা সম্ভব নয়। এই দেববাণী তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। মধ্যযুগের শেষদিক হইতেই জনসাধারণের ভাবস্রোত যেন একটু ফিরিতেছে বোধ হইতেছিল এবং বিপ্লববাদীদের সত্বরাগমন সূচনা করিতেছিল। সমাজ ব্যক্তির পূর্ব্বগামী, নানা কারণে এই ধারণা জনসাধারণ আর কিছুতেই পোষণ করিতে পারিতেছিল না। নিশ্চয়ই রাজনীতির অপব্যবহারেই এরূপ বিপুল বিপ্লবের অনুষ্ঠান হইতে চলিতেছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। লেভিয়া-থান গ্রন্থে হবস্ যখন প্রথম প্রকাশ্যভাবে ব্যক্তির প্রাকৃতিক-স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, যখন সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষের স্বার্থসাধনার প্রয়াসের পরিণাম বলিয়া সূচিত হইল, সেইদিন হইতে সমস্ত ইউরোপ-মহাদেশে একটা বাস্তব অভাবের অনুভব সকলকেই বিচিন্তিত করিয়া তুলিতে লাগিল। বিশ্বদ্রোহী রূসো তাহার সমস্ত প্রতিভা ফরাসীরাজ্যের অননুভূত পিপাসাকে দুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলিল; তাঁহার অভিনব শিক্ষাতত্ত্ব মহাবিপ্লবকারী সমাজতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। মানবই সমাজ বা রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ামক: মানুষ উহার সৃষ্ট বা দাস নহে; সমাজ মানবের জন্য, মানব সমাজের জন্য নহে; এই ধারণাই হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবের স্রোত প্রধানতঃ ফরাসীর নীতি, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া এতদূর আঘাত করিয়াছিল যে, তাহার অনুভূতি সমস্ত ইউরোপই অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অভিনব তত্ত্বের শক্তি এখনও সভ্যজগতে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। হিগেলের সমাজতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ যে জর্ম্মানবাসীর উপর অতিসামান্যই আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রেই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। এখনও জগতে ব্যক্তিত্ববাদেরই পূর্ণ অধিকার। সেই হেতুই Ficte, Kant, Hegel তীক্ষ্ম প্রতিভা সত্ত্বেও জাতীয়-জীবনে কোনরূপ শক্তিবিস্তার করিতে পারে নাই। যখন যে দেশে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত না হইলে কিছুতেই তাহা গৃহীত হইতে পারে না। যে শিক্ষায় জনসাধারণের হৃদয়তন্ত্রী, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার সহিত ঐক্য রাখিয়া বাজিয়া না ওঠে, সেই শিক্ষাকে কিরূপ শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিব, জানি না। শান্তিবিধায়িনী বা প্রলয়কারিণী শিক্ষা, উভয়েরই ক্ষেত্রবিশেষে যে একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। রুসোর শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব একপক্ষে জগতের এতকালের সুসজ্জিত সভ্যতার বিনাশকারী হইলেও উহা যে ফরাসীবাসীর তদানীন্তন

বাক্যহীন বিদ্রোহী ভাবসমূহের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই শিক্ষায় ফরাসীরাজ্যে বিপুল মঙ্গলের সূচনা হইয়াছিল, কি ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন।

শিক্ষায় সার্থকতা লাভ করিতে হইলে উহাকে যে অবস্থানুসারিণী হইতে হইবে, তাহাতে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। পিটারের রুসিয়ানদিগের উপর তাহার জাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ স্থাপন করিবার প্রয়াস ব্যাপার রুসো অতি সুন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন। রুসিয়া কখন প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবে না; কারণ সে যথোপযুক্ত সময়ের অতিপূর্ব্বেই সভ্য হইতে চলিয়াছে। পিটার স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রুস এখনও বর্ব্বর রহিয়াছে; কিন্তু সে যে এখনও সভ্যতালাভের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যখন রুসিয়ান্‌দিগকে যুদ্ধে অভ্যস্ত করা উচিত ছিল, তখন তাহাদিগের সম্মুখে আদর্শ ধরা হইয়াছিল। তাহাদিগকে একবারেই জর্ম্মান ও ইংরাজ করার অপেক্ষা প্রথমে প্রকৃত রুসিয়ান্‌ই করিলে অধিক ফল লাভ হইত। পিটার তাঁহার প্রজাগণকে, যাহা তাহারা হইতে পারিত, তাহা হইতে বাধা প্রদান করিলেন; এবং যাহা তাহারা নয়, তাহাই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল।

ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ববাদেরও সহিত বেদ ও উপনিষদের ব্যক্তিত্ববাদের মর্ম্মান্তিক পার্থক্য রহিয়াছে। ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব জড়বাদী। উহা রাজনীতি ও অর্থনীতির ভিতরই পর্য্যবসিত। ভারতীয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাত্মমূলক; আত্মার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই উহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ববাদ বিপ্লবকারী; ভারতীয় শান্তিময়। প্রথমটীতে পার্থিব সুখই একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়; মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতাই জীবনের আদর্শ; আর ভারতীয় ব্যক্তিত্বে পার্থিব সুখ ঘৃণার্হ, বাসনা ও প্রবৃত্তির একান্ত সংযমই উৎকর্ষলাভের একমাত্র উপায়। ফলে ইউরোপ কর্ম্মী, ভারত সন্ন্যাসী। কর্ম্মের ও সন্ন্যাসের মিলন উভয় দেশেই অভাব। ইউরোপীয়-শিক্ষার মূল-উদ্দেশ্য জ্ঞানকে সুমার্জ্জিত করিয়া ইহলৌকিক সুখানুসন্ধান করা। তদনন্তর বিষয় আলোচিত হইলেও উহা প্রতীচ্যদেশে জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেশের চিন্তা-স্রোত পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় শিক্ষা ইহার বিপরীত। ইউরোপ যেমন লৌকিক ব্যাপার লইয়াই নিবদ্ধ, ভারত তদ্বিপরীত লোকাতীত বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং কোন্ প্রণালীতে সেই শিক্ষা অনুসৃত হইবে, ইহাই এখন বিচার্য্য। ব্যক্তিত্বের সহিত সামাজিক-তত্ত্বের কিরূপ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে, ইহা লইয়া বর্ত্তমান ভারতে সবিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। মানুষ সামাজিক-সম্প্রদায়ের ভিতর নিজেকে একটা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত শব্দের ন্যায় করিয়া ফেলিয়া সমাজের অংশস্বরূপ হইয়া থাকিবে, কি নিজের স্বাধীনতা ও বিশেষত্ব রক্ষাপূর্ব্বক স্বীয় জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে সমাজের অপেক্ষা করিবে না, ইহাই

কি ভারতের গভীর সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় নাই? ভারতের বিরাট্ আকাশে যদি বিপ্লবের সূচনাই হইয়া থাকে, তবে সত্বরেই উহার মীমাংসা হইবে না—কে বলিতে পারে? অনুভূতি মাত্রই যদি জীবনের সার্থকতা হয়, তবে শিক্ষাও তদনুযায়ী প্রাকৃতিক হওয়া উচিত। যাহাতে আমাদের জীবনানুভব নির্ব্বিরোধে উহার অনুকূল বৃত্তির অনুশীলনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। আর যদি অনুভূতি সকলকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া চিন্তা এবং ইচ্ছাশক্তিতে পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পশুত্ব মোচন করাই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য হয়, তবে তদানুযায়ী শিক্ষাই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই সকল গভীর ও জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার প্রয়াস আমার এই প্রবন্ধে লক্ষিত হইবে না; এবং আমাকে উহার জন্য উপযুক্তও মনে করি না। তবে আজ এই মহতী সভার সভ্যগণকে এ বিষয়ে চিন্তান্বিত করিতে ইচ্ছা করি। এই হেতুই আমার এ প্রবন্ধের অনুষ্ঠান। বর্ত্তমান জগতের শিক্ষায় এক অপূর্ব্ব কাল্পনিক সুরম্য আনন্দময় স্বপ্ন-কুহেলিকা দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে রমনীয়তা ভেদজ্ঞানের বিশিষ্ট হেতুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ রাজনীতির আকার ধারণ করিলে এরূপ বিষময় ফলই যে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে শিক্ষার মূল-উদ্দেশ্য প্রকৃত রাজনৈতিক নগরবাসী প্রস্তুত করা, যে শিক্ষায় মিকেভেলিয়ান নীতি সমাদৃত হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে সে শিক্ষা এখনও কর্ম্মের ও সন্ন্যাসের শুভ সংযোগ ঘটাইতে আরব্ধ হয় নাই। শিক্ষা সর্ব্বদাই বহুব্যাপক। উহা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিলে কখনই মানবের জীবনের বিরাট্ রহস্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হয় না। সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রাদির গতি বা দূরত্বের নির্ণয় করিতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কিছুমাত্র সাধিত হয়? না প্রাণসংহারের সহস্র বৈজ্ঞানিক-কৌশল উদ্ভাবন কবিয়া, আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিলেই হয়? যে শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্হির্মুখীন, কেবলমাত্র সে শিক্ষায় মানুষের প্রয়োজন রাহিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইলে মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টিব আদিকাল হইতে শান্তি বা সুখান্বেষণচেষ্টা বিশ্বসমাজের প্রত্যেক স্তরেই বিপুল আয়োজনের কারণস্বরূপ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সকলই সেই শান্তি লক্ষ্য করিয়া, সেই আদিকাল হইতে সৃষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। সামাজিকশান্তি ভিন্ন লৌকিকশিক্ষার অন্য কোন প্রয়োজন রহিতে পারে না; কিন্তু এই শান্তির বা সুখের আকার কিরূপ, ইহা একটু আলোচনা করা উচিত। দুঃখের নিবৃত্তিই সুখ, কি সুখ বলিয়া একটা বিশেষ দুঃখহীনতাতিরিক্ত কোন একটী পদার্থই রহিয়াছে, এবিষয়ে বহু মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। প্লেটোর মতে, সুখ দুঃখের নিবৃত্তি মাত্র; কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তমতে সুখেরও একটা স্বতন্ত্র বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বাস্তব সুখটা কিন্তু লৌকিক শিক্ষাতিরিক্তের বিষয়ীভূত। জনসাধারণ ইহার জন্য লালায়িত হইলেও, সে শিক্ষা অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই লাভ করিয়া থাকে এবং সে শিক্ষার প্রণালী

সংসারানুরক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত দুরূহ। দুঃখের নিবৃত্তিরূপ যে সুখ, সেই সুখ লাভই লৌকিক-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। জগতের বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে অবকাশ পাইতেছে কি না, সকলে বিচার করিয়া দেখিবেন।

যখন প্রত্যেক দুঃখানুভূতি সহ সেই দুঃখ বিমোচনের বাসনা যুগপৎ উপস্থিত হয়, ও প্রত্যেক সুখানুভূতি সহ উহার উপভোগের আকাঙ্ক্ষাও এককালে মানসে উদয় হয় এবং বাসনামাত্র দুঃখের অনুসূচক, তখন জগতে সকল দুঃখের কারণ বাসনা ও বৃত্তিসকলের অসমতা ও অসামাঞ্জস্য। এই দুঃখোপনোদনের উপায় মানবের দুর্দ্দমনীয় বাসনাকে সংযত রাখিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলেরই অনুগামিনী করা;—লৌকিক শিক্ষার ইহাই মূলমন্ত্র।

এই সামঞ্জস্য সমাজের কিরূপ অবস্থায় সম্ভব হইতে পারে? যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা সম্মানিত হয় না, সেখানে এইরূপ সামঞ্জস্য আনয়ন করা সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য। প্রভুত্ব-বিস্তার সমাজের বা ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য হইলে, জগতের দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ যে বাড়িয়াই যাইবে তাহার প্রমাণ সকল জাতির ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রভুত্ব-লাভেচ্ছা অস্বাভাবিক, স্বাধীনতা রক্ষাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে প্রভুত্ব করিবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু প্রভুত্ব করিতে হইলে পরোক্ষ স্বাধীনতাই শৈশবের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা হইলেই শিক্ষার সমস্ত বিধান স্থিরীকৃত হইয়া যাইবে।

এরূপ বাসনা ও কার্য্যকারিণী-বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে সমাজের ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতর এক মহাবিপ্লব ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য নীতি বা ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ধর্ম্মশিক্ষা লৌকিক শিক্ষার পরে অনুষ্ঠিত হইবে, কি পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। Locke-এর মতে ধর্ম্মশিক্ষাই লৌকিক-শিক্ষার চরম পরিণতির একমাত্র উপায় এবং এই ধর্ম্মশিক্ষা লৌকিক-শিক্ষার পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই মত সম্পূর্ণ অবিসংবাদী বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না; কারণ কিছু মাত্র লৌকিক ও দৈহিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া কোমলমতি বালকগণ যদি ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তবে সেই শিক্ষা যে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এরূপ শিক্ষা প্রায়ই জড়বাদীর জ্ঞানাভিমানের অনুকূলস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জটিল আত্মানুভূতি বা নৈতিক-তত্ত্ব বালকের কোমল হৃদয়ে কোনরূপ রেখাঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় না। কারণ সদ্যপ্রসূত বালকের সহিত বহির্জ্জগতের সম্বন্ধ-বিশ্লেষণে সুখ বা দুঃখানুভূতি ব্যতিরিক্ত কোনরূপ অনুভূতিই পরিদৃষ্ট হয় না। যে অবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে বালকের অনুভূতি বাহ্য বাস্তব বস্তুতে আরোপিত হইতে থাকে; যে অবস্থায় ক্রমে সুখ দুঃখানুভূতি মগ্ন হইয়া পদার্থের

অনুভূতিতে পরিণত হয়, যে অবস্থায় হেতুতত্ত্ব ক্রমশঃ বিকশিত হইতে আরম্ভ করে; যে অবস্থায় নৈতিক তত্ত্বের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে; সেই অবস্থাই আত্মতত্ত্ব-শিক্ষার উপযুক্ত সময়। লৌকিক-শিক্ষায় যেমন অদৃশ্য ও অলৌকিক বিষয়ে হৃদয়ের ভাব ও চিন্তাস্রোত ফিরাইতে থাকিবে, তদনুযায়ী আত্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মশিক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ সমকালীনতা রক্ষিত না হইলে শিক্ষার সার্থকতা ও উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইতে পারে না।

লৌকিক-শিক্ষার চরম পরিণতি আত্মশিক্ষায়, এই সুত্র বহুমান্য করিয়া শিক্ষার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব সংযোজন হইতেই পারে না। সমাজতত্ত্ব ও ব্যক্তিতত্ত্বের মিলন ঠিক এইখানে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমাজতত্ত্ব কর্ম্মে নিবিষ্ট, ব্যক্তিতত্ত্ব সন্ন্যাসে আবদ্ধ। মানবজীবনের মহত্ত্বতা কেবলমাত্র একটীতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে পারে না; যেখানে কর্ম্ম করিতে হইবে এবং কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে, সেরূপস্থলে কোন একটীকে অবহেলা করিয়া একটী উৎকর্ষতা সাধন করিবার চেষ্টা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া চলিবে, সেই পরিমাণেই উভয় মিলন ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইবে। মানুষের সামাজিক-অস্তিত্ব যেরূপ সত্য, ব্যক্তিসত্ত্বাও সেরূপ সত্য। উভয়টীই সত্য না হইলে বিশ্বজগতে একই অবস্থায় আবদ্ধ জলরাশিপূর্ণ দীর্ঘিকার ন্যায় অনন্তকালব্যাপ্য রহিয়া স্বয়ং কলুষিত হইয়া যাইত।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ সমাজের বিকাশে পরিণত হয়। অবতারবাদী ভারত কি করিয়া এই দৃঢ় সত্য হৃদয় হইতে দূর করিবে, জানি না। সমাজ ব্যক্তির সত্ত্বার হেতু, এই মত বর্ত্তমান যুগে দার্শনিকগণের দ্বারা সমাদৃত ও মানবের নৈতিক জীবনের আদর্শ স্বরূপ প্রচারিত হইতেছে। এই তত্ত্ব সুপরিচিত হওয়ায় হৃদয়ে হৃদয়ে নৈতিক স্পন্দন বহুব্যাপকতা সত্ত্বেও সুস্পষ্টভাবে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না; কিন্তু এই মঙ্গলের সূচনা কি মানবগণের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শান্তি সুখান্বেষণের ব্যক্ত বা অব্যক্ত প্রয়াসের পরিণাম নহে? ইতিহাস যতদূর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইতিহাস যে দূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আলোক-বিস্তার করিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আলোকিত অন্ধকারের শেষপ্রান্তে ব্যক্তির সামাজিক সত্ত্বারই লক্ষণসমূহ প্রতিভাত হইবে সন্দেহ নাই; কারণ ইতিহাস সমাজ লইয়া, ব্যক্তি লইয়া ইতিহাসে সম্ভব হইতে পারে না; কিন্তু ইতিহাসের অন্তরালে যে ঘনান্ধকার ঐতিহাসিক গবেষণায় সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে, সে রাজ্যের ছবি মানসপটে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিলে ব্যক্তি সত্ত্বারই প্রভাব যেন অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়ে; রাষ্ট্র বা সমাজ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরই একটী রাষ্ট্র বা সমাজের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়; দেখা যায় মানব যথেচ্ছ স্বাধীনতায় দ্বন্দ্ববিরহিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই প্রাকৃতিক পূর্ণ-স্বাধীনতায় কিরূপে সমাজের

শৃঙ্খল সে স্বাধীনতা সঙ্কোচিত করিয়া তুলিল, এ বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য ব্যক্তির দুর্দ্দনমীয় বৃত্তি সকলকে সংযত রাখিয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রেরণা করা; তদতিরিক্ত বিষয়ে সামাজিক-তত্ত্বকে ব্যক্তির তত্ত্বের উপর কোনরূপ অধিকার বিস্তার করিতে দেওয়া উচিত নহে। মিলের হিতবাদ সমাজ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, বেদান্তের অধ্যাত্মবাদ ব্যক্তিতত্ত্বের উপর স্থাপিত; কিন্তু ব্যক্তিতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের বীজস্বরূপ। সেই হেতুই বেদান্তের ব্যক্তিতত্ত্ব জগতের সমস্ত দার্শনিক-তত্ত্বের কেন্দ্রস্থল। ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের ব্যক্তিতত্ত্বের উপর একটা বিজাতীয় আন্তরিক ঘৃণা ও উপেক্ষা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। হব্‌স, লক্‌ ও রুসো প্রভৃতি ব্যক্তিবাদীদিগের মতবাদ সম্পূর্ণ বহির্মুখীনতার অভাবে বিশ্বসংসারের সঞ্চিত জ্ঞানরাশির ও সভ্যতার নাশকারী, জগৎ ব্যাপী একতা ও শান্তি স্থাপনের জীবন-প্রয়াসের মরণশত্রু।

এই ব্যক্তিতত্ত্বের বহির্মুখীনতার সহিত অন্তর্মুখীনতার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিলে জগতে উহার বিষময় ফল লক্ষিত হইতে অবসর পাইত না। ভারত ও ইউরোপ উভয় প্রদেশেই ব্যক্তিতত্ত্বের একাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিতত্ত্বের বাহ্যপ্রকৃতি ভারতে ক্বচিৎ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে; উহা অন্তরতম প্রদেশেই নিবদ্ধ ছিল।

প্রাকৃতিক জীবনে যাবতীয় অমঙ্গল অশান্তির হেতুস্বরূপ রাগ, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রী-কাতরতা মানবহৃদয়ে স্থান পায় না, ইহা যদিও সত্য হয়, তবে ঐরূপ জীবনে আমাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় কি না, ইহা গভীর সমস্যার বিষয়। মানব-প্রকৃতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমান যুগে যে সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে সকল পরিবর্ত্তনের অপনোদন করিতে প্রয়াস পাওয়া কি অতি-প্রাকৃতিক নহে? রুসোর স্বপ্নকুহেলিকার মোহিনী শক্তিতে বহুকাল-সঞ্চিত জ্ঞান ও সভ্যতার প্রতি জনসাধারণের মর্ম্মান্তিক অশ্রদ্ধা জন্মিলেও, উহা অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাল, অনন্তকাল সম্মুখেই অগ্রসর হইতেছে। মানুষ কখন পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। জীবন-সংগ্রাম জয়ী হইতে হইলে কালোচিত হইতে হইবে। জগতের পরিদৃশ্যমান জ্ঞান ও সভ্যতা অবহেলা করিয়া বর্ত্তমান জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইহার ভিতর সহস্র অশান্তির বীজ নিবদ্ধ থাকিলেও উহা লইয়াই আমাদের চলিতে হইবে। বিদ্যা জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানবের জীবন ক্রমশঃ ক্লেশময় হইয়া উঠিতেছে। শান্তি ও সুখানুসন্ধানের প্রয়াস পরিদৃশ্যতঃ ব্যর্থ হইতেছে, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা কোথায়? এই কারণানুসন্ধানের ব্যর্থতায় দুঃখবাদ জগতের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে সত্যস্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বহির্শক্তির অতিরিক্ত যে আত্মশক্তি

রহিয়াছে, উহারও বিকাশের প্রয়োজন; এত দুঃখের সমকালীনত্ব ও সমত্ব রক্ষিত না হইলে যে দুঃখভাব জগতে বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বর্ত্তমান শিক্ষার ভিতর আত্মশক্তির বিকাশের কোনরূপ অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয় না; হিন্দুর চতুরাশ্রমে ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। সেই অতি পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী এখন অনুবর্ত্তিত হওয়া উচিত কি না, এবিষয়ে এখন আলোচনা করিয়া ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, বর্ত্তমান লৌকিক-শিক্ষায় মানবের মানসিকতার পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা কল্পিত হওয়াই উচিত; এবং তৎসঙ্গে সেই পূর্ণ-স্বাধীনতার সংযমরশ্মিস্বরূপ স্বীয় আভ্যন্তরীণ আত্মশক্তিকে প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত করাই কর্ত্তব্য। বাহিরের নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষা ভিতরের নিষেধাজ্ঞাই পূর্ণ-স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার ভিতর সংযম আনয়ন করিতে অধিকতর উপযোগী এবং মানবের দ্বন্দ স্বার্থের ভিতর সমন্বয় ও শান্তি বিস্তার করিতে প্রকৃষ্টতর উপায়। ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দিয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা অশান্তির হেতু হইয়া না পড়ে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষায় এই প্রথা অবলম্বিত না হয়, সে শিক্ষা জগতের বহিরাবণের সৌন্দর্য্যমাত্র, অন্তরতম দেশে তাহার স্থান নাই। সে শিক্ষা কেবল বিতৃষ্ণা, নিরাশা ও অশান্তির হেতু স্বরূপ—সে শিক্ষা সমাজের কঠোর শিলাভেদ করিয়া তদবকল্প অবতারাদি বিশ্বসংসারের আদর্শ মহাপুরুষগণকে উঠাইয়া আনিতে পারে না। সে শিক্ষায় মহত্বের ভাণ রহিতে পারে, সে শিক্ষায় telescopic philanthropy উপলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু সে শিক্ষায় হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ ফুটিয়া উঠিতে পারে না—সে শিক্ষায় জীবনের প্রাকৃতিক সরল সৌন্দর্য্যের বিকাশ নাই, সে শিক্ষা আত্মময় নয় বলিয়া উহা বহির্ব্যাপার লইয়াই নিবদ্ধ। সে শিক্ষায় মনোবৃত্তি অন্তর্মুখীন না হইয়া বহির্ব্যাপার লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হয়; সে শিক্ষায় স্বাধীনতার বিনাশকারী প্রভুত্বলাভের অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে এবং এই বিপুল বিশ্বের শান্তি-অনুসন্ধিৎসু জনমণ্ডলী মোহান্ধ হইয়া উহাতে জীবনাহুতি প্রদান করে।

সাধক-কবি নবাই ময়রা

শ্রী কামিনীনাথ রায়

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক' নামক বঙ্গভাষার লেখকগণের চারিতাভিধানে বর্দ্ধমান জেলার খেরারগ্রাম নিবাসী নবাই ময়রা নামক জনৈক সঙ্গীত-রচয়িতার নাম উল্লিখিত আছে। নবাই এতদঞ্চলে সুপরিচিত। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে, উক্ত কবির বিস্তৃত-জীবনী ও সমগ্র গীতাবলী সংগ্রহ করিব। খেরার আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ মাত্র ব্যবধান; কিন্তু এপর্য্যন্ত সুযোগ ও অবকাশাভাবে এই সংগ্রহকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। খেরার গ্রামে এমন কোন লোক জীবিত নাই, যিনি নবাই সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ বলিতে পারেন। তবে শুশুনি মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেডপণ্ডিত খেরার-নিবাসী আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়ের সাহায্যে কবির জীবনী যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও সমগ্র বঙ্গের বিদগ্ধমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আশা আছে, ভবিষ্যতে এই জীবনী সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব।

একদিন ছিল, যখন বঙ্গের হাটে মাঠে সর্ব্বত্র বিমল ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইত। একদিকে বৈষ্ণব-কবিগণের কান্ত-কোমল পদাবলীতে, অন্যদিকে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রভৃতি সাধক-কবিগণের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতে বঙ্গের পল্লীপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইত। সাধক কবিগণ বালকের ন্যায় সরলভাষায় জগজ্জননীর নিকট তাঁহাদের যত কিছু আবদার অভিমান ও প্রার্থনা জানাইতেন। তাঁহাদের রচনায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বা কোনরূপ জটিল তত্ত্বের আলোচনা ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের পদাবলী হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ উৎসারিত। নবাইও জগৎমাতার ভক্ত আব্দেরে ছেলে। তিনিও বালকোচিত সরল ভাষায় মায়ের নিকট আপনার আদর অভিমান জানাইয়াছেন। তাঁহার রচনা সরল, ভাষা প্রাঞ্জল এবং কবিত্ব উজ্জ্বল; তাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন, আমরা নবাই সম্বন্ধেও সেইরূপ বলিতে পারি,—

"উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাব ফুটে, উভয় অধীন যেন।।
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনে মাত্র আত্মহারা।।"

নবাই ময়রা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ থানার অধীন খেরার গ্রামে সন ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাটীতে ৺চণ্ডীদেবীর নিত্যপূজা হইত। নবাই বাল্যকাল

হইতেই চণ্ডীদেবীর পরমভক্ত ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রায়ই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত গান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বাটীতে তাঁহার পত্নী ও শ্যামাসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা ভাগিনেয়ী ছিল; সন্তানাদি হয় নাই। অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না; সেইজন্য তিনি প্রথম অবস্থায় মাসিক তিন টাকা মাহিনায় মালডাঙ্গার হাটে গঙ্গা ময়রার দোকানে চাকরী করিতেন। একদিন ভিয়ান করিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত গানটী গায়িতে গায়িতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন. এবং তাহাতে ভিয়ান নষ্ট হইয়া যায়। সমগ্র গানটী পাই নাই; যতটা পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গুরু দত্ত গুড় লয়ে ভিয়ান কর মন ময়রা হয়ে।
সন্দেশ তৈয়ারী হলে ভেট দিবি শমনে গিয়ে।।

* * * * *

রসনারে ঝাঝরি করে ভ্রান্তিগাদ দাও উঠাইয়ে।
খেরার গ্রামে বসতবাটী, গুড় চিনিনে ময়রা বটি,
নবাইচন্দ্র কহে খাঁটী, সন্দেশ হয় কি হেথায় রয়ে।।

ভিয়ান নষ্ট হওয়ায় তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। সেইজন্য তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুণ্নমনে বাড়ী ফিরিয়া যান। পরে ৺চণ্ডীদেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া একটী চণ্ডীর গানের দল করেন। সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীগায়ক ৺রাজনারায়ণ স্বর্ণকার ও খেরার নিবাসী ৺শ্রীধর তন্তুবায় তাঁহার দলের প্রধান দোহার ছিলেন। খেরার গ্রামের বিখ্যাত রায়বংশোদ্ভব ৺বৈদ্যনাথ রায় মহাশয় নবাইয়ের সহিত একত্র সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। বাল্যকালে নবাইএর বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগ ঘটে নাই। তিনি একপ্রকার নিরক্ষর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য তিনি যে সকল গান রচনা করিতেন, তাহা গ্রামের প্রধান অধ্যাপক ও সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সংশোধন করিয়া লইতেন। দেবীর প্রসাদে ক্রমে ক্রমে তাঁহার রচনাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা নবাই "মন মানসে জপ না, কামারি-অঙ্গনা" এই গানটী রচনা করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়কে দেখাইলে তিনি তাহার ভাবমাধুর্য্যে ও ভাষা প্রয়োগচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "নবাই, তুমি লেখাপড়া শিখ নাই। এইরূপ ভাব তুমি কোথায় পাইলে এবং এই সকল কথা কোথা সংগ্রহ করিলে?" উত্তরে নবাই বলেন, "আমি কিছুই জানি না। মা আমার জিহ্বাগ্রে বসিয়া আমাকে যাহা বলান, আমি তাহাই বলি।" সেইদিন হইতে সার্ব্বভৌম মহাশয় আর তাঁহার রচনা সংশোধন করেন নাই। ঐ গানটী সমগ্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মন মানসে জপ না, কামারি-অঙ্গনা।
জপরে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে,

প্রাণান্তে তোরে কৃতান্তে ছোঁবে না
যে পদে রাতুল, হয় স্থূল মূল,
তারে কভু মন ভুল না।
শ্যামাপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল,
শ্যামা সে কিঙ্করে হন সানুকূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল,
কভু প্রতিকূল থাকে না।।"
দেখ্‌ছত মন এই ত সংসার,
সকলি অসার কালীপদ সার।
সুঁসার অনুসারে চালনা।
(তবে) দূরে যাবে তোমার মনেরি মালিন্য,
মনেরই মানস হইবে পূর্ণ,
হর মনোমোহিনী হইলে প্রসন্ন
নরের দৈন্য দশা রবে না।।

সন ১২৫১ সালে নবাই এর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর। এইরূপ কিংবদন্তী যে তিনি মৃত্যুর পূর্ণক্ষণে আত্মীয়স্বজন সকলকে নিজের বিছানা হইতে সরিয়া যাইতে বলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—"ঐ দেখ মা আমাকে ডাকিতেছেন; তোমরা সরিয়া যাও, আর আমার বিলম্ব নাই।" পরক্ষণেই নবাইএর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

নবাইএর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্যামাসুন্দরী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন চণ্ডীদেবীর সেবা রীতিমত চালাইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নবাইএর বংশে আর কেহ না থাকায় তাঁহাদের দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় আসিয়া নবাইএর বাটীতে বাস করে। সেই সময়ে একজন সন্ন্যাসী কিছুদিন খেরার গ্রামে আসিয়া বাস করেন, এবং অবশেষ তিনি নবাইএর ইষ্টদেবতা চণ্ডীকে লইয়া অন্তর্হিত হ'ন। এখন নবাইএর বাস্তুভিটাশূন্য এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নবাইএর কয়েকটী গান সম্পূর্ণ এবং কয়েকটী আংশিক ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

যে জন পাষাণীর মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে?
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে।।

* * * * *

মা মা বলে যত ডাকো শুন্‌তে পেয়ে শোনে না কো।
নবাই এমনি লাথি-খেকো তবু মা মা বলে ডাকে।।"

"জানি গো জানি শ্যামা তুমি যেমন দয়ামই।
তুমি কারে হাসাও কারে কাঁদাও মা তোমার ব্যবসা অই।।
পঞ্চামৃত দাও মা কারে, রাখ স্বর্ণময়ীপুরে,
কারো ভাগ্যে দিনান্তরে পায়না দুটো চোঁয়া খই।।
পেতে একটা মায়া ছল, নবাইকে করেছ ভোলা,
আছে এক শমনের জ্বালা, তাই তোমারই শরণ লই।।

শোন্ মা আমার দুঃখ তারা।
আমার ঘর সোজা নয় ঘরতি ঘরা।।
যারে লয়ে ঘর করি মা, শোন বলি তার কাজের ধারা,
যারে চর্ব্ব্যচুষ্য করে যোগাই, সে না বলে তারা তারা।।
দারওয়ান আছে পাঁচজন, সদাই তারা দেয় পাহাড়া,
চোর ছেড়ে দেয় কর্‌তে চুরি, সাধু দেখে দেয় মা তাড়া।।
নবাই বলে ভার হ'লো মা, এ ঘরে বসতি করা,
ছয়জন চোরে যুক্তি করে লুটল্ আমার ধনের ঘড়া।।

আর কতদিন দীনের অধীন করে আমায় রাখিবে।
দয়াময়ী এদীন বলে কবে তোমার মনে হবে।।
অজ্ঞান বালকের মত হয়ে থাকি মা সতত,
দেহি দেহি জ্ঞানামৃত, আশ্রয় যে মা দিতে হবে।।
কুদিনে অজ্ঞানে গেল চিরদিন,
যায়না কুদিন হয়না সুদিন,
আসিছে বিষম কুদিন
সেদিন কেমনে যাবে।।
আমি শ্যামা আমার নই,
সতত পরবশে রই,
নবাই এরে রক্ষাময়ী পরবশ কবে ঘুচাবে।।

একদা তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্যামাসুন্দরী তাহার নামে একটী গান রচনা করিতে অনুরোধ করায় নবাই নিম্নলিখিত গীতটী রচনা করেন ঃ

"শ্যামা আমার কেমন মেয়ে দেখ্ দেখি মন বিচার করে।
এমন মেয়ে না হ'লে কি হরের মন ভুলাতে পারে।।
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, তার মন হরতে কঠিন হয়,
অন্যমেয়ের কর্ম্মনয়, মদন যারে শঙ্কা করে।।

অপরাধ হের নয়নে, এমন নাই আর ত্রিভুবনে,
বিবসনা বিবসনে, জগজ্জনের মন হরে।।"

* * * * *

শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ বঙ্গদেশে চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ ভাবে উদার; তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকত্ব নাই। নবাইও প্রকৃত ভক্ত। শ্যমা তাঁহার ইষ্ট দেবতা হইলেও তিনি কালী কৃষ্ণ সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া জানিতেন, একবার বাখনাপাড়ার সুপ্রসদ্ধি গোস্বামী মহাশয়দের বাটীতে নবাইএর গান হয়। সেখানে তিনি কালিকৃষ্ণের অভেদাত্মক নিম্নলিখিত গানটী রচনা করেন।

"হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হয়ে বাঁকা দেমা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।।
নরকর কটিবেড়া ত্যজে পর মা পীতধড়া
মস্তকেতে মোহন চূড়া, মুক্ত বেনী লুকাইয়ে!
ত্যজে নরমুণ্ডমালা, গলে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হও মা কালা, (দাঁড়াও)
চরণে চরণ থুয়ে।।
হৃদ্‌মাঝারে কাল শশী,
ওরূপ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
নবাই প্রতি সদয় হয়ে।।"

নিম্নলিখিত গানটীতে নবাইএর ব্রহ্মজ্ঞান ও অদ্বৈতবোধ পূর্ণ পরিস্ফুট।

কালী কে জানে তোমায় গো।
কে জানে তোমায় অনন্তরূপিণী।
তুমি মহাবিদ্যা, অনারধ্যোরাধ্যা,
ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী,
সারদা বরদা শুভদায়িনী, মানদা
পুণ্যদা যশোদানন্দিনী, জ্ঞানদা, অন্নদা
কামারি কামিনী, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের
হৃদিবিলাসিনী।।
শমন ভবন গমন বারিণী পূজন পালন
নির্ব্বাণকারিণী, সাকারা, আকারা,
তুমি নিরাকারা, নবাইএর ভার
হর জননী।।"

চুপীর দেওয়ান মহাশয়

শ্রী কালিদাস সন্ন্যাসী (ওরফে ভুলুয়া বাবা)

বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চুপীর মহাশয়গণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। মহারাজা তেজচন্দ বাহাদুরের সময় পর্য্যন্ত রাজসরকারের প্রধান কার্য্যভার মহাশয়বংশের হস্তে অর্পিত ছিল।

ভক্তকুলগৌরব দেওয়ান রঘুনাথের জীবন-চরিত বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, তিনি কিরূপ গৌরবান্বিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে।

সম্রাট আওরংজেবের পুত্র সুলতান আজিম হোসেন যখন ঢাকায় নবাব ছিলেন, তখন চুপীর মহাশয়-বংশের আদিপুরুষ গৌরীচরণ রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন এবং বর্দ্ধমান রাজপরিবারের আদিপুরুষ, রাজত্বের স্থাপনকর্ত্তা আবুরায় মহাশয় তখন রেকাবীবাজারের চৌধুরী কোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চৌধুরী আবুরায় কোতোয়ালকে ঢাকা যাইয়া রাজস্ব প্রদান করিতে হইত।

একবার আবুরায় রাজকর প্রদান করিতে ঢাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত দেওয়ানের অভাবে সম্পূর্ণ রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া শাসনকর্ত্তার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। তখন নবাবের অনুরোধে, দেওয়ান গৌরীচরণ স্বীয় পুত্র বাসুদেবকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিলেন। সুতরাং বর্দ্ধমানের জমীদারীর সৃষ্টি হইতে চুপীর মহাশয়বংশের সঙ্গে, কার্য্যভার বহনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। (খৃঃ ১৬৫৭; বঙ্গাব্দ ১০৬৪)।

চুপীর মহাশয়-পরিবারের বাসস্থান তখন কাষ্ঠশালী গ্রামে ছিল। গঙ্গার তরঙ্গে সেই বাসভবন সলিলশায়ী হইতে আরম্ভ করিলে, দেওয়ান রঘুনাথের সময় চুপীতে বাসভবন নির্ম্মিত হয়। এখন চুপীর দেওয়ান-মহাশয় বলিয়াই সর্ব্বত্র গৌরীচরণের বংশধরগণ পরিচিত। দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গৌরীচরণ যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহা সমস্তই দেবার্চ্চনা ও লোকসেবায় বিতরণ করিতেন। তাঁহার পরোপকার, ঈশ্বরভক্তি ও স্বার্থত্যাগের সংবাদ ক্রমে নবাবের কর্ণে প্রবেশ করে। নবাব তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততা দর্শনে, গুণের উপযুক্ত "মহাশয়" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করেন। সেই অবধি এই দেওয়ানবংশ "মহাশয়" নামে প্রশংসিত।

আবুরায় চৌধুরীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণরাম রায় মোগলসম্রাট্ কর্ত্তৃক ১৬৯৪ খৃঃ যখন বর্দ্ধমান পরগণার 'জমীদারি চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্তন হ'ন, তখন পর্য্যন্ত বাসুদেব দেওয়ানের অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পরে তাঁহার এক পুত্র কামদেব

দেওয়ানের পদ লাভ করেন, অন্য পুত্র রামকান্ত সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। জমীদার কীর্ত্তিচন্দ রায় চৌধুরীর সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

মহারাজাধিরাজ তিলক চন্দ বাহাদুরের সময় দেওয়ান বাসুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রায় ব্রজকিশোর মহাশয় দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের সময় দেওয়ান ব্রজকিশোরের পুত্র নন্দকুমার দেওয়ান হ'ন। নন্দকুমারের সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস "মহাশয়-বংশে" তরবারি, বন্দুক ও বল্লম প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন। আজ পর্য্যন্ত মহাশয়দিগের গৃহে বৃটিশরাজপ্রদত্ত বন্দুক ও তরবারি বিদ্যমান আছে। তাহাতে বৃটিশরাজের রাজচিহ্নসকল খচিত আছে। নন্দকুমারের পর তাঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ভাগবত চূড়ামণি রঘুনাথ দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন।

কামদেবের পুত্র রঘুরাম এবং রঘুরামের পুত্র রমাকান্ত বর্দ্ধমানে সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া আমরণ রাজসেবা করিয়া গিয়াছিলেন। রমাকান্তের পৌত্র পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়ক্রম ৬৮ বৎসর।

চুপীর মহাশয়-বংশের অতিথিসেবা, সাধুসেবা, ঈশ্বরভক্তি এবং শাস্ত্রানুসারে দেবসেবাদি কার্য্য দর্শনে আজ পর্য্যন্ত দেশের লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে 'মহাশয়' বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে।

নন্দকুমার স্বর্গারোহণ করিলে স্বধর্ম্মপরায়ণ গুণগ্রাহী মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর নন্দকুমারের কনিষ্ঠ রঘুনাথকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। বাল্যাবধি ধর্ম্মচিন্তাশীল রঘুনাথ চারি পাঁচ বৎসরকাল মনোযোগের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, শেষে চিত্তের গতি এমন ভাবে ভগবচ্চরণে অর্পিত হইল যে, আর রাজকার্য্যের গুরুভার তিনি বহন করিতে পারিলেন না। তিনি পতিতপাবনী জাহ্নবীতীরে চুপীর বাসভবনে যাইয়া সাধনাসনে উপবেশন করিলেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইতেন; নতুবা সংসারত্যাগী উদাসীনের মত, সর্ব্বদা সেই পরম মঙ্গলময়ীর ধ্যানধারণায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন; অতুলনীয় সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ বাহাদুর দিল্লী হইতে প্রসিদ্ধ গায়ক আতা হোসেনকে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য বর্দ্ধমানে আনয়ন করেন। রঘুনাথ তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা গানে উচ্চ অঙ্গের তাল ও রাগরাগিণী সর্ব্বপ্রথমে তিনিই সন্নিবেশিত করেন। এখনও প্রধান প্রধান গায়কেরা ধ্রুপদ চৌতালের বাঙ্গালা গান করিতে হইলে দেওয়ান মহাশয়ের গান ভিন্ন অন্য গানে সুবিধা বোধ করেন না। সাধকগণের মধ্যে এক রামপ্রসাদি ভিন্ন দেওয়ান রঘুনাথের ন্যায় রাগরাগিণী সিদ্ধ গায়কের নাম আব বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না। মহাশয়বংশে অনেকে দেওয়ানীপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া

গিয়াছিলেন। মুক্তপুরুষ রঘুনাথ যখন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তখন দেড়লক্ষ টাকার জমিদারী ও ভাণ্ডারে নগদ লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত ছিল। পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম সাধনের জন্য এই অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমরণ মুক্তহস্তে তৎসমস্ত বিতরণ করিয়া লোকসেবা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন; পরিজনবর্গের প্রতিপালনে যত্নবান হইয়াও নির্ম্মম ছিলেন; এবং ধনশালী বিষয়ী হইয়াও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন।

রঘুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র লোকনাথ সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেন; বিষয়বুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রখরতা প্রদর্শন করিলেন। তেজচন্দ বাহাদুর তাঁহাকেই দেওয়ানী পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লোকনাথ পারসী ও ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে শিক্ষা করিলেন। তাঁহার প্রশংসায় দেশ পরিপূর্ণ হইল। ছোট-মহারাজ প্রতাপচন্দ বাহাদুর তাঁহাকে সময় সময় সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন লোকনাথের এইরূপ যশঃসৌরভে দশদিক অমোদিত হইল, পুত্রের প্রতি তখনও রঘুনাথ বিশেষ কোন স্নেহাতিশয্য দেখান নাই।

ত্রিশ বৎসর বয়সে লোকনাথের জ্বরবিকার হইল। জগদ্ধাত্রীর চরণকমলে অর্পিত মনপ্রাণ দেওয়ান মহাশয় রোগের সংবাদ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না। বাহিরবাড়ীতে অনবরত কালীনাম সংকীর্ত্তন যেমন হইত, তেমনই হইতে লাগিল। একদিন অন্দর হইতে সংবাদ আসিল, আজ লোকনাথের অবস্থা ভাল নয়। মায়ামুক্ত সাধক উত্তর করিলেন "যখন মন্দ হয় আমাকে বলিও, স্নান করিতে হইবে।" আবার একঘণ্টা পরে সংবাদ আসিল, লোকনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেওয়ান মহাশয় তখনও স্বাভাবিক ভাবে বলিলেন "জন্ম মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক অবস্থা।" তিনি স্নান করিয়া আসিয়া আবার কালীনাম ধ্যানে উপবেশন করিলেন। আবার কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা শব লইয়া শ্মশানে গমন করিল।

একবার এক ব্রাহ্মণ আসিল। সে কুলীন, কন্যাদায়গ্রস্থ। তখন কুলীনের কন্যাদায় প্রাণসঙ্কট অপেক্ষাও অধিক ছিল। ব্রাহ্মণ বহু রাজা, জমীদারের গৃহে ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহার দুঃখমোচনের উপায় হয় নাই। সে দেওয়ান রঘুনাথের সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল এবং প্রার্থনা জানাইয়া নয়নধারায় ধরাতল ভাসাইতে লাগিল।

সেদিন তহবিলে টাকা নাই। রঘুনাথ ব্রাহ্মণকে বলিলেন "কি করিব, তহবিলে টাকা নাই, থাকিলে তোমায় সাহায্য করিতাম।" ব্রাহ্মণ বলিল 'টাকা এখন নাই, কিন্তু কিছুকাল পরে আসিতেও ত পারে।" রঘুনাথ "আজ যদি টাকা আসে তুমি পাইবে! যাহা আসে সমস্তই পাইবে।" সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক পরগণার নায়েব পাঁচহাজার

টাকা লইয়া উপনীত হইলেন। সেই টাকা তিনদিন পরে লাটের কিস্তি পাঠাইতে হইবে। না দিলে ত্রিশ হাজার টাকা লাভের ভেরী-পরগণা বিক্রী হইবে। রঘুনাথ সমস্ত টাকা ব্রহ্মণকে দিতে আদেশ করিলেন। লাটের টাকা সংগ্রহ হইল না—ভেরী-পরগণা বিক্রী হইয়া গেল। সেই পরগণার মূল্য এখন পাঁচলক্ষ টাকা।

একবার একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীঘর আগুনে ভস্মীভূত হইল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণে অসমর্থ হইলেন। বিপন্নের বন্ধু দেওয়ান রঘুনাথের নাম তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি কুড়ি পঁচিশজন পরিজন সঙ্গে দেওয়ান মহাশয়ের দ্বারদেশে আসয়িা আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। দেওয়ান মহাশয় বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে আপনার অন্দরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সর্ব্বশুদ্ধ কত টাকার ক্ষতি হইয়াছে?" গৃহস্থ উত্তর করিলেন, "পাঁচহাজার টাকা।" দেওয়ান মহাশয় বলিলেন, "আমি এই পাঁচহাজার টাকা আপনাকে সাহায্য করিতেছি। আপনি যাইয়া পূর্ব্বের মত গৃহস্থালী স্থাপন করুন। যতদিন বাসের উপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মিত না হয়, ততদিন আপনার পরিজনবর্গ আমার বাড়ীতে অবস্থান করিবে।"

দেওয়ান রঘুনাথ কত বিপন্নের আশ্রয়দাতা ছিলেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এই সকল গুণের জন্য দেওয়ান মহাশয় বলিলে কেবল রঘুনাথকেই বুঝায়।

দেওয়ান মহাশয় যখন দেহত্যাগ করেন, তখন দেড়লাখ টাকার ভূসম্পত্তির মাত্র পঁচিশ হাজারে পরিণত হইয়াছিল; এবং প্রায় দশহাজার টাকার ঋণ হইয়াছিল। নির্ব্বিষয়ীর হাতে বিষয়ের ভার অর্পিত হইলে তাহার পরিমাম যেমন হয়, অথবা বৈরাগীর হাতে অর্থের যেমন দুর্গতি হয়, রঘুনাথের হাতেও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির সেই দশা ঘটিয়াছিল। দেওয়ান মহাশয় শক্তি-সাধক ছিলেন; কিন্তু কালীকৃষ্ণে কখনও তাঁহার ভেদ বুদ্ধি ছিল না। রাধাবল্লভের সেবা স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা তাহাতে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার নিকটে জাতিনির্ব্বিশেষে সাধক হইলেই আদৃত হইতেন। তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতে বোধ হয় তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। দেওয়ান মহাশয় প্রত্যহ একটী সাধন-সঙ্গীত রচনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। যতদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গীতে নন্দকুমার বলিয়া ভণিতা ছিল। রামের ভাই লক্ষ্মণের মত রঘুনাথ যে দাদাগত প্রাণ ছিলেন, ইহা তাঁহার পরিচয়। নন্দকুমারের দেহাবসান হইলে সঙ্গীতে অকিঞ্চন বলিয়া ভণিতা দিলেন। অকিঞ্চন নিষ্কিঞ্চিন প্রভৃতি শব্দ বৈষ্ণবীয় নম্রতাসূচক। তৃণাদপি সুনীচের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সাধক কুলতিলক রঘুনাথ। তাঁহার ভক্তি-সাধনা কীর্ত্তন করিতে, তাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সাধারণ জীবের সাধ্য নাই।

কালপূর্ণ হইল। সামান্য একটু জ্বর শরীরে দেখা গেল। ৮৬ বৎসর বয়সে মুক্তপুরুষ দেহত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন। কাষ্টশালীর শ্মশানঘাটে একশত এক তুলসী বৃক্ষে কানন

নির্ম্মিত হইল। দেওয়ান রঘুনাথ সেই কাননের মধ্যে উপবেশন করিলেন। শক্তিসাধক তুলসী কাননে উপবেশন করিয়া জয় মা জগদম্বে বলিয়া, তারস্বরে গান করিতে লাগিলেন। অপরূপ অদ্ভুত দৃশ্য। অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলেন। জয়দুর্গে বলিয়া চিরতরে নয়নদ্বয় নিমিলিত করিলেন। তিনি ১১৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৪৩ সালে নন্দোৎসবের দিন মহাপথে প্রস্থান করেন।

চুপীর দেওয়ান বংশ

গৌরীচরণ (নবাবের দেওয়ান)

রতনেশ্বর, বাসুদেব (দেওয়ান), রমানাথ, রাধাকান্ত

রামকান্ত (সেনাপতি), কামদেব (দেওয়ান)

রঘুরাম (সেনাপতি)

|

রমাকান্ত (সেনাপতি)

|

শ্যামাচরণ

|

পূর্ণচন্দ্র (জীবিত)

|

রাঘবেন্দ্র, রামচন্দ্র, ব্রজকিশোর (দেওয়ান)

|

নন্দকুমার, হরিনাথ, রঘুনাথ (দেওয়ান), কালীনাথ

|

লোকনাথ

|

হরমোহন (দেওয়ান)

|

নৃসিংহপ্রসাদ (দেওয়ান). মন্মনাথ, দেবেন্দ্রনাথ।

৺অনন্তপুরী গোস্বামীর কীর্ত্তি

শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান সহরের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে ১৩।১৪ মাইল ব্যবধানে বড়বেলুন গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রী শ্রী ৺রাধা-গোপীনাথজীউর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। সেবাইত অধিকারী মহাশয়দিগের গৃহে যে সকল পুরাতন কাগজাদি পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছে যে ১৪০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে অনন্তপুরী গোস্বামী এই সেবা বড়বেলুন গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী শ্রী ৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে এই সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত কাগজাদি দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়, তদ্ভিন্ন এই সেবার নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা একটু নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, শ্রীজীবগোস্বামী বৈষ্ণব-স্মৃতি লেখেন নাই; কারণ, শ্রী শ্রী ৺গোপীনাথজীউর নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসবাদি অর্থাৎ দোল, রাস, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল কার্য্যই প্রাচীন স্মৃতির মতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল উৎসবাদিতে খোলের পরিবর্ত্তে অদ্যাবধি ঢোল ও ঢাক বাদিত হইয়া থাকে।

এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক সেবা ও অতিথি-সেবার ব্যয় গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভক্তিমান লোকদিগের সাহায্যেই নির্ব্বাহ হইত, কোন প্রকার দেবত্র সম্পত্তি বা স্থায়ী বৃত্তিবিধান ছিল না। শ্রীঅনন্তপুরী গোস্বামী ৪০ বৎসর এইরূপভাবে সেবাদিকার্য্য চালাইয়া, তাঁহার অন্তিমকাল সমাগত জানিয়া, বর্ত্তমান অধিকারীবংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺গোপীনাথ অধিকারীকে এই সেবা সমর্পণ করেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ২০ পুরুষ হইল অধিকারী মহাশয় বংশানুক্রমে উপরিউক্ত মত সেবা চালাইতেছেন। গোস্বামীজীউর তিরোভাব-উপলক্ষে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে নয়দিন ব্যাপিয়া মহামহোৎসব হইয়া থাকে। বড়বেলুন গ্রামে ৩০০ ঘর ব্রাহ্মণের ও প্রায় ৬০০ শত ঘর অপরাপর জাতির বাস ছিল। অব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত গ্রামের ঐ সমস্ত লোক এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের যাবতীয় লোক প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন ও আপন আপন বাটীতে লইয়া যান। তদ্ভিন্ন আহুত অনাহুত অভ্যাগত যত লোক উপস্থিত হন, সকলকেই অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কালীয়দমন যাত্রা প্রভৃতি নানাপ্রকারের দিবারাত্রি ঈশ্বরের লীলা-কীর্ত্তন করিত; বর্ত্তমান সময়ে ব্যায়াধিক্যবশতঃ দুই একটী দলের বায়না হইয়া থাকে। ভোজনান্তে স্ত্রী-পুরুষ দলেদলে মহাপ্রসাদের পাত্রসকল মস্তকে করিয়া আপন আপন বাটি অভিমুখে গমন করেন। ঐ প্রসাদ আবার

গ্রামান্তরে আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠান হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের "পাট পরিক্রম" গ্রন্থে এক স্থানে লিখিত আছে "বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর; বাগনপাড়াবাসী শ্রীরমাই ঠাকুর।" বাস্তবিকই শ্রীক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কুত্রাপি এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীঅনন্তপুরী গোস্বামীর তিরোভাবের পর অধিকারী মহাশয়গণ প্রায় চারিপুরুষ ক্রমান্বয়ে অন্যের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া উপরিউক্ত নিয়মানুসারে দেবসেবা, অতিথি-সেবা ও মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিতেন। পরে যখন মহারাজাধিরাজ মানসিংহ দিল্লীর বাদসাহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই সময় ৺চৈতন্যদাস অধিকারী ও হরিবল্লভ অধিকারী উভয়ে দিল্লী যাইয়া মহারাজ বাহাদুরের অনুগ্রহ ও বাদসাহের নিকট সুপারিসের ফলে ৪০০ চারিশত বিঘা আয়মা জমির সনন্দ পাঞ্জা করিয়া লইয়া আসেন। কিংবদন্তী আছে, ঐ সময়ে শ্রী শ্রী ৺গোপীনাথজীউ উক্ত উভয় অধিকারীকেই রাত্রিযোগে প্রত্যাদেশ করেন যে, "তোমরা দিল্লীতে মহারাজ মানসিংহের নিকট গমন কর, সকল কার্য হইবে।" কিংবদন্তী প্রচার আছে, বড়বেলুন গ্রামের পশ্চিমে এক ক্রোশ ব্যবধানে একটী গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম কাঞ্চনগড় ছিল। সেখানে তাম্বুলী জাতীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বৃদ্ধা মাতা শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রী শ্রী ৺পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবেন, এইরূপ প্রস্তাবে তিনি মাতার গমনের জন্য যান-বাহন ও দাসদাসীর ব্যবস্থা করিলেন ও কয়েক সহস্র মুদ্রা দিলেন। যে দিন প্রাতঃকালে তাঁহারা যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, তোমাকে আর শ্রীক্ষেত্রধামে যাইতে হইবে না—বড়বেলুনে যাও। শ্রী শ্রী ৺গোপীনাথজীউ দর্শন কর; সেই শ্রী শ্রী ৺জগন্নাথ দর্শন হইবে। পুত্র বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজেই বড়বেলুন গমন করিলেন এবং ঈশ্বরজীউর পূজার পর তিনি যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া বলেন যে, আমার আর তেমন চলৎশক্তি নাই যে, প্রতিদিন আসিয়া প্রভুকে দর্শন করি। আমাকে শ্রীক্ষেত্রধামে পাঠাইতে যে টাকা ব্যয় হইত, সেই টাকাতেই এমন একটী শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও, যেন আমি আমার শয়ন-কক্ষ হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া শয্যা হইতে উঠিতে পারি। ভক্তিমান পুত্র মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেইদিন হইতেই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। দুই বৎসরের মধ্যে এমন সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল যে, চারিক্রোশ দূর হইতেও মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইত। তদ্ভিন্ন দোলমন্দির স্নানমন্দির ও তুলসীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বড়বেলুন গ্রামের অগ্নিকোণে বাঁকুড়া গ্রামে ৺রাধাবল্লভ রায় নামে একজন ধনাঢ্য ভক্তিমান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীঅনন্তপুরী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি যখন সন্ন্যাসী ছিলাম, আমার ঠাকুরও সন্ন্যাসী ছিলেন।

এখন তিনি গৃহস্থের ঠাকুর হইয়াছেন; এখন তাঁহাকে গৃহী করিয়া দাও।" রায় মহাশয় ইহা অলীক স্বপ্ন জ্ঞান না করিয়া, ঢাকা হইতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীমতি রাধিকা মূর্ত্তি আনাইয়া ৺গোপীনাথজীউর বিবাহ দিয়াছিলেন। যৌতুকস্বরূপ অনেক জমিজায়গা দিয়াছিলেন এবং শুনা যায়, তাঁহার বাড়ী হইতে শ্রী শ্রী ৺গোপীনাথজীউর বাড়ী পর্য্যন্ত নানাবিধ দ্রব্যাদির ভারবাহক শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল। বড়বেলুন গ্রামের একক্রোশ উত্তরে ভাটাকুল গ্রামে রাজা রামচন্দ্র রায় নামে একজন প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ৺গোপীনাথজীউকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া ভাটাকুলের নিজ বাটীতে স্থাপন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ তৎকালীন অধিকারী মহাশয়দিগকে পত্র লিখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। সেকালে ডাকাইতে পর্য্যন্ত পত্র দিয়া ডাকাইতি করিত। যাহা হউক, অধিকারী মহাশয় তাঁহার পত্র পাইয়া ভীত হইলেন এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ জানিয়া অনাথশরণ দুর্ব্বলের বল শ্রী শ্রী ৺জীউর নিকট নিজের অসমর্থতা নিবেদন করিয়া, তাঁহার রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করতঃ সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর যুগলমূর্ত্তি উত্তমরূপে সাজাইয়া বার চৌকির উপরে বসাইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করেন। সন্ধ্যার পরে উক্ত রাজা বাহাদুর বহু লোকজন সমভিব্যাহারে আসিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, অধিকারী মহাশয়দের জনপ্রাণীও তাঁহাদিগকে বাধা দিবার নাই। তিনি শ্রী শ্রী ৺জীউর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্তম্ভিত হইলেন—বহুক্ষণ মোহাবেশে বসিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে দোয়াত কলম কাগজ আনিতে আদেশ করেন ও বড়বেলুন ও ভাটাকুলের মধ্যস্থলে ১ বন্দ ১০০ বিঘা নাখরাজ জমি শ্রী শ্রী ৺জীউর নামে দান পত্র লিখিয়া নিঃশব্দে মন্দির হইতে পলায়ন করেন। কিছুক্ষণ পরে অধিকারী মহাশয়গণ আসিয়া দেখিলেন, প্রভুজীকে তাঁহারা যেরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই রূপেই আছেন—কেহ স্পর্শও করেন নাই; অধিকন্তু দানপত্র দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

তখন হইতে নিত্যসেবা মহোৎসবাদি আর ভিক্ষা দ্বারা নিষ্পন্ন হইত না, সম্পত্তির আয় হইতে ঐ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এইরূপে বহুদিন গত হইলে সন ১১৩৪ সালে বড়বেলুন গ্রামে বৈদ্যনাথ আচার্য্য নামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধমান রাজসরকারে এক দরখাস্ত করেন যে এই সেবা রাজসরকার হইতে অধিকারীগণকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া জমিজায়গা দিয়াছেন, কিন্তু সেবাইতগণ বরাতিমত দেবসেবা ও অতিথিসেবা করিতেছে না; অতএব হুজুর হইতে অন্যলোক বাহাল করিবার আজ্ঞা হয়; অমনি কোনরূপ বিচার না করিয়া রাজসরকার হইতে গোমস্তা আসিয়া অন্য লোক বাহাল করিয়া যান তাহাতে অধিকারী মহাশয়গণ নিরুপায় হইয়া মুর্শিদাবাদের তৎকালিক নবাব সিরাজুদৌল্লা বাহাদুরের নিকট গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে, নবাব বাহাদুর

এক পরোয়ানা দেন। তাহাতে বর্দ্ধমানের রাজাবাহাদুর বিচার করিয়া গোমস্তা উঠাইয়া দেন। বর্দ্ধমান রাজসরকারের এই সেবা সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার একটু কারণ আছে। মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণরাম রায় বাহাদুরের আমলেই বড়বেলুন গ্রামে ও অন্যান্য গ্রামে দুইশত বিঘা নাখরাজ জমি দান করেন এবং মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বাৎসরিক একশত তেষট্টি টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। কালক্রমে ঐ নগদ বৃত্তি কোন অজ্ঞাতকারণ বশতঃ বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

সাধক কবি নীলাম্বর

শ্রী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

মাতৃভক্ত সাধক সুকবি স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় রাঢ়ীয় খড়দহ মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দেবীপুর ষ্টেসনের সংলগ্ন, ষ্টেসনের সংলগ্ন ঠিক দক্ষিণদিকে অবস্থিত আলিপুরের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশে সন ১২১২ অথবা ১২১৩ সালের ৺শ্যামাপূজার রাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নীলাম্বরের ধর্ম্মভাব বৈরাগ্য বংশের গুণ! তাঁহার পিতার খুল্লতাত-ভ্রাতা (খুড়তুতো ভাই) বাণেশ্বর বিবাহের অল্পদিন পরে অল্প বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং ৫০ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বৃদ্ধা পত্নীকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দেন। বাণেশ্বর ৫০ বৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকিলেও তাঁহার পত্নী পঞ্চাশ বৎসরই সধবাভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

নীলম্বর প্রায় ৪০০শত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব ও হুগলীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত স্থানসকলে অনেকে তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীত তাঁহার অনুগত ভৃত্য, ভক্ত, শিষ্য চণ্ডীগায়ক স্বর্গীয় সনাতন দাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন। সনাতন জাতিতে দুলে (ডুলে) ছিলেন। নীলাম্বরের রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত বঙ্গের নানা স্থানে নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত ও ভাষান্তরিত হইয়া গীত হইলেও একটি মাত্র মধুর সঙ্গীতই তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান রাখিয়াছে। নীলাম্বর "তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল্?" গীতটির জন্যই অমর হইয়া থাকিবেন। গীতটি এখনও লক্ষকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। ইহা তাঁহার কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

নীলাম্বর যথারীতি পঞ্চম বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করিয়া পাঠশালায় প্রেরিত হইলেও লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযাগী হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান আনন্দ ছিল ঠাকুরগড়া, পূজা করা ও সেই ঠাকুর বিসর্জ্জন দেওয়া। পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, পাড়ায় পাঁচজন সমবয়স্কদের সমভিব্যাহারে বনফুল তুলিয়া সেই ঠাকুরের পূজা করিতেন; আবার সেই দিনই বৈকালে মুখে "গিজ্জিম্‌শো গিজ্জিম্‌শো" বাজ্‌না বাজাইয়া সেই ঠাকুর নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিতেন। তাঁহার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন বা গ্রামবাসী কেহই তখন বুঝিতে পারেন যে, উত্তরকালে এই ঠাকুরগড়াই তাঁহার বৈরাগ্যের কারণ হইয়া উঠিবে, এই ঠাকুরগড়াই তাঁহাকে মাতৃভক্ত সাধকে পরিণত করিবে।

লেখাপড়ায় তাঁহার মনোযোগ না থাকিলেও তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একবার যাহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিতেন, দ্বিতীয়বার আর তাহা শ্রবণ বা অধ্যয়নের প্রয়োজন

হইত না। তাঁহার পাঠশালার গুরুমহাশয় গঙ্গাধর ঠাকুর তাঁহার মেধা ও স্মরণশক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। নীলাম্বর একাদশবর্ষ বয়সে উপনয়নের পূর্ব্বেই কাগজে মহামহিম লেখা এবং শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত শিশুবোধক পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন উহাই বাঙ্গলা ভাষায় এম্, এ, পরীক্ষা ছিল।

উপনয়নের পর নীলাম্বর গ্রাম্যটোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ণ করিয়া, ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের উপযুক্ত বংশধর, তৎকালীন বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত দেবীপুরের হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের নিকট ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সংসারে অনাস্থা হয় এবং তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন।

নীলাম্বর অবিবাহিত ছিলেন। পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সহস্র অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই।

মামারাকপুরের একটি দুলে পরিবার তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ভক্ত ছিল। ইতিপূর্ব্বে যে চণ্ডীগায়ক সনাতন দাসের নামোল্লেখ করিয়াছি, সেই সনাতনের গর্ভধারিণীকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। সনাতনই তাঁহার সর্ব্বস্বের অর্থাৎ পীঠস্থান ও সঙ্গীতাদির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সনাতন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ঐ আশ্রমে পীঠস্থানে সন্ধ্যাদীপদান করিতেন; প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সঙ্গীত-সাধনা করিতেন মাতৃগুণ গান করিতেন।

দেবীপুর ষ্টেসনের ঠিক উত্তরপূর্ব্বকোণে একটি আম্র বাগানের পূর্ব্বপার্শ্বেই একটি পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর বায়ুকোণে পাহাড়ের উপর শ্রী শ্রী ৺কালীকাদেবীর ঘর, নৈঋত কোণে তাঁহার সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্ডির আসন। তিনি যে ইষ্টকনির্ম্মিত স্থানটিতে সর্ব্বদা উপনিবেশ করিতেন, সেটি তাঁহার সাধন-পীঠ, যোগ-পীঠ। সেটি এখনও বিদ্যমান থাকিয়া সেই একশত বৎসর পূর্ব্বের কত অতীত ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দেবীপুর অঞ্চলে অনেকসময় তিনি রামপ্রসাদ নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহার সমবয়স্ক সহাধ্যায়ী, মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব দ্বারকানাথের খুল্ল-মাতামহ, হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের পঞ্চম পুত্র অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (কুলকর্ত্তা) মহাশয় নীলাম্বরকে রামপ্রসাদ ও দ্বারকানাথকে আজু গোঁসাই বলিয়া অভিহিত করিতেন। দ্বারকানাথ তখনকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজভুক্ত, সুন্দর সুপুরষ, সুকণ্ঠ গায়ক; অভিজ্ঞবাদক এবং হাস্যরসরসিক সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি সরস টপ্পা এখনও বঙ্গের নানা স্থানে গীত হইয়া থাকে। নীলাম্বর কার্য্যানুরোধে দেবীপুর গমন করিলে অনেক সময় দ্বারকানাথ নীলাম্বরের কোন একটি সঙ্গীত নিজ মধুরকণ্ঠে গায়িয়া স্বরচিত রহস্য-সঙ্গীতে তাঁহার উত্তর প্রদান করিতেন।

এইস্থলে নীলাম্বর ও দ্বারকানাথের একটী সঙ্গীত-যুদ্ধ বিবরণ ও উত্তর-প্রত্যুত্তর যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

নীলাম্বরের সঙ্গীত—

তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল্।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
দারাসুত বেঁধে চরণে শিক্‌ল।।
দিয়ে মায়াবেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারলেম মোক্ষফল—
এবার হলোনা হলোনা, ওমা শবাসনা,
সংসার-বাসনা বড়ই প্রবল।।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল—
হয়ে অর্থ-অভিলাষী, সদানন্দে ভাসি,
কেলে সর্ব্বনাশী কত জান ছল্।।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলম্বরের জ্বলে দুঃখানল্,
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই
ফণা ধরে খাই হলাহল।।

দ্বারকানাথের উত্তর-সঙ্গীত—

সংসার সুখদ, নহে হে গারদ,
নীল-নীরদ, জেন এটা মনে।
ছয় দূত মশিল্, কোথা করে তশীল্,
(বরং) সুখ-সলিলে তারা ভাসায় ক্ষণেক্ষণে।।
দারাসুত নহে চরণে শৃঙ্খল,
আইবুড়ো কার্ত্তিক তুমি কিসে জান্‌বে বল্?
ইহকালেই তারা দেয় মোক্ষফল,
সামান্য সাধ্যসাধনে।।
প্রাতঃকালে উঠি, কোথা ছুটোছুটি,
দিব্বি বসে থাক মুখোমুখী দুটি,
মায়ের কাছে কেন মাথা কুটোকুটি,
হেরি না অফূর্ত্তি বদনে।। (তোমার)

দুঃখানলে কোথা জ্বলে তব হৃদি,
বেঁচে থাকুক মোদের কাদম্বিনী দিদি,
সুখের সায়রে ভাসাক্ নিরবধি (দাদা তোমায়)
দ্বিজ দোয়ারী বচনে।।

নীলাম্বর অনেক সময় অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। একদিন তাঁহার আলিপুরের বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সকলেই মহা চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তালপত্রের আটচালা প্রস্তুত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভোজনের কোন গোলযোগের সম্ভবনা নাই; কিন্তু পরিবেশকগণ আব্দার ধরিলেন, এ জলে ভিজিয়া পরিবেশন করা যাইবে না! "ঠিক কথা, এত জলে ভিজিয়া কাজ করা কি মানুষের সাধ্য।" এই কথা বলিয়াই নীলাম্বর একটু অন্যমনস্ক হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া গান ধরিলেন—

বড় ঘোর করি ঘিরে নিলে
মায়ামেঘে জননী।

* * * *

অবিশ্রান্ত বহে ধারা,
এ যাত্রা রাখ্ মা তারা,
নীলাম্বরকে ত্বরায় তারা
হারা-রোধহারিণী।।

গানটি শেষ হইবার পরই বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল; সূর্য্যদেব পুনঃ প্রকাশিত হইলেন, বেশ সুশৃঙ্খলায় ব্রাহ্মণভোজনাদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

নীলাম্বরের সাধন-পীঠের পশ্চিম উত্তরে মামারাকপুর, পূর্ব্বে পানিপাড়া নামক গ্রাম, দক্ষিণে রেলরাস্তা, তাহার দক্ষিণে বোরাগড় গ্রাম। আলিপুর স্থানটি ঠিক নৈঋত কোণে অবস্থিত। স্থানটির জমিদার ছিলেন বর্দ্ধমান কাইগ্রামের খ্যাতনামা জমিদার ধর্ম্মদাস মুন্সী। মুন্সীমহাশয় নীলম্বরকে বিনা-খাজনায় স্থানটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন "আমার ন্যায় অধমের জমিদারীতে যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের প্রত্যহ পদধূলি পড়িবে, ইহাই আমার চৌদ্দপুরুষের সৌভাগ্য!" কিন্তু ধর্ম্মদাস বাবুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ক্ষেত্রমোহন, সূর্য্যকান্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-নন্দনকে নায়েবপদে বরণ করিয়া প্রেরণ করেন! সূর্য্যকান্ত নীলাম্বরের "সব ভণ্ডামী" স্থির করিয়া, হুকুম জারি করিলেন "মুকুর্য্যে মহাশয়, ঠাকুর করুন, দেবতা করুন, খাজনা দিতে হইবে।" নীলাম্বরের ভক্ত-শিষ্য অনেকেই সূর্য্যকান্তকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—"সূর্য্যকান্ত নাছোড়বান্দা। ঘটনাচক্রে একদিন নীলাম্বর শুনিলেন যে, জমিদার ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং কাছারীতে শুভাগমন করিয়াছেন। নীলাম্বর অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভাতে কাছারীতে উপস্থিত হইয়া গান ধরিলেন—

ক্ষেতু, কি হলি কি হলি ক্ষিতিতলেতে।
এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হেরি রে তোতে।।
কর্‌লি ধর্ম্মদাসের ধর্ম্মনষ্ট,
তাইতে বড়ই পাই কষ্ট,
দূরদৃষ্ট জন্মিল রে তো হতে;—
বামুনের সন্তান, সূর্য্যি বুদ্ধিমান,
হারালো স্ববৃত্তি বুঝি নিয়ে আত্ম-সম্মান;
এমন পাপবুদ্ধি আশ্রয় কল্লে, শুধুরে তোর কথাতে।।

রোষাবাদি নয় কো শুলি,
কলিতে জাগ্রত কালী,
সে কালীতে কালী দিলি কলিতে,—
কি আর বলবো রে তোকে,
কুলা ব্রাহ্মণরিপু জান না কি মনেতে।।

ক্ষেত্রমোহন নীলম্বরের সেই তেজব্যঞ্জক সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার খাজনা মাপ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ক্ষেত্রমোহন নীলম্বরের কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহন স্থানটির খাজনা রেহাই করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, মাসিক কিছু বৃত্তি বরাদ্দও করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ মঙ্গলার্থে প্রতিবৎসর বিশেষ ধূমধামের সহিত মা-কালীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

ভারত রেলওয়ে-সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থানান্তর-গমন অথবা মালপত্র আমদানী রপ্তানী নৌকা যোগেই সম্পন্ন হইত। অনেক সময় মাল আমদানীর ফেরত নৌকায় অনেকে দূর-দূরান্তর যাইতেন। তখন লোকে গয়া কাশী বৃন্দাবন যাইতে হইলে হুগলী কাল্‌না কাটোয়া প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী বন্দরগুলিতে যাইয়া অপেক্ষা করিতেন। সপ্তগ্রামের বৈশ্যভাব আমাদের এ অঞ্চলে সংক্রামক হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আমরা সেদিনও দেখিয়াছি, আমাদের অঞ্চলে তিলি তাম্বুলী সদগোপ উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল জাতিই ব্যবসায়ী ছিলেন; অনেকেরই বড় বড় কারবার ছিল। দেবীপুরের জমিদার সিংহবাবুরা মহাজন হইতেই জমিদার হইয়াছেন। তাঁহাদের কলিকাতা এবং কাল্‌নাই সদর গদী—"হেড্ আপিস ছিল; পরে কাল্‌না উঠিয়া যায়। কাল্‌না সহরের অংশবিশেষ এখনও তাঁহাদিগেরই জমিদাবী। কালনার সিংহবাবুদের গদী আমরাও দেখিয়াছি। সেই গদী-বাড়ী ও প্রকাণ্ড পাকা গুদাম মা-গঙ্গা উদরসাৎ করিয়াছেন—সেখানে এখন গঙ্গার

মধ্যস্থল। ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নীলম্বর কাশীদর্শনের জন্য ব্যকুল হইয়া উঠেন এবং দেবীপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সিংহ মহাশয়দিগের পিতৃদেব স্বর্গীয় বঙ্কুবিহারী সিংহ মহাশয়ের নিকট নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। বঙ্কুবাবু সসম্ভ্রমে তাঁহাকে তৎকালীন কালনার গদীয়ান মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি পাটনার ফেরত-নৌকায় পাটনার গদীয়ান (বর্দ্ধমান কোঙারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল রায়) মহাশয়ের উপর কাশী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার হুকুমনামা সহ প্রেরণ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কাশী-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাটনা যাইবারকালীন পথিমধ্যে নৌকাতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। পাটনায় পৌঁছিলে তাঁহার চিকিৎসার ত্রুটী হয় নাই। পাটনার সাহেব ডাক্তার পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তিনি আশ্বিন মাসে পাটনাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন রচিত সঙ্গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। এই গানটিতে তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হইয়া যায়—

কাশীতে স্থান পেলাম না শোনরে।

পাটনাতে সিঙ্গিদের গদী,
এখানে হলো সমাধি,
ঘরে কাদম্বিনী ভগ্নী
তাবে অন্ন দিওয়ে।।

গানটি সম্পূর্ণ না পাইলেও ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে, কাশীধাম গমনকালীন কাদম্বিনী বা খোঁড়া তাঁতিনী কিংবা অন্য কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যান নাই। তবে সনাতন সঙ্গে ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাদম্বিনীর জন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন। সনাতন রামলাল রায় মহাশয়ের সহিত রেলগাড়ীতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তখন রেল খুলিয়াছে; কিন্তু বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া তখন পর্য্যন্ত লোকে নৌকাতেই গমনাগমন করিত। তিনি কাদম্বিনীর ভার সনাতনের উপরই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলাম্বরের মৃত্যুর পর কাদম্বিনী তিনমাসের অধিককাল জীবিত ছিলেন না। পাটনায় তাঁহার মৃত্যু অলৌকিক ভাবেই হইয়াছিল। সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি কোনরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। মৃত্যুর দিন প্রাতে রামলাল বাবুকে বলিয়াছিলেন "রামলাল, আজ আমি গঙ্গাস্নান করিব।" রামলাল পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "অসুস্থদেহে গঙ্গাস্নান কি সহ্য হইবে? বিশেষতঃ গঙ্গা এখান হ'তে অনেকটা দূরে!" তিনি উচ্চহাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "রামলাল, বাবা? আজ যে কতখানি যেতে হ'বে, তার ঠিক কি ? এই সামান্য রশি-কতক পথ যেতে ভয়-খেলে চল্‌বে কি করে?" রামলাল কথাটির মর্ম্ম

অবগত হইয়া রহস্যভ। ব বলিয়াছিলেন—"বাবা গঙ্গাদেবী ত বিমাতা, আজ বিমাতার উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি কেন?"

"বাবা রামলাল, মাতৃদর্শনেচ্ছু সন্তান মাতৃদর্শন না পাইলে, মাতা সন্তানের সহিত প্রতারণা করিলে, সন্তান অভিমানে বিমাতার অঙ্কেই আত্ম-সমর্পণ করে। কাশীতে মাতৃদর্শন ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছিলাম। মা যখন কৃপা করিলেন না, তখন এ অবস্থায় কি আর অমন দয়াময়ী বিমাতাকে পরিত্যাগ করিতে আছে? বিশেষ অজ্ঞান শিশু আমরা; যিনি স্নেহ করবেন, তাঁরই কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ব? রামলাল, অমন বিমাতা কি আর জগতে আছে? লোকে বলে 'গঙ্গা মরা আলে না।' আহা হা, করুণাময়ী মা আমার আবহমানকাল সপত্নী-পুত্রদের জন্য কোল পাতিয়া বসিয়া আছেন, পাপী হউক, তাপী হউক, সংসারী হউক, সংসার-বিরাগী হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, দয়াময়ী বিমাতার নিকট সকলের সমান আদর, সমান সম্মান। রামলাল, আর বিলম্ব ক'র না। সনাতন, আমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে চল ভাই!"

রামলাল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। মহাপুরুষ গঙ্গাস্নান করিয়া যথাবিহিত নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী পূজা আহ্নিক যপতপ সমাধা করিয়া জলের উপর যোগাসনে-বীরসনে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে, "মা তারা, মা কালী, মা করুণাময়ী, দয়াময়ী, এ দীন সন্তানকে কোলে নে মা!" "মা তারা, মা কালী' প্রভৃতি বারবার উচ্চারণ করিতে করিতে চক্ষু স্থির করিলেন; প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়াই বাহির হইয়া গেল। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই মাতৃ-সন্নিধানে নিবেদন করিয়া রাখিয়াছিলেন—

আমার বাসনা এই মনে।
অন্তে যেন যায় মা জীবন জাহ্নবী-জীবনে।
প্রাণ যেন যায় মা ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে।

ইত্যাদি রামলাল, সনাতন ও সমবেত জনসঙ্ঘ হাহাকার করিতে লাগিলেন। সব ফুরাইয়া গেল। ৬৫ বৎসর বয়ক্রমকালে আশ্বিন পূর্ণিমায় ১২৭৭ অথবা ১২৭৮ সালে তিনি নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সৎকার সমাধা হইল, সনাতন চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

বাল্যকালে সনাতনকে আমরা দেখিয়াছি—সনাতনের চণ্ডীর গান শুনিয়াছি। তিনি গান গায়িবার সময় দক্ষিণহস্তে একখানি বাজুর ন্যায় স্বর্ণ-নির্ম্মিত কবজ ধারণ করিতেন। কেহ কেহ বলেন, নীলাম্বর তাহাকে রক্ষা-কবচ দিয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতেন "সনাতন নীলাম্বরের চিতাভস্ম কবজে পূরিয়া রাখিয়াছেন।" সাধারণের বিশ্বাস ছিল, গান গায়িবার সময় ঐ কবজখানি ধারণ না করিলে সনাতন গান গায়িতে পারিতেন না।

মিরজা হোসেন আলী

শ্রী বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আমি যে মহাত্মার কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার নাম মিরজা হোসেন আলী। ইনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বরদাখাত পরগণার থোল্লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেই অঞ্চলে একজন প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। কোন বিশেষ ঘটনায় তাহার জীবন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং মধ্যজীবনেই ভোগলালসা ও পার্থিব ধন-সম্পদে বীতস্পৃহ হইয়া ইষ্টচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সাধনপ্রণালীর একটী বিশেষত্ব আছে: তাহা সকলের শুনিবার যোগ্য। তিনি মুসলমান হইয়াও হিন্দুর-অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং হিন্দুর কৈবল্যদায়িনী কালী-মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারা চৈতন্য-লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর হইতে তিনি কালীপূজা ও কালীগুণকীর্ত্তনেই অবশিষ্ট-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতগুলি তৎকালে অত্যন্ত আদৃত ছিল। এই সঙ্গীতগুলি যদিও অলঙ্কার ও বাক্যচ্ছটাবিহীন, কিন্তু ভক্ত-সাধকের প্রাণের কথা বলিয়া, ভাব-সম্পদে পূর্ণ ও উপভোগের সামগ্রী।

সাধক মিরজা হোসেন আলীর সঙ্গীতগুলি পলাসীর যুদ্ধের কিছুকাল পরে রচিত। কোন কোন সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা অতি বিশুদ্ধ। মিরজা হোসেন আলীর জীবন-সম্বন্ধে এ দেশে অনেক প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে দুইটী প্রবাদ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অধিকাংশ লোকেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন। কি করিয়া মিরজা সাহেবের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি কালী-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এই সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে। তিনি একদিবস বাহির-বাড়ীতে কাছারীঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় পক্ক কাঁটালের গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি সভাসদ্‌গণের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। অবশেষে মিরজা সাহেব জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীকে আনাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী বলিলেন, "আপনার জমিদারীর অন্তর্গত অমুক গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ-বালক তাহার পিতার বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়াছে। শ্রাদ্ধে সে পক্ক কাঁটাল দিয়াছিল। আপনি তাহারই গন্ধ অনুভব করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্ব-জন্মে এই ব্রাহ্মণ-বালকের পিতা ছিলেন।" মিরজা সাহেব কথাটা তত বিশ্বাস করিলেন না; তাই অনুসন্ধানার্থ নিজে ছদ্মবেশে কথিত গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও ব্রাহ্মণ-বালকের সন্ধান পাইলেন। মিরজা সাহেব যখন দেখিলেন শ্রাদ্ধের সময় ও তারিখ মিলিয়া গেল,

তখন তিনি নিজের আগমন-উদ্দেশ্য বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কথিত আছে, সেই ব্রাহ্মণ-বালককে নিয়মিতরূপে তাহার পিতৃ-শ্রাদ্ধ করার জন্য তিনি একটী তালুক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মিরজা সাহেব অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, বালকের পিতার মৃত্যুর তারিখ তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার মনে বিষয় বাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে এবং কি করিয়া ধর্ম্মাত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা যায়, তজ্জন্ন তিনি আকুলপ্রাণে উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া সব-ডিবিসনের অন্তর্গত ও নিকটবর্ত্তী ভাদুঘর গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি ৺বাণচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন ও কৈবল্যদায়িনী কালীনামে চৈতন্যলাভ করেন। তিনি ক্রমশঃ পূজা ও কীর্ত্তনে এতদূর মত্ত হইয়া পড়েন যে, একটীর পর আর একটী তালুক ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইতে থাকে; কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। কথিত আছে, এরূপভাবে এক একটী তালুক গেলেই তিনি মাকে যোড়শোপচারে পূজা করিতেন ও বলিতেন "মা, একটা বন্ধন গেল।"

মিরজা সাহেব হিন্দু-সম্প্রদায়ের দেবতার পূজক ও কালীনামে মত্ত ছিলেন বলিয়া, ঢাকা নগরের মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'ন, এবং যাহাতে তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মতানুসারে চলেন, তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পান; কিন্তু মিরজা সাহেব কুলে, মানে ও বিত্তে সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপান্বিত ব্যক্তি; কাজেই কেহই তাঁহাকে প্রকাশ্যে কালীনাম পরিত্যাগ করিয়া 'তৌজ' করিতে বলিবার সাহস পান নাই। অবশেষে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া মক্কা-সরিফ হইতে চারিজন 'মোমিন' অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা আনিয়া মিরজা সাহেবকে 'দীনে' অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মের রীতিমত রোজানমাজে আনয়ন করিবার চেষ্টা পান এবং পাথেয় পাঠাইয়া চারিজন মোমিন আনা হয়। তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা হাউলি ভাড়া করা হয় ও মিরজা সাহেবকে সকলে মিলিয়া একটা পত্র দেন যে, আগামী অমুক তারিখ শুক্রবার অমুক হাউলীতে মক্কা হইতে আগত মোমিনগণ সহ নমাজ পড়িয়া বাধিত করিবেন। মিরজা সাহেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই নমাজ পড়িতে সমবেত হইলেন; কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তথাপি মিরজা সাহেব আসিতেছেন না, দেখিয়া ক্রমে দুই একজন করিয়া হাউলীর তোরণদ্বারে সমবেত হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, যখন মিরজা সাহেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন না আসিবার কোন কারণ দেখি না। যদি আমরা ফিরিয়া যাই ও তিনি আসিয়া ফিরিয়া যান, তবে বড় লজ্জার কথা; শুধু লজ্জা নহে একান্ত অন্যায়ও হইবে। এমন সময়

পশ্চাৎ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে ফিরিয়া আসুন; মিরজা সাহেব মসনদে সুখে বসিয়া রহিয়াছেন ও হাসিতেছেন।" তখন সকলে মিরজা সাহেবের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন "আমরা আদব বাজাইতে পারিলাম না, 'সরমিন্দা' হইলাম।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "হুজুর কোন দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আমরা ইহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইলাম না" ইত্যাদি। এই সব ভদ্রতাসূচক বাক্য বলাবলি শেষ হওয়ার পর, মিরজা সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধোগণ, আমাকে এই হাউলীতে আসিতেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি আপনাদের নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়াছি এবং আসিয়াছি। কি করিয়া আসিয়াছি, ইহার উত্তর পাওয়ার জন্য এত গোল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক।" তখন নিমন্ত্রণকারী ভদ্রমহাশয়গণ মোমিনদিগকে মিরজা সাহেবকে 'দীনে ফিরিবার' উপদেশ দিতে অনুরোধ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। তখন একজন মোমিন দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনারা মিরজা সাহেবকে যাহা বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে আনাইয়াছিলেন, মিরজা সাহেব ইহার খাসা জবাব দিয়াছেন।" কেহ কেহ অধীরতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" মিরজা সাহেব হাসিতে লাগিলেন। মোমিন বলিলেন "গমনশীল ব্যক্তি যেখানে পৌঁছিবে বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, সেই স্থানে পৌঁছিতে পারিলেই তাহার যাত্রা সার্থক হইল; পৌঁছাইবার রাস্তা সোজা হউক, আর বক্র হউক, তাহার বিচার অনাবশ্যক। সৃষ্টি কর্ত্তা এক; তাঁহাকে ইংরাজী, ফারসী, সংস্কৃত ও নাগরী, যে ভাষায়, যে মন্ত্রেই হউক, ভক্তিযোগে উপাসনা করিলে সিদ্ধকাম হওয়া যায়। মিরজা সাহেবের কালী-নামেই আল্লা বোধ হইয়াছে; ইহাই তাঁহার খোদার নিকট পৌঁছিবার রাস্তা। আপনারা আর কি বুঝিতে চান?" সকলেই ইহার পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মিরজা সাহেব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর আরও গল্প আছে। যদিও বিস্তৃতরূপে তাঁহার জীবনী-আলোচনার সুযোগ পাই নাই, তথাপি তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক বলিয়া সকলেই ভক্তি করেন।

তিনি একাধারে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, অথচ ভাবুক কবি। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি, উচ্চাঙ্গের ভাব-পূর্ণ—কোনরূপ সাম্প্রদায়িক-ভাবদুষ্ট নহে। ইহা মাতৃভক্ত ভক্ত-সাধকের সরল প্রাণে সরল কথা। ভাষার ঝঙ্কার নাই, বাক্যচ্ছটা নাই, তবু অতি মনোরম ও মর্ম্মস্পর্শী। কোন কোন গান এমনই মধুর যে, যখনই এইগুলি শুনিয়াছি, তখনই "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো" অবশেষে "আকুল করিল প্রাণ।" অসংখ্য সঙ্গীতের মধ্যে সংগৃহীত দুইটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করা গেল। ইহা হইতেই সকলে মিরজা সাহেবের সম্বন্ধে একটা আভাস পাইবেন।

তাল কাওয়ালী

১. সকলই করিতে পার কালী!
এ গো মা, সকলই করিতে পার কালী!
ত্বং কালী করালী বনমালী।
কখন রত্ন-সিংহাসন, কখন পাঠাও বন,
কখন বৃন্দাবনে বনমালী।
মাগো সময়ে সঙ্কটভয়,
তুমি বিনে কেহ নয়,
তার সাক্ষী মিরজা হোসেন আলী,
মাগো কালী বলে দিচ্ছি করতালি।

২. শমন তোমারে কি ডরি,
যার গুরু আছে কাণ্ডারি।
কর না মন জাগাজুরি,
সামনে আছে জজ-কাছারী,
জামিন দিব ত্রিপুরারী।
কহে মিরজা হোসেন আলী,
যা কর মা জয়কালী
পুণ্যেতে মোর শূন্য দিয়ে .
পাপ নিয়ে যাও নীলাম করি।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবও এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার কর্ম্ম, নাও তোমার অকর্ম্ম, শুধু দাও আমায় ভক্তি।"

দ্বিজ রামপ্রসাদ

শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামপ্রসাদের সুমধুর গান বঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সমভাবে সমাদৃত। এই সঙ্গীত-তরঙ্গে বহুদিন ধরিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত রহিয়াছে। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ধর্ম্ম-ভাবের যে অনুপ্রাণনা রহিয়াছে, সঙ্গীতের সম্প্রসারণের সহিত কেবল তাহারই সম্বন্ধ নাই। তাহাই যদি থাকিত, তবে যেখানে-সেখানে, সুস্থানে-কুস্থানে প্রসাদ-পদাবলীর এত আদর হইত না। রামপ্রসাদের প্রসাদগুণবিশিষ্ট একান্ত সরল রচনাই, এই বিস্তৃতির প্রধানতম কারণ। সাধাসাধি নাই—মাকে যেমন করিয়া পুত্র প্রাণের টানে আকুলকণ্ঠে ডাকে, প্রসাদও তেমনই করিয়া জগন্মাতাকে আহ্বান করিয়াছেন। উপমা বা উৎপ্রেক্ষার দিকে নজর রাখিয়া—সাহিত্যের খুঁটীনাটী, শুদ্ধাশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, রামপ্রসাদ সঙ্গীত রচনা করেন নাই—করিলে তাহা এমন মনোমুগ্ধকর হইত না। প্রসাদের সঙ্গীতের মধ্যে কোথাও আয়াস দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই একান্ত সরল প্রাণের সরল ভাবোচ্ছাস মাত্র।

প্রসাদের পদাবলী যেমন সর্ব্বত্র সমাদৃত, প্রসাদ কিন্তু তেমনভাবে পরিচিত নহেন। প্রাণ-আরাম সঙ্গীত পাইয়া মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে,- —সঙ্গীত-রচনাকারীকে জানিবার জন্য আর কিছুমাত্র ব্যাকুলতাই নাই। বর্ত্তমান যুগে আত্ম-প্রকাশের যে প্রাণপণ আগ্রহ দৃষ্ট হয়, সেকালে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বিশেষতঃ সাধক রামপ্রসাদ "বাঙ্গলার মধ্যে ভাঙ্গা ঘরে এক্‌লা পড়িয়া" থাকিতেন। মায়ের নামের জোরে তিনি শমনকেও ভয় পাইতেন না। এ হেন ব্যক্তির পক্ষে নাম কিনিবার জন্য সঙ্গীত-রচনার সম্ভাবনা কোথায়?

এখন প্রশ্ন হইতেছে, রামপ্রসাদ কে, কোথায় বাড়ী এবং তাঁহার সাধনার স্থানই বা কোথায়?

বিগত ১৩১৯ সনের শ্রাবণ মাসে ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে আমি দ্বিজ রামপ্রসাদ শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী ঐ সনের চৈত্র-সংখ্যা 'প্রতিভা' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমি যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এ স্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে রামপ্রসাদের পদাবলী সংগ্রহে চেষ্টিত হ'ন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। দয়ালবাবু—

" ধরাতলে বিখ্যাত কুমারহট্ট গ্রাম,
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণরাম।"

অবলম্বন করিয়া হালিসহরে রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত পূর্ব্ব-বঙ্গেও এক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, তদীয় সাধক-সঙ্গীতের ভূমিকায় এই দ্বিতীয় রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা সম্প্রতি দুইজন রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছি। একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ, দ্বিতীয় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। কবিরঞ্জন সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানারূপেই আলোচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী নরসিংহদী ষ্টেসনের অনধিক দুইক্রোশ দূরেই চিনিসপুর গ্রাম। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে চিনিসপুর ভীষণ অরণ্য-পরিপূর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল স্থান ছিল। দিনের বেলাতেও কেহ একাকী চিনিসপুরের মায়ের বাড়ীতে যাইতে সাহসী হইত না। সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল, চিনিসপুরের জঙ্গলের বাঘগুলি কালীমায়েরই প্রতিপালিত। এখন আর সেদিন নাই। এখন চিনিসপুরের কালীবাড়ীই, তত্রত্য বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একমাত্র ছায়াপ্রাপ্তির আশ্রয়যোগ্য স্থল। কৃষকের ভূমির অতৃপ্ত ক্ষুধা এবং ভূম্যধিকারিগণের করগ্রহণের অফুরন্ত আকাঙক্ষায় দেশের জঙ্গল প্রায় উজার হইয়া আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গ সুন্দরীর স্নেহের কোলে লালিত-পালিত বিহঙ্গমকুল ও শ্বাপদবর্গ বিলুপ্ত।

রামপ্রসাদ গায়িয়াছেন—

"শিশুকালে পিতা মৈল রাজ্য নিল চোরে।" ইহাতে মনে হয়, রামপ্রসাদ ধনীর সন্তান ছিলেন। প্রবাদ, রাজা রামকৃষ্ণকে রাণী ভবানী দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ "মায়ের নামে ভক্তিতে ব্রহ্মময়ীর জমিদারী" কিনিবার জন্য গৃহত্যাগী হইলেন। এই প্রবাদ সত্য হউক, আর মিথ্যাই হউক, জনৈক রামপ্রসাদ চিনিসপুরে আসিয়া সাধনা আরম্ভ করেন এবং পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া দীর্ঘ জীবন ভরিয়া মায়ের নামগানে রত থাকেন।

শতাধিক বৎসরের প্রাচীন ব্যক্তি,—যিনি জীবনের দীর্ঘ সময় চিনিসপুরের নিকটেই যাপন করিয়াছেন; তাঁহার নিকটও চিনিসপুরের কালীবাড়ী এবং রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বহু বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। স্থানান্তরে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

আমরা সম্প্রতি উভয় রামপ্রসাদের পার্থক্য দেখাইতেই চেষ্টা করিব। রামপ্রসাদ-যুগলের মধ্যেও একটা গুরুতর ব্যবধান, উভয়ের পার্থক্য সযত্নে রক্ষা করিতেছে। একজন "গৃহী"। তিনি "দারাসুতের বেগার খাটিয়া" মরেন এবং তাঁহাকে আজু গোঁসাই ঠাট্টা করিয়া বলেন,

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটী।"

তিনি "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তবিলদারীর" জন্য মায়ের নিকট কান্নাকাটী করেন এবং বহুভূমি নিষ্কর পাইয়া দিন গুজরাণ করেন। "শ্রীনাথ দত্তের পটল সত্ত্বের ঔষধ" সেবন করিয়া রোগ দূর করিয়া থাকেন। আর একজন সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতের মানুষ। তিনি মায়ের এত আবদারে ছেলে, যে স্পষ্ট ভাষায় সগর্ব্বে বলিয়া বসিয়াছেন—

"মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।
ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
না হয়, দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না।"

এমন হৃদয়ের বল মায়ের আদুরে ছেলেতেই সম্ভবে। যিনি মায়ের যত সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই মায়ের উপর তত বেশী অভিমান করিতে পারেন। এইজন্যই গৃহত্যাগী, মহাপুরুষ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

" সুখ নিয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।"

বলিয়া জগতের যাবতীয় সুখকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিয়াছেন। আবার যখন, ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তখন মান-অভিমান ভুলিয়া মাকে ডাকিয়াছেন। মানবের নশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া গায়িয়াছেন,

"থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে,
ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।"

একবার মার সঙ্গে রাগারাগি, আবার ভয় পাইলেই মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত। ইনি শ্রীনাথের ঔষধ পত্রের ধার ধারেন না। রোগ-শোকের এলাকায় থাকেন না; স্বয়ং

"যখন শমন ধরবে এসে
ডাক্‌বে কালী কালী বলে"

বলিয়া নিদান ঔষধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ গঙ্গাতীরবাসী, আর ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ সগর্ব্বে বলিয়াছেন—

" কেন গঙ্গাতীরে যাব,
আমি, কেলে মায়ের ছেলে হয়ে,
বিমাতার কেন শরণ নিব।"

আবাব উপেক্ষা স্বরে বলিয়াছেন—

"কাজ কি আমার গিয়ে কাশী,
মায়ের পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।"

কখন বা গায়িয়াছেন—

"গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি মা
কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে
যদি আমার প্রাণ যায়।"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তন, শিবসঙ্গীত, বিদ্যাসুন্দর, প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন কালী, শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সকলেরই স্তবস্তুতি করিয়াছেন,-—আর একজন

"শিব দুর্গা রাধা কৃষ্ণ
সকল আমার এলোকেশী"

বলিয়া নিশ্চিন্ত। তিনি কালীর নামে সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। এমন কি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে গায়িয়া উঠিলেন,—

"নটবর বেশে, বৃন্দাবনে এ যে,
কালী হলি মা রাসবিহারী।"

তিনি সর্ব্বত্রই কালী দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ।

চিনিসপুরের রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ বহুকাল ধরিয়াই ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকেন এবং বৈশাখ মাসের অমাবশ্যা তিথিতে অগণিত বলি দেওয়ার জন্য ভক্তবৃন্দ সমবেত হ'ন। এদেশের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ রামপ্রসাদের নাম শুনিলে তাঁহারা চিনিসপুরের সিদ্ধপীঠ স্মরণ করিয়া সভক্তি প্রণাম করিয়া থাকেন; এবং প্রসাদ পদাবলীর রচয়িতা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীকেই উল্লেখ করেন।

চিনিসপুরের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—নরবলী। বাঙ্গালা ১২৬৬ সনে কি তাহার দুই এক বছর আগে, পাছে চিনিসপুরের কালীবাড়ীতে নরবলি প্রদত্ত হয়। জনৈক ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী বিশেষ কোন কার্য্যোদ্ধার মানসে রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠে নরবলি দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারেই নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল।

আমরা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করিলাম। উভয় রামপ্রসাদই আমাদের গৌরব। একজনের সঙ্গীত ও কবিতাবলী; আর একজনের হৃদয়ের অনাবিল উচ্ছ্বাস বঙ্গ সাহিত্যের অতুলনীয় গৌরবের সামগ্রী। সঙ্গীতকে সাহিত্য হইতে পরিবর্জ্জন করিলে চলিবে না। সুতরাং সাহিত্যের হিসাবে সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নহে। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যের যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বিধান করিযাছেন, যুগল রামপ্রসাদের সঙ্গীত অল্পাধিক পরিমাণে সেই সৌন্দর্য্যের পরিপুষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কবিরঞ্জন সাহিত্যের দিকে অনেক দূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনা

কাগজে কলমে লিখিত। আর ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ ভাবের মুখে গাহিয়া গিয়াছেন,—ভক্তগণ মুখে মুখে সেই সঙ্গীতরাশি রক্ষা করিয়াছেন।

চিনিসপুরের অশীতিপর বৃদ্ধ সেবায়িত মহাশয় বলিয়াছেন, রামপ্রসাদের লিখিত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি পুরাতন, কীটদষ্ট কাগজ বহুকাল পূর্ব্বে আবর্জ্জনা বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। জানি না সেই "ছাইয়ের" মধ্যে কত অমূল্য রতন লুক্কায়িত ছিল।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমি ভারতচন্দ্রের কাব্য ও কবি-শক্তির বিষয় কিঞ্চিত আলোচনা করিব; তবে বহু কথা বলিব না, যেহেতু কবি আলোচ্যগ্রন্থে আমাদিগকে বলিয়াছেন ঃ

"সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।"

অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিব-বিবাহ, অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য, অন্নপূর্ণার পুরী-নির্ম্মাণ, ব্যাসের কাশী-নির্ম্মাণ, বসুন্ধরে অন্নদার শাপ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, নলকুবের শাপ, ভবানন্দের জন্ম-বিবরণ প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত আছে এবং তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহর-বিজয়, ভবানন্দের দিল্লী-যাত্রা, ভবানন্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে বিচার করিতে গেলে অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মহাকাব্য নামের উপযুক্ত না হইলেও, ইহার অনেক স্থলে মহাকাব্যের লক্ষণ বর্ত্তমান আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের খণ্ডকাব্যগুলিতে প্রারব্ধ হইয়া মহাকাব্যের উচ্চ শৃঙ্গে উন্নতী হইয়াছিল। এই মহাকাব্যের যুগে আমরা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও গুণাকর ভারতচন্দ্রের নাম দেখিতে পাই। নানা অবস্থান্তরের পর বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান সময়ে আবার খণ্ডকাব্য-যুগে অবতরণ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্র স্বযত্নসম্ভাবিত কবি। তিনি অপূর্ব্ব কবি-শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি বাল্যে রাজপরিবারে লালিত, কৈশোরে ও যৌবনে পরান্নপুষ্ট, বাত্যাহত পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং প্রৌঢ়ে রাজপুরীর কোলাহলমধ্যে অবস্থিত হইয়া রাজানুগ্রহে বর্দ্ধিত। দেশের দুর্ভাগ্য যে, তিনি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। প্রকৃতি পাঠে বা নিসর্গ সন্দর্শনে তাঁহার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য বাহ্য-প্রকৃতি বর্ণনে তিনি তত দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

গ্রন্থারম্ভে বহু দেবদেবীর বন্দনা আছে। এই স্তোত্রগুলিতে কবির গভীর দার্শনিক ও পৌরাণিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে কবির ধর্ম্মভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভারতচন্দ্র সংযতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মাত্মা; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ভাষা অনেক স্থলে, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরে রুচিদুষ্ট হইয়াছে। রুচিমার্জ্জিত না হইলেও গ্রন্থখানি লোকপ্রিয় হইয়াছে। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারীর সংখ্যা খুব কম, যাঁহারা

অন্নদামঙ্গল পড়েন নাই। এখানেই ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব। অনেকে কাব্যখানিকে অশ্লীল বলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে রচনা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজনার জন্য ব্যবহৃত হয়, অথবা যাহা কবির বা লেখকের মনের কু-ভাব প্রকাশ করে, তাহাই অশ্লীল রচনা; উহা সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল; কিন্তু যে রচনার উদ্দেশ্য সমাজ প্রবিষ্ট পাপকে উন্মূলিত বা ধিক্কৃত করা, অথবা প্রচলিত সামাজিক রীতি সরলভাবে ব্যক্ত করা, তাহার ভাষা, রুচি ও সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। মহাভারতে ভগবান্ ব্যাস স্বীয় জন্ম-বিবরণ এবং পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম যে সরল ও স্পষ্টভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কি অশ্লীল বলা সঙ্গত? ভারতচন্দ্রের ভাষা অমার্জ্জনীয়রূপে রুচিদুষ্ট হইলেও উহাকে অশ্লীল বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। রুচিদুষ্ট কবিতা বাদ দিলে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী পড়া বন্ধ করিতে হয়। ইউরোপীয় সাহিত্যেও রুচিদুষ্ট কবিতার অভাব নাই। রুচির বিচার করাও একটু কঠিন। লোক বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন। আমরা এখন যাহাকে দুষ্টরুচি বলি, হয় ত ভারতচন্দ্রের সময়ে তাহাই সুরুচি ছিল; তাহা না হইলে বিদ্বণ্মণ্ডলী পরিবৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট অন্নদামঙ্গলের এত আদর হইবে কেন?

অলঙ্কারও রসকাব্যের প্রধান অঙ্গ। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যতগুলি অলঙ্কার ও রসের উল্লেখ আছে, অনুসন্ধান করিলে প্রায় সমুদয়গুলির দৃষ্টান্তই অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যাইতে পারে। দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণের জন্যও বোধ হয় অন্য গ্রন্থ আশ্রয় না করিলে চলে। যিনি যত বড় কবি, তাঁর তত দোষ। আমাদের এত বড় মাইকেলও দোষে-গুণে কবি। অন্নদামঙ্গলে শব্দের পারিপাট্য, পদের লালিত্য এবং শব্দের মোহিনী-শক্তি অপূর্ব্ব। এই মোহিনী-শক্তিতে বঙ্গের নরনারী আকৃষ্ট। এখানেই ভারতচন্দ্রের বিশেষত্ব। ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালী মুগ্ধ। এই গ্রন্থের ছন্দ-নৈপুণ্য, শব্দমাধুর্য্য ও সুললিত পদবিন্যাসে পাঠক বিস্মিত ও মুগ্ধ। ভারতচন্দ্র মার্জ্জিত বাঙ্গালা রচনার স্রষ্টা। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার বহু কবিতা বঙ্গীয় নরনারীর কণ্ঠে নিত্য উচ্চারিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থারম্ভে দেবদেবীগণের স্তুতির পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভ্যবর্ণন। সুতরাং এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, আশ্রয়দাতার স্তুতিতেই এই কাব্যের আরম্ভ। তবে সভাবর্ণন করিতে যাইয়া কবি বর্ণনাটীকে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

মধুর পদবিন্যাস ও শব্দের মোহিনীচ্ছটা ব্যতীত অন্নদামঙ্গলের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা বুঝিবার জন্য পাঠককে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হয় না। কবি

স্পষ্টভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অধুনা দেখিতেছি, যাঁহার কবিতা যত অস্পষ্ট, তিনি তত বড় কবি।

কেহ কেহ বলেন যে ভারতচন্দ্র "রতি-বিলাপ" বর্ণন করিতে যাইয়া মহাকবি কালিদাসের অনুকরণ করিয়াছেন। প্রতিভা দ্বারা নূতনত্ব ফলাইতে পারিলে অনুকরণ দোষাবহ হয় না। মাইকেল মধুসূদনের উপরও এরূপ অনুচিত আক্রমণ হইয়াছে, দেখিয়াছি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কবিকঙ্কণের একটী কবিতা অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"বদনমণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষদ্ গোঁপের রেখা" আমার বোধ হয়, ইহা অপহরণ নহে, ইহা বহু অধ্যয়ণের ফল। বহু অধ্যয়নের ফলে নিজের লেখায় অপরের রচনা অবিকল ভাবে আসিয়া পড়ে।

ভারতচন্দ্রের মানবচরিত্র-পরিজ্ঞান ক্ষমতা প্রশংসাহ। ঈশ্বরী পাটনী অন্নদার নিকট বর চাহিতেছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" পাটনী সাম্রাজ্য চায় নাই, লক্ষপতি হইতে চায় নাই; তাহার ন্যায় সামান্য পাটনীর পক্ষে যাহা চাওয়া সম্ভব, সে তাহাই চাহিয়াছে।

এখন কবির রচনায় অলঙ্কার নৈপুণ্যের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিতেছেন, "অলঙ্কার-শাস্ত্র তাঁহার (কবির) মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।" আমি বলি, অলঙ্কার-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্যই ভারতচন্দ্রের এত নাম, এত মান, এত খ্যাতি। যমক ত অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু "আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভূয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।" এমন সুন্দর সরল রচনায় বোধ হয় আর কেহ যমক লিখিতে পারিবেন না। সরল রচনায় লিখিত আর একটী অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিতেছি;—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।"

এখানে রচনা যেমন সরল হইতেও সরল, আবার ইহাতে ব্যাজস্তুতিতে রচনার চমৎকারিত্বের আতিশয্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় :

"বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

প্রভৃতি রচনার কবিতা-নৈপুণ্যে অথিশয়োক্তি চাপা পড়িয়াছে। এখানেই কবির কৃতিত্ব অন্নদা পাটনীর নিকট স্বীয় পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন :

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ খ্যাত।

পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।''—ইত্যাদি।

শ্লেষালঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উপরিউক্ত কবিতাগুলি শ্রেষ্ঠ কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ''বিদ্যাসুন্দর রচনার পরেই ভারতচন্দ্রের কবি-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাঁহার 'মানসিংহে' শব্দের মিল ভিন্ন আর কিছুই নাই।'' কথাটা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ''মানসিংহ'' রোগক্লিষ্ট কবির শেষ বয়সের রচনা। বহু প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবির যৌবন সময়েও পরিণত বয়সের রচনা স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করা যাইতে পারে। অন্নদামঙ্গলে প্রথম দুই খণ্ডে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইলেও 'মানসিংহ' যে কবিত্বহীন, একথা বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। মানসিংহকে স্থানে স্থানে কবি-শক্তি ও রচনা-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে, অথচ ইহাতে রুচিদুষ্টতার একান্ত অভাব। 'মানসিংহে' কাব্যরসের উন্মত্ত প্রবাহ ও তরঙ্গভঙ্গ না থাকিলেও ইহার বহু স্থানের কবিতা উপভোগের সামগ্রী।

হিন্দু মুসলমান

ডাঃ আব্‌দুল গফুর সিদ্দিকী

দেশমাতৃকার হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটী সন্তানকে আপনারা যমজই বলুন, অথবা হিন্দুকে জ্যেষ্ঠ ও মুসলমানকে কনিষ্ঠ বলিয়াই উল্লেখ করুন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই দুইটী সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সৌহার্দ্দ ও প্রণয়ের মাত্রা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি না পাইলে, দেশের উন্নতির জন্য যত প্রকার সুপন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, কিছুতেই তাহা সফলতার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ নিবাসী, মুসলমানকুলগৌরব স্বর্গীয় স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলিয়াছিলেন, "যত দিন ভারতের হিন্দু মুসলমান আন্তরিকতার সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ না হইবে, ততদিন এই মন্দভাগিনী ভারত-জননীর অদৃষ্টাকাশ মেঘাচ্ছন্নই থাকিবে—কিছুতেই হতভাগিনী ভারত-জননীর অদৃষ্টাকাশে পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জল জ্যোতি বিকশিত হইবে না।" কথাটীতে যে কোন খাদ বাটা নাই, তাহা এই দীর্ঘকালের আলোচনায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

তিনি এতৎ প্রসঙ্গে দুইটী উদাহরণও দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকে যদি একটী হরিণ রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান তাহার দুইটী চক্ষু; অথবা ভারতবর্ষকে যদি একখানি গোশকট বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান ঐ শকটের দুইখানি চক্র। ইহার একের অভাবে অপরটী ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়।

সকল দেশে সকল সমাজেই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; যথা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। দেশের অশিক্ষিত অধিবাসীবৃন্দ অবিরত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহাই হইল পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম।

আমাদের দেশে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী; অপরটী মাতৃভাষার সেবক। যাঁহারা রাজনীতি আন্দোলনে ব্যস্ত, তাঁহারা যেমন হিন্দু মুসলমানে মিলনের প্রয়াসী; যাঁহারা মাতৃভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা ও চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারাও সেইরূপ হিন্দু মুসলমানে প্রণয়-বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য তৎপর।

এদেশে রাজনীতি আন্দোলন-আলোচনার মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতেই, হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে।

যদি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মঙ্গল চিন্তা কাহারও হৃদয়ে বলবৎ হইয়া থাকে, তবে তিনি সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু-মুসলমানে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করুন; কিন্তু এই মিলন,

এই সৌহার্দ্দ রাজনীতি চর্চ্চায়, সভার সাহায্যে সম্ভবে না, তবে কি হিন্দু মুসলমানে মিলনের কোন সদুপায় পাই? আছে। সে উপায় মাতৃভাষার সেবায়, সে উপায় বাণীমাতার সাধনায় এবং সে উপায় বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চায়। এখানে স্বার্থ দ্বন্দ্ব কোলাহল কিছুই নাই; আছে কেবল জ্ঞানের পিপাসা। যতই সাধনা করি না, ততই পিপাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং যাঁহার যত জ্ঞান-সিন্ধু সদৃশ মহাজন, ততই তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় এপথেও কয়েকটা কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ পথের যাঁহারা পথ-প্রদর্শক, এক্ষেত্রে যাঁহারা মহারথ, তাঁহাদিগকে একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া পথের কণ্টক সরাইয়া দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। উপসংহারে বঙ্গীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এইটুকু বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করিতেছি যে, যে সকল কাব্য ও নাটকাদিতে মুসলমান জাতিকে হেয় ও ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, অতঃপর সেই সকল ঘৃণিত ভাব ও ভাষা আপনারা দূর করিবার চেষ্টা করুন, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপে কেহ লেখনীচালনা না করেন, তাহার সুব্যবস্থা করুন! অনেক পুস্তকে ইতিহাসের দোহাই দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজের প্রাণের কথা এই যে, তাঁহারা যবন ম্লেচ্ছ নেড়েরূপে হিন্দুভ্রাতাদের সহিত মিশিতে প্রস্তুত নহে।

লেখ্য ও কথ্য-ভাষার মিলন

শ্রী আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ

অনেকদিন হইতেই প্রাচীন লেখ্য-ভাষার ছাঁচ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাষার এই পরিবর্ত্তনের সময়ে এক শ্রেণীর সংস্কারকগণ কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষাকে লেখ্য-ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে রক্ষণশীলগণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দেশবাসিগণকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছেন। এই রক্ষণশীলতা ও পরিবর্ত্তন প্রয়াসের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া শিষ্যগণ কোন পথে চলিবেন, তাহা ভাবিয়া বিরত হইতেছেন। কাজেই এখন এই উভয় মতের একটা সামঞ্জস্য করিয়া না লইলে আমাদের অন্যান্য নানাপ্রকার অমিলনের বিষ-বহ্নির ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে।

সাধারণতঃ, কথ্য-ভাষাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা (১) পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য-ভাষা। (২) পশ্চিমবঙ্গের কথ্য-ভাষা। অনেকগুলি শব্দের ও ভাষার অভিব্যক্তির সুর-তান-লয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গের সকল স্থানের কথ্য-ভাষারও অনেক অসামঞ্জস্যের মধ্যেও একটা সাধারণ সামঞ্জস্যের মিলন বন্ধন রহিয়াছে। কথ্য-ভাষার এই বিভাগ অনুসারে বঙ্গের জাতীয় চরিত্রও আমরা বিভক্ত দেখিতে পাই। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের হাব ভাব, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের বল ও দুর্ব্বলতার মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গেরও সামঞ্জস্য সেইরূপ; অথচ এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ নিয়ম এক হইলেও, পূর্ব্বাপরই একটা বিভিন্নতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিভিন্নতা যেন কথ্য-ভাষার সহিত সম্বদ্ধ। এখন যদি বাস্তবিকই লেখ্য ও কথ্য-ভাষা এক করিয়া লইতে স্বীকৃত হওয়া যায়, তাহা হইলে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষাকে সমগ্র বঙ্গের লেখ্য-ভাষা করা যায় কি না? কলিকাতার কথ্য-ভাষায় কথা কহিতে অভ্যস্ত হইলেও বাস্তবিক যে স্থানে প্রাণের গান গাহিবার ও প্রাণ খুলিয়া উন্মাদনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন হয়, সে স্থান হইতে এই অনাহূত কথ্যশব্দগুলি যে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পূর্ব্ববঙ্গের পুত্র-শোকাতুরা জননী আজীবন পশ্চিমবঙ্গে বাস করিয়াও পশ্চিমবঙ্গবাসিনী রমণীগণের মত সুরতানলয়ে কাঁদিতে পারিবেন না, অথবা কাঁদিয়া তৃপ্ত হইবে না। এরূপ অবস্থায় সর্ব্ববঙ্গে এক নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের কথ্য-ভাষায় যদি প্রাণ খুলিয়া প্রাণের গান গায়িবার নিমিত্ত ও প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ভাব ও অভাব স্বাভাবিকরূপে সকলের প্রাণে প্রাণে বুঝাইয়া দিবার আশায় অতি সরল ও সহজ কথ্য-ভাষাকে লেখ্য-ভাষা করিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে প্রতি প্রদেশের কথ্য-ভাষাকে

তৎপ্রদেশের লেখ্য-ভাষা করিয়া না দিলে উহা আপনার উদ্দেশ্য-অনুযায়ী হইবে না। এইরূপ করিতে গেলে ঘরে ঘরে এক একটা লেখ্য ও এক একটা কথ্য-ভাষার সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালাকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে।

সকল প্রদেশের শব্দগুলিকে সমান আদরে ব্যবহার করিয়া আমাদের সাধারণ ব্যবহৃত লেখ্যভাষাকে আমরা অনেক পরিমাণে সহজ, সরল ও সাধারণ করিয়া লইতে পারি। আদান-প্রদান দ্বারা আমরা সর্ব্ববঙ্গের কথ্যশব্দের ব্যবহার প্রচলিত করিয়া লইলেই যে কথ্যভাষার সকল অংশ লেখ্যভাষা হইবে, তাহা নহে; যাহা অবশিষ্ট রহিবে, তাহা আমরা সাধারণ লেখ্য-ভাষায় গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইচ্ছা করিলেই তাহারও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারি। আমরা নাটক, নভেল প্রভৃতি গ্রন্থে বক্তার মুখ হইতে প্রাদেশিক শব্দব্যতীত ক্রিয়াপদাদিযুক্ত প্রাদেশিক বাক্যবিন্যাস-প্রণালী প্রকাশ করিতে পারি। বর্ত্তমানে নাটক অথবা উপন্যাসাদিতে নায়ক-নায়িকা যে দেশবাসীই হউক না কেন, তাহার উক্তি কলিকাতার কথ্য-ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। ইহাতে পরিচয় না দিলে, বক্তা কোন দেশের লোক, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ইহার প্রথম কারণ, লেখকগণের কলিকাতার কথ্যভাষা ভিন্ন অপর প্রদেশের কথ্য-ভাষাকে তুচ্ছজ্ঞান ও ঘৃণা করা; দ্বিতীয়, সকল প্রদেশের কথ্যভাষায় অনভিজ্ঞতা।

আমার শৈশবে কৈশোরে আমি প্রাচীন-প্রাচীনাদের মুখে যে সকল শব্দ শুনিয়াছি, এখন তাহার লিখিত-ব্যবহার থাকিলে তাহারা বিলুপ্ত হইতে পারিত না। ঐ সকল শব্দের বিলোপে বাঙ্গালীর কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বিচার করিবার শক্তি আমার নাই; তবে আমার যতদূর ধারণা, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, এই শব্দসম্পদ ও কথ্যভাষার শৃঙ্খলা ও ব্যবহারের ইতিহাস হইতে মোটামুটি হিসাবে বাঙ্গালীর জাতীয়তা ও প্রাচীন ইতিহাসের আভাস ফুটিয়া বাহির হয়। লেখ্য ও কথ্য-ভাষা-সমন্বিত বঙ্গভাষার একখানি সম্পূর্ণ শব্দ অভিধান চাই। কথ্য-শব্দগুলি লেখ্য-ভাষায় প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে অথবা একই সময়ে আমাদের এই শব্দাভিধান প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রতি প্রদেশের সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিকগণকে আপনাপন প্রদেশের কথ্য-শব্দগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং ঐ সকল শব্দ ক্রমশঃ অভিধান-ভুক্ত করিয়া বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ শব্দ-সম্পদের একখানি অভিধান সঙ্কলন না করিলে চলিবে না। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকারগণ প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থ প্রতিপৃষ্ঠার নিম্নে, অথবা কোনও অংশে একত্র লিখিয়া দিলেই উহা অনায়াসে পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব—পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি—নাটক ও উপন্যাসাদির বক্তার মুখ হইতে প্রাদেশিক কথ্যভাষা ব্যক্ত করিয়া বঙ্গের প্রতি প্রদেশের কথ্য-ভাষার ইতিহাস সংরক্ষণ করা। এই কার্য্যের ভার আমি সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবীদিগকে গ্রহণ

করিতে অনুরোধ করি, এবং আবার বলি—প্রদেশ-বিশেষের কথ্যভাষাকে, ঘৃণ্য তুচ্ছ মনে না করিয়া, সরল, উদার প্রাণে উহাকে আপন ভাবিতে চেষ্টা করুন।

বর্ত্তমানে যেস্থলে প্রদেশ-বিশেষকে ঠাট্টা করিবার প্রয়োজন হয়, মাত্র সেইস্থলে ব্যঙ্গভাবে সেই প্রদেশের কথ্যভাষা অবিশুদ্ধরূপে এবং ব্যঙ্গোক্তির পূর্ণ সমর্থনোপযুক্ত করিয়া ব্যক্ত করা হয। ইহা দ্বারা কথ্যভাষার সংরক্ষণ ত হয়ই না, অধিকন্তু প্রদেশ বিশেষের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা সাধারণতঃ ভাবেন, তাঁহাদের কথ্যভাষাই বিশুদ্ধ ও আদর্শ; আর যাঁহারা তাঁহাদের মত না ভাবেন বা না বলেন, বা না করেন, তাঁহারাই অমানুষ ও ঘৃণ্য।

ভাষার মিলনদ্বারা জাতীয়-মিলন বন্ধনের ইচ্ছা থাকিলে কোনও প্রদেশকে ও তাহার ভাষাকে তুচ্ছ করিলে চলিবে না।

মেয়েলী ব্রত

শ্রী ভোলনাথ ব্রহ্মচারী

বর্দ্ধমান জেলার যে অঞ্চলে আমাদের বাস, সেই অঞ্চলে প্রচলিত ক একটী "মেয়েলী ব্রতের" বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন বাটীর প্রাঙ্গণে একটী ছোটখাটো পুকুর কাটিয়া, তাহার চারিকোণে চারিটী খেত বানাইয়া মটর, কলাই, খেঁসারি প্রভৃতি বপন করিতে হয়। পুকুরের মধ্যস্থলে একঝাড় ধানগাছ, কালো ও সাদা কচুগাছ, শুশুনি ও কলমীলতা ও একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছোট ঘট স্থাপন করিতে হয়; এবং পুকুরটী জলপূর্ণ করিয়া পুকুরের জলে একটী সজীব চ্যাংমাছ দিতে হয়। পুকুরের মধ্যে চারিকোণে চারিকড়া কড়ি এবং চারিখানি হলুদ পুঁতিতে হয়। তৎপরে প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (কারণ স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, ব্রত-মন্ত্র কাকে শুনিলে ব্রত পচিয়া যায়) কুমারী ব্রতিনীগণ কাচা-কাপড় পরিধান পূর্ব্বক চন্দনচর্চ্চিত পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে।

প্রথমে পুকুরপূজা করিতে হয়। পুকুরপূজার মন্ত্র, যথা—

যম পুকুরটী পূজন,
সোণার থালে ভোজন।
সোণার থালে ক্ষীরেরনাড়ু
শাঁখার উপর সোণারখাড়ু।"

এইরূপে ঐ মন্ত্রে ধানগাছ, কলাইখেত, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ পার পূজা করিতে হয়।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কালোকচু ও সাদাকচুগাছ পূজা হয়। যথা ঃ—

"কালো কচু ধলো কচু লহ লহ করে।
যমের দুয়ারে অর্গল পরে।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুকুরে জল দিতে হয়, যথা ঃ

"চারিকোণা পুকুরটী টাব্ টুব্ করে।
চ্যাংমাছটী এদিকে ওদিকে লাফিয়ে পড়ে।।
শুশুনি কল্মী দম্ দম্ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে
মারে পক্ষী শুকায় বিল।
সোণার কপাট রূপার খিল।।

খিল্ খসাতে খসাতে হাতে গেল ছড়।
আমার বাপ্ ভাই লক্ষেশ্বর।।

সর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা ঃ

"যমপুকুর ব্রত করে যে।
যমের জ্বালা পায় না সে।।"

কিন্তু বর্দ্ধমান জেলায় যমকে কোলে লইয়া যমের মা ও বামন এবং যমপুকুরের চারিধারে কাক্, হাঁস, কুম্ভীর, কচ্ছপ প্রভৃতিব মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা হয় এবং পূজার পর ব্রতকথা কহিয়া নৌকাদ্বারা "পাটনী তুমি পার কর, যমরাজার মা তুমি জল খাও" "পাটনী তুমি পার কর. বামন তুমি জল খাও" ইত্যাদিক্রমে এক-একটী মূর্ত্তি পার করি[illegible] হয়।

সাঁজ-পূজানী

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন ব্রত আরম্ভ করিতে হয়; অগ্র[illegible] সংক্রান্তি দিবসে শেষ হয়। এতদ্দেশে কুমারীগণ মনোমত স্বামীপুত্র লাভের জন্য, আশানুরূপ ধনরত্ন লাভে[illegible] আশায় এবং পিতৃকু[illegible] পতিকুলের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় [illegible] থাকে। এদে[illegible] স্ত্রীলোকদিগের [illegible], "সাঁজ-পূজানী" ব্রত না ক[illegible] পাওয়া যায় না। সেই জন্য এদেশের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে একটা [illegible] প্রচলন হইয়াছে, যথা ঃ

"সকল ব্রত করলেন ধনী।
বাকী রেখে সাঁজ-পূজানী।"

[illegible] সন্ধ্যাকালে গৃহের রোয়াকে আতপ-চাউলের পি[illegible] চন্দ্র, সূর্য্য, গঙ্গা, যমুনা, কচুগাছ, শরবন, গোবাড়ী, গোলা, শস্যক্ষেত্র, [illegible] ঘাট, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার [illegible], কড়ি, মোহর. ডোম, ডোমনী, প্র[illegible] অঙ্কিত করিয়া কুমারী-ব্রতিনীগ[illegible] কলা, নারিকেল, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ এ[illegible] আতপ-তণ্ডুলের নৈবেদ্য লইয়া পাড়া-প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন যথা ঃ

"সাজ-পূজানী অরুন্ধতী,
এ ব্রত করে পার্ব্বতী;
এ ব্রত কল্লে কি হয়,—
সভাসুন্দর পতি পায়,
রাজচন্দ্র পুত্র হয়।"

ঘটপূজার মন্ত্র

"সাঁজপূজানী সেঁজতি,
বার ঘরে তের বাতি,
একঘরে মোর ঘটটী;
ঘটটী পূজি, মাগি বর,
ধনেপুত্রে বাড়ুক ঘর।"

গঙ্গাযমুনা পূজার মন্ত্র

"গঙ্গা যমুনার পূজারী হয়ে,
সাত ভাইয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে,
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে,
মৃত্যু হয় যেন গঙ্গার জলে।"

চন্দ্র-সূর্য্য পূজার মন্ত্র

"চন্দ্র সূর্য্যি পূজন,
সোণার থালে ভোজন,
সোণার থালে ক্ষীরের নাড়ু,
শাঁখার উপর সোণারখাড়ু।"

শরবন পূজার মন্ত্র

"শর, শর, শর,
আমর বাপ্ ভাই গাঁয়ের বর।"

বেনাগাছ পূজার মন্ত্র

বেণা, বেণা, বেণা,
আমার ভাই বাপ্ গাঁয়ের সোণা,
সোণা সোণা ডাক্ পাড়ে,
গা গাছি গুয়ো পড়ে,
আমার বাপ্ ভাই চিবিয়ে ফেলে,
অন্যের বাপ্ ভাই কুড়িয়ে খায়।"

কাজলনাটা পূজার মন্ত্র

"কাজনাটা কাজলনাটা বাসরঘর।
দাও মেলানী পাই বর।"

ফুলগাছ পূজার মন্ত্র

ফুলগাছ ফুলগাছ ঝাকরী।
সতীন বেটী মাকরী।।
সাত সতীনের সাতটী কৌটা।
আমার আছে নবীন কৌটা।।
নবীন কৌটা নাড়াচাড়া।
সাত সতীনের মুখ পোড়া।।"

ঢেঁকি ও উনন পূজার মন্ত্র

"ঢেঁকি পরন্ত, উনান জ্বলন্ত।
বাপ ঘর, শ্বশুরঘর সমান চলন্ত।

দীপাধার গোময় পূজা

"বাসি গোবরনাদটী থাসি থুসি।
উনানে না দেই ফু,
বৌরান্না ভাত খেয়ে চাঁদপানা মু।।"

ইহা ছাড়া "সাঁজপূজানী" ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পিঠালীর আলিপনার দ্বারা অঙ্কিত টাকা, কড়ি, মোহর, অলঙ্কার প্রভৃতি সুখে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত দ্রব্য ঃ

"তোমাকে দিলাম পিঠালীর মোহর,
আমাকে দিও সোণার মোহর।"
"তোমাকে দিলাম পিঠালীর খাড়ু
আমাকে দিও সোণারখাড়ু।"

ইত্যাদি ক্রমে নিবেদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই সেই প্রকৃত দ্রব্য পাইবার প্রার্থনা এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ। তৎপরে দীপপূজা।

দীপপূজার মন্ত্র

"রূপার প্রদীপ সোণার শীষ।
যতদূর শ্রীমতী অমুক (ব্রতচারিণী)
যাবে, তত দূর আলা দিস।।"

পুষ্পপাত্র, কলারপাত পূজার মন্ত্র

আঙ্গট পাত কলার পাত।
চার বৎসর করলাম বত।।
যত বত তত মতি।
শ্রীমতী অমুক (ব্রতনী) আমাদের পুণ্যবতী

"পূজান্তে পূজার ফুল কুড়াইবার ও প্রণাম করিবার মন্ত্র ঃ

অরুণ ঠাকুর বরণে,
ফুল ফুটেছে চরণে,
যখন ঠাকুর স্নানে যান,
সবফুলগুলি কুড়ায়ে লন।"

সর্ব্বশেষে উপস্থিত রমণীগণকে প্রসাদ প্রদান করা হয়।

তসোলা ব্রত

এইব্রত অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন আরম্ভ করিতে হয় পৌষমাসের সংক্রান্তিতে শেষ হয়।

একখানি মৃত্তিকার নূতন সরায় একুশটী গোবরের লাড়ু, একুশটী অশ্বত্থের পাতা এবং একুশটী বেগুণের পাতা দিতে হয়; এবং তাহাতে একটী বুড়া ও একটী বুড়ির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। প্রত্যহ ভোরবেলায় কুমারী-ব্রতিনীগণ সরিষার ফুল দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন। যথা ঃ

"তস্ তসোলার কাঁধে ছাতি।
শ্বশুরধনে জয় জগতী।।
তসোলা লো রাই,
তোমার দৌলতে আমরা ছব্‌রী পিঠে খাই।
ছব্‌রী নব্‌রী গাঙ সিনানে যাই,
গাঙের ভিতর চিড়ে কলা ডব্‌ডবিয়ে খাই।
বেগুনের পাতা ঢালা ঢালা
বুড়োবুড়ির কাণে সোণার তালা।।
বেগুণপাতা ঢালা ঢালা।
মা বাপের কাণে সোণার তালা।।
বেগুণপাতা ঢালা ঢালা।
আমার কাণে সোণার তালা।।
সরিষার ফুল বিড়ির বিড়ি।

বুড়োবুড়ির কাণে সোণার ঢেঁড়ি।।
সরিষার ফুল বিড়ির বিড়ি।
মা বাপের কাণে সোণার ঢেঁড়ি।।
সরিষার ফুল-বিড়ির বিড়ি।
আমার কাণে সোণার ঢেঁড়ি।
গরুর গোবর সরিষের ফুল।
পূজি আমরা মা বাপের কুল।।
পৌষমাসের শীতল পানি,
শীতল শীতল ডাকে,
রাই উঠেছেন রাই উঠছেন
বড় গঙ্গার ঘাটে।
কার্ হাতে রে তেল্ আম্‌লা
দাও গা রাইএর হাতে;
রাই উঠ্‌ছেন, রাই উঠ্‌ছেন
মেঝ গঙ্গার ঘাটে—
কার হাতে রে ফুলের সাজি
দাও গা রাইএর হাতে।।
রাই উঠ্‌ছেন রাই উঠ্‌ছেন
ছোটগঙ্গার ঘাটে—
কার হাতে রে ঘিয়ের প্রদীপ
দাও গা রাইয়ের হাতে।।"

পুণ্যিপুকুর, দশপুত্তল, গো-কাল ও হরির-চরণ ব্রত।

এই সমস্ত ব্রত চৈত্রসংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে হয়।

পুণ্যি-পুকুর

বাটীর প্রাঙ্গণে বা স্নানেবঘাটে একটী ছোটখাটো পুকুর কাটিয়া তাহার মধ্যে একটী কণ্টকময় বিল্বশাখা রোপণ করিতে হয় এবং পুকুরে একটী আম্র দিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। যথা ঃ—

"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা।।
আমি সতী নিরবধি।
সাত ভাইএর বোন ভাগ্যবতী।।

স্বামীর কোলে পুত্র দোলে ।
মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে।।”

দশপুত্তল

প্রথমে শিবদুর্গার যুগলমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হয়; তাহার পর দশটী পুতুল অঙ্কিত করিয়া তাহার নিকট একটী ঘট স্থাপন করিতে হয় এবং ঘটের কোলে একটী আম্র, একটী সুপারী, এককড়া কড়ি ও একখানি হলুদ রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। যথা ঃ

“দশপুত্তল পূজে যে,
দশ ফল পায় সে।
এবার ম'লে-মানুষ হব।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লব।।
সীতার মত সতী হব।
রামের মত স্বামী পাব।।
লক্ষ্মণ দেবর পাব।
কৌশল্যা শাশুড়ী পাব।।
দশরথ শ্বশুর পাব।।
শিবের মত বাপ পাব।
দুর্গার মত মা পাব।।
লক্ষ্মী সরস্বতী বোন পাব।
কার্ত্তিক গণেশ ভাই পাব।।
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
লক্ষ্মীর মত গিন্নি হব।
বসুমতীর মত ধীর হব।
কলাবউএর মত লাজুক হব।
বাঁশের মত ঝাড় হব।
দুর্ব্বার মত লতিয়ে যাব।
সাত ভাইএর বোন হব।
সাবিত্রীর সমান হব।।”

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা ঃ

"আকন্দের ফুল বিল্বপত্র
তোলা গঙ্গার জল।
তাই পেয়ে তুষ্ট হন,
ভোলা মহেশ্বর।।"

হরির-চরণ ব্রত

মৃত্তিকাতে শ্রীহরির যুগলচরণ অঙ্কিত করিয়া তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করা হয়।

হরির চরণ হরির পা।
চুয়ো চন্দন দিয়ে পূজলাম পা।।
হরি বলে ওগো মা।
কোন্ ভাগ্যবতী পূজে পা।।
সে ভাগ্যবতী কি চায়।
অমর বর চায়।।
মনভরা ধন চায়।
কোলভরা পুত্র চায়।।
বাড়ীভরা গোলা চায়।
আড়িভরা সিন্দুর চায়।।
সভাসুন্দর পতি চায়।।
রাজার মত পুত্র চায়।।
গোয়ালে গরু বাকারে ধান।
বৎসরান্তে পুত্র চান।।

পূর্ব্ববঙ্গের শব্দসম্পদ ও তাহার বিশেষত্ব

শ্রী অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ

আমরা যে সকল কথার দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করি, তাহার নাম ভাষা; আর আমাদের মনে যাহা চিন্তা, হৃদয়ে যাহা ভাব এবং প্রাণে যাহা অনুভূতি তাহারই বহিঃপ্রকট বর্ণময়ী মূর্ত্তির নাম সাহিত্য। ভাষা দ্বিবিধ। এক কথিত,—অপর লিখিত। অথবা ইহাকে প্রাদেশিক ও সার্ব্বজনীন, এই দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। সার্ব্বজনীন ভাষাই সাহিত্যের প্রাণ। প্রকৃত বাঙ্গালা-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়,—তাহার ভাষা সার্ব্বজনীন। কথিত ভাষায় বা প্রাদেশিক ভাষায় যে সকল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য নহে; সুতরাং তাহা প্রকৃত সাহিত্যের বহির্গণ্য। প্রকৃত সাহিত্যের ভাষা কথোপকথনের ভাষা নহে। সাহিত্যের ভাষা স্বতন্ত্র,—সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বজনবোধ্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য। প্রকৃত বাঙ্গালা-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার শব্দ ও ভাষা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। কিন্তু কথিতভাষা বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র সমান নহে। পশ্চিমবঙ্গের কথোপকথনে ব্যবহৃত অনেক শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের অপরিচিত; পূর্ব্ববঙ্গের কথোপথনে ব্যবহৃত বহুশব্দ পশ্চিমবঙ্গের অপরিচিত। এই নিমিত্ত সাহিত্যে আমরা যথাসম্ভব সার্ব্বজনীন শব্দ ও ভাষা প্রয়োগেরই পক্ষপাতি এবং প্রাদেশিক শব্দপ্রয়োগের ঘোরতর বিরোধী।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে যে প্রদেশের অধিবাসী, তাহার রচনায় সে প্রদেশের দুই একটী প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ তাহার পক্ষে প্রায় অনিবার্য্য। আর ইহাতে সাহিত্যের তেমন কিছু ক্ষতি হয় বলিয়াও মনে হয় না; আর সাহিত্যের প্রকৃত মর্ম্মার্থগ্রহণেও কাহারও তেমন বিশেষ অসুবিধা হয় বলিয়া শুনা যায় না। কিন্তু যে সাহিত্যের আদ্যন্ত প্রাদেশিকতায় পূর্ণ—যে সাহিত্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত—সে সাহিত্য দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণের বস্তু নহে, সে সাহিত্য সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণতা নহে। সাহিত্য উন্মুক্ত, অসীম—উদার—উচ্চ ও মহান্। সাহিত্য দেশের সর্ব্বসাধারণের সমাদরের বস্তু। এ সাহিত্যকে যাহারা প্রাদেশিকত্বে সংকীর্ণ করে, তাহারা যে দেশের শত্রু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার মধুসূদন, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ও হেম-নবীনের গ্রন্থের ভাব ও ভাষা স্থানে স্থানে যতই কেন কঠিন না হউক, বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বড় বড় কবি-বিরচিত দুই একখানি গ্রন্থের ভাব ও ভাষা লইয়া বাঙ্গালী যে গলদ্‌ঘর্ম্ম—

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাই, প্রথমোক্ত লেখকেরা যথাসম্ভব প্রাদেশিকত্ব পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সার্ব্বজনীন শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, আর শেষোক্ত লেখকগণ যতদূর সম্ভব সাহিত্যে প্রাদেশিকত্বেরই প্রাধান্য দিয়াছেন।

মানুস তাহার নিত্য-ব্যবহার্য্য যাবতীয় কথায় সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করিলে তাহা যেমন বড় বিসদৃশ শুনায়,—সাহিত্যরচনায় তেমনি প্রাদেশিক কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করিলেও তাহা বড় বিসদৃশ বোধ হয়। সুতরাং দেখা যায়,—কথার ভাষায় সাহিত্যরচনা, আর সাহিত্যের ভাষায় কথোপথন, দুই-ই বিসদৃশ। কাজেই ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার্য্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই কথিত ও লিখিত ভাষায় অল্পাধিক পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই নিমিত্ত প্রায় সকল জাতির লেখকগণই সাহিত্যে যতদূর সম্ভব সার্ব্বজনীন শব্দপ্রয়োগেরই পক্ষপাতী। ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, হেম, নবীন প্রভৃতি যে সকল সাহিত্য-মহারথী বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যতদূর সম্ভব প্রাদেশিকতা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সাহিত্যে সার্ব্বজনীন শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য এতদিন বাঙ্গালা-সাহিত্য সাধারণতঃ কাহারও নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দ এবং কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই সাহিত্য অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গের আপামর জনসাধারণ কৃত্তিবাসকে বুঝিয়াছে;—কাশীদাসকে বুঝিয়াছে; বিদ্যাপতিকে বুঝিয়াছে;—চণ্ডীদাসকে বুঝিয়াছে;—ভারতচন্দ্রকে বুঝিয়াছে;—ঈশ্বরগুপ্তকে বুঝিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গের বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথকে তাহারা বুঝিয়া উঠিতেছে না কেন, ইহা সাহিত্যিক মাত্রেরই আলোচনার এক উপযুক্ত বস্তু।

আমি কথাপ্রসঙ্গে আমার প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পাড়িয়াছি; এখন আসল কথা কহিব। আমার কথা এই যে, প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার সাহিত্যে বর্জ্জনীয় হইলেও উহার আলোচনা বা সমালোচনাও কি সাহিত্যের পক্ষে বর্জ্জনীয়? কখনই নয়। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস,—উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পক্ষে সর্ব্বথা মঙ্গলপ্রদ।

বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের কথিত ভাষা বিভিন্ন। বাঙ্গালার এক প্রদেশের লোকের সকল কথা অন্য প্রদেশের লোকে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্য বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দগুলি সযত্নে সংগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে আমরা যে কেবল বঙ্গের বহু অজানিত প্রাদেশিক শব্দের অর্থগ্রহণে সমর্থ হইব, তাহা নহে; ইহাতে বঙ্গভাষায় শব্দসম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে

কেহ কেহ যদি দয়া করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ প্রাদেশিক শব্দসমূহ সংগ্রহকল্পে মনোযোগী হন, তাহা হইলে বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইতে পারে। দেখিয়া সুখী হইলাম যে,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিক্রমপুর" পত্রে জনৈক লেখক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আলোচনায় যত অধিক লেখক হস্তক্ষেপ করেন, ততই মঙ্গল।

বহুদিন হইতেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কথিত ভাষার মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ করিয়া তাহার আলোচনায় নিযুক্ত হওয়ার বাসনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সাময়িক পত্র সম্পাদনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া অনবকাশ-নিবন্ধন এতদিন আর তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি বর্দ্ধমান হইতে সম্মিলন-কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণপত্র পাইয়া এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা আমার মনে পুনরায় জাগিয়া উঠে। তাহারই ফলে আজ এ প্রবন্ধটী আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমাদিগের কথোপকথনে এমন বহু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি,—যাহাব অর্থ পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ অভিধানেও সেই সকল শব্দের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ঐ সকল শব্দের ভাব ও অর্থ আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, তৎসমূদায়ের ব্যবহার আমাদের নিকট অপরিহার্য্য ও অপরিহার্য্য। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর সহিত কথোপকথনকালে আমরা যথাসম্ভব সেগুলি বর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার প্রতিশব্দই প্রয়োগ করি বটে; কিন্তু বলিতে কি, তাহাতে আমাদের প্রকৃত তৃপ্তি হয় না। এজন্য আমরা একজন পশ্চিমবঙ্গবাসীর সন্নিধানেও যদি দুই একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে কথোপকথনকালে আমাদের সেই চির-অভ্যস্ত, অস্থিমজ্জা গত ও সহজবোধ্য শব্দসমূহেরই প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহা নিতান্তই সত্য কথা যে. পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পরস্পর কথোপকথনকালে, একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী নিকটে থাকিলে. তিনি হয় ত সেই কথোপকথনের অনেক কথাই বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিবেন। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহা আমাদেব অপরিহার্য্য।

"নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা বলচাতকীর,
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা?"

আর ইহাও নিতান্ত সত্য কথা যে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীর অনেক কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর অতি অল্প কথাই

পূর্ব্ববঙ্গবাসীর অবোধ্য। পশ্চিমবঙ্গবাসীর কথোপকথনে ব্যবহৃত দুইচারিটী শব্দ ছাড়া প্রায় সকল শব্দই আমাদের সহজবোধ্য। এক্ষণে কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের কথোপকথনে ব্যবহৃত প্রায় সকল শব্দই আমাদের সহজবোধ্য, অথচ আমাদিগের কথোপকথনে ব্যবহৃত বহু শব্দ তাঁহাদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য। এ সমস্যার সমন্বয় কি? সমন্বয় আর কিছুই নহে; একমাত্র সমন্বয়,—পূর্ব্ববঙ্গের সেই নিজস্ব শব্দসমূহ স্পষ্টার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দ সহ বর্ণানুক্রমিক লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থাপিত করা। আমি এ প্রবন্ধে তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি! আমি যে সকল শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পত্তি। যদি একথা সত্য হয়, তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী, ধনসম্পদে না হউক, শব্দসম্পদে পশ্চিমবঙ্গবাসী অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ। আমরা কোন্ কোন্ শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ, এক্ষণে একটি একটি করিয়া তাহাই প্রদর্শন করিব।

পশ্চিমবঙ্গের "উনুন" কি তাহা পূর্ব্ববঙ্গ জানেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "আখা" কি তাহা পশ্চিমবঙ্গ জানেন না। পশ্চিমবঙ্গের "বিড়াল-কুকুর" পূর্ব্ববঙ্গ দেখিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "মেকুর-কুত্তা" পশ্চিমবঙ্গ দেখেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের "শিল নোড়া" পূর্ব্ববঙ্গ দেখিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "পাটা পুতা"র মূর্ত্তি পশ্চিমবঙ্গ দেখেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের "ভেটকি" (মৎস্য) কেমন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই জানেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "ভেট্‌কি" কিরূপ তাহা পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই জানেন না। পশ্চিমবঙ্গের "মুড়ী" ও "মুড়্‌কীর" স্বাদ পূর্ব্ববঙ্গ পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "উরুম" ও " উপড়া"র স্বাদ পশ্চিমবঙ্গ পান নাই। তারপর "ঝাটা" কি, "চিংড়ি" কি, তাহা পশ্চিমবঙ্গ যেমন বুঝেন, পূর্ব্ববঙ্গও তেমন বুঝেন; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "পিছা" কি ও "ইচা" কি, তাহা পশ্চিমবঙ্গ সম্ভবতঃ আদৌ জানেন না। পূর্ব্ববঙ্গের "পিছার ভাটা" ও 'ইচার ঝোল" কি বস্তু, তাহা পশ্চিমবঙ্গে অজানিত। আজ পশ্চিমবঙ্গকে ইহাই ভাল রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভরসা করি, আজ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না, কেন না; একদিন যাহা পশ্চিমবঙ্গের দুর্ব্বোধ ছিল, আজ হয় ত তাহা অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইবে। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের "ভেটকি" "পিছা ও 'ইচা" প্রভৃতি কোন্‌টা কি, বস্তু "অ" হইতে "হ" পর্য্যন্ত তৎসমুদায়ের বর্ণানুক্রমিক বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি ঃ

অ

অক্য—সত্য। যেমন—"অক্যের ধন হইলে পাইবই।"

অখন—এক্ষণের অপভ্রংশ। যেমন, "অখন না তখন"

অগা—বোকা, নির্ব্বোধ। যেমন—"তাহার ছেলেটা অগা।"

অচ্চা, অচ্চু—আশ্চর্য্যবোধক উক্তি। যেমন—"অচ্চা লোকটার কাণ্ড দেখ।"

আ

আইল—ক্ষেত্রের চতুপার্শ্বস্থ অপ্রশস্ত রাস্তা।

আতাইল—ঐ।

আইলা—আগুনের পাত্র।

আইজ—আজএর অপভ্রংশ।

আউগ—ইক্ষু।

আকাম—যে কার্য্যের সার্থকতা নাই।

আখা—উনুন।

আকাল—দুর্ভিক্ষ।

আখরা—আশ্রম।

আগৈল—ঝাঁকা, টুক্‌রী।

আচান—আচমন।

আচেষ্টা—কুকাণ্ড। যেমন—"যেমন লোক তার আচেষ্টা দেখ।"

আইচা বা আচি—নারিকেলের মালা।

আথাইলা পাথাইলা—দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিবেচনা না করিয়া; যেমন—"তাহাকে আথাইলা-পাথাইলা মারিয়াছে।"

আদনা—বাজে। যেমন—"তুমিও যেমন—আদনা লোকের কথায় বিশ্বাস কর।"

আকোন্দা—যাহা চলে না। যেমন—"একটা আকোন্দা নৌকা।"

আটাস—আশ্চর্য্য।

আবাইতা—লোভী। হাবাতের অপভ্রংশ।

আস্য—নিয়ম; চলন। যেমন—"আমাদের এই কার্য্যের আস্য নাই।"

আলা চাউল—আতপ চাউল।

আবডাল—আড়াল।

আবাল—বলদ।

আন্দার—অন্ধকারের অপভ্রংশ।

আঠাই জল—ডুবু জল।

আছিলাম—ছিলাম।

আইলাম—আসিলাম।

ই

ইচা—চিংড়ি মাছ।

ইরুর—খাগের ন্যায় এক রকম সরু নলের গাছ।

ইস্তক—হইতে। যেমন—"জন্ম ইস্তক আর সুখ হইল না।"

উ

উইট্‌কা—উল্‌টিয়া পড়া।

উলি—উই পোকা।

উপড়া—গুড়যুক্ত খৈ। অনেকটা মুড়কির মত কিন্তু একটু কড়া পাকের।

উব্বৎ—উপুড়।

উদলা—অনাবৃত।

উট্‌কান—রয়ে রয়ে মনে পড়া। ঠাট্টাচ্ছলে ব্যবহৃত হয়। যেমন—"তাঁহার হাউস উট্‌কাইয়া উট্‌কাইয়া উঠে।"

উঠান—আঙ্গিনা।

উড়াল—উড়িবার শক্তি। যেমন—"পাখী উড়াল শিখিলে আর তাহার ভাবনা কি?"

উরুম—মুড়ি।

এলা—এখন।

এন্দল—কাদা।

ও

ওটা—ঘরে উঠিবার সিঁড়ি। সাধারণতঃ কাঁচা মাটীর সিড়িকেই ওটা বলে।

ওঠ—ওষ্ঠ।

ওকাড়ান—হিংসা করা; মনে মনে অমঙ্গল-কামনা করা। যেমন—"ছেলেটাকে ওকাড়াইয়া ওকাড়াইয়া মারিয়া ফেলিবে দেখিতেছি।"

ওক্কা—হুকা। যেমন, "ওক্কা আছে কল্কি নাই তামাক খাইয়া যাও।"

ওক—উদগার, বমনোদ্রেক।

ওচা—ত্রিকোণাকৃতি একরকম মৎস ধরিবার যন্ত্র। বাঁশের চটিদ্বারা তৈয়ার করা হয়।

ওম—গরম, তা।

ওম দেওয়া—তা দেওয়া।

ক

কচমা—করি

কদমা—চিনি ও ময়দা দ্বারা প্রস্তুত এক রকম সুদৃশ্য খাবার দ্রব্য। পূর্ব্ববঙ্গে শীতকালে ইহার ব্যবহার খুব বেশী।

করুল—বাঁশের নবোদ্গত পাতা।

কড়া—কচি ফল। যেমন—আমের কড়া।

কাইল—কালি, আগামী কল্য বা গত কল্য।

কামলা—মজুর।

কাষ্ঠু—পক্ষপাতী; স্বার্থপর।

কাইম—বাঁশের লম্বা লম্বা কঞ্চি বা কাঠি।

কাউ—একরকম টক্ ফল। গ্রীষ্মকালে পূর্ব্ববঙ্গে ইহার উৎপত্তি খুব বেশী।

কুত্তা—কুকুর।

কুইড়া—অলস, কুড়ে।

কোষ নাও—একরকম ছোট নৌকা।

কাইজা—কলহ।

কের্দ্দানী—বাহাদুরী।

কেরামত—শক্তি, বল, বীরত্ব।

কোম—চিংড়ি মাছের বা ডিমের মধ্যে হরিদ্রাভ যে সুকোমল খাদ্যাংশ থাকে, তাহাকে কোম বলে।

কোন্দল—ঝগড়া।

কুন্দান—চাঁছিয়া গোল করা। কাঠের মিস্ত্রিরা একরকম যন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠখণ্ডকে যে গোল করে, তাহাকে কুন্দান বলে।

কুন্দিয়া উঠা—রাগে গর্জ্জিয়া উঠা। যেমন—"এখন চুপ কর, আর কুন্দিস না।"

কুমার—কুম্ভকার।

কোচ—মৎস্যাদি শিকার করিবার একরকম যন্ত্র।

কুপি—কেরোসিনের বাতি।

কোছ—টেক।

কোকা—খোকা।

কুকি—খুকী।

কৈতর—কবুতর।

কচলান—মর্দ্দিত করা; দলামলা।

খ

খর—খয়ের।

খরা—শুক্‌নো; অনাবৃষ্টি, ঝরঝরে। যেমন—"আজ বড় খরা দিয়েছে।"

খল্‌পা—বাঁশের চাটাই।

খাম—ঘরের খুঁটী।

খাবটা—গুরুভার কাষ্ঠখণ্ড।

খাচ—পরিমাণ মত ছিদ্র বা গর্ত্ত। একখণ্ড কাষ্ঠকে আর একখণ্ড কাষ্ঠের মধ্যে জোড়া লাগাইতে হইলে "খাচ" কাটিতে হয়।

খেকুর—কৃত্রিম কাশি দিয়া আগমনবার্ত্তা জানানো।

খবিস—অপরিষ্কার।

খান্দার—কলহ।

খুয়া—কুয়াসা।

খুইল—খুলি।

খুসী—সুখী।

গ

গইয়া—পেয়ারা।

গইঠা—গোবরের ঘুটে।

গাউতা—যে এককথা বারেবারে বলে।

গাদি—স্থান। যেমন—"পেটে নাই গাদি, ভাতেরে কয় হারামজাদি।"

গাং—নদী।

গিদর—পেটুক।

ঘ

ঘৌরা—ঘরপ্রিয়; যে ঘর হইতে বাহির হইতে চায় না।

ঘড়ুয়া—গৃহসংক্রান্ত। যেমন—"ঐ সকল ঘড়ুয়া কথায় আমাদের দবকার কি?"

চ

চক—মাঠ।

চলা—চেড়া কাঠ; পোড়াইবার কাঠ।

চলন—বিবাহাদির মিছিল। যেমন—"মস্ত চলন যায়, দেখবি ফিরে আয়।"

চাকা—ঢিল।

চান্দার—ঘরের পার্শ্বদ্বয়।

চাইমসা—পচাগন্ধ।

চারাট—নৌকার গলু-এর কাছে যে ত্রিকোণাকৃতি বসিবার কাষ্ঠাসন থাকে, তাহাকে চারাট বলে।

চুকা—টক্‌।

চোপা—মুখ; গালাগালি।

চাখা—আস্বাদন করা।

চ্যাগা—নিস্পেষিত করা; দলা।

চাঙ্গারী—বাঁশের চটি দ্বারা প্রস্তুত বড় ঝাঁকা।

চেঙ্গর—ফাজিল।

চারা—বড়শীতে মাছ ধরিবার জন্য সুগন্ধযুক্ত যে মসলা ব্যবহার করা হয়, তাহাকে চারা বলে।

চাড়া—মাটীর পোড়াহাঁড়ির ছোট ছোট ভগ্নাংশকে চাড়া বলে।

চৈর—নৌকা বাহিবার লম্বা বংশদণ্ড।

চৈরা—পিতলের গামলা।

চারি—কাঠের গামলা।

ছ

ছই—নৌকার ছাউনী।

ছন—বন। ঘরের চাল ছাইবার জন্য যে খড় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ছন বলে। যেমন—"যার ছিলনা ছনের কুড়ে, এখন তাহার বাড়ী যুড়ে চৌচালা আটচালা কত ঝিলমিলি কপাট।"

ছন্‌ছা—চালের কিনারা।

ছন্‌ছাতলা—চালের কিনারা, যেখানে বৃষ্টির জল পড়ে।

ছালি—ছাই।

ছালা—চটের থলে।

ছিটা—একবিন্দু।

ছিটাল—আঁস্তাকুড়।

ছাইছ—ঘরের পিছন।

ছেপ—থুথু।

ছোব—বংশ।

জ

জাঙ্গাল—সারি, শ্রেণী। যেমন—পিপীলিকার জাঙ্গাল।
জেব—পকেট।
জেদার—দেদার, যথেষ্ট।
জোকার—উলুধ্বনি।
জিঙ্গইল—বাঁশের শাঁখা।
জোয়ান—বলবান।

ঝ

ঝাগুড় মাছ—মাগুর মাছ।
ঝাল্টু—পাকা, যেমন—"সে এই কাজে একজন ঝাল্টু।"
ঝাকিজাল—এক রকম মাছ ধরিবার জাল।
ঝাড়ি—গাড়ু।

ট

টাল—স্তূপ।
টুই—ঘরের চালগুলি যেখানে পরস্পর মিশে, তাহাকে টুই বলে।
টোপা—মাটীর ছোট ছোট ঘট।
টোম—তরঙ্গ।
টালান—খ্যাপান; যথা—"পাগলটাকে আর টালাইস্ না।"
টুরী—একপোয়া চাল ধরে, এরূপ বেতের ডালা।

ঠ

ঠাল—গাছের ডাল বা শাখা।
ঠার—সাঙ্কেতিক ভাষা।
ঠাঁট—জাঁকজমক।
ঠোসা—ফোস্কা।

ড

ডর—ভয়।
ডাঁট—বাঁট।
ডাঁটা—ঐ; যেমন—"পিছার ডাটা" অর্থাৎ ঝাটার বাঁট।
ডেকরা—তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য।

গেগ—পিতলের হাঁড়ি; ডেগ্‌চি।
ডোঙ্গা—ঠোঙ্গা।
ডোস্কা—ফাঁপা; অতিরিক্ত মোটা।
ডাক্কুইস্—ভয়সূচক উক্তি। যথা—"আরে ডাক্কুইস্‌চে্ যে তুফান।"
ডাউগ্‌গা—কচুগাছ প্রভৃতির ডালকে ডাউগ্‌গা বলে।

ত

ত—তামাক সাজিবার সময় কল্কির ছিদ্রের মধ্যে যে একটী গুলি ব্যবহার করা হয়, তাহাকে "ত" বলে।
তক—পর্য্যন্ত, যথা "এই তক বুঝি যে সে পাগল নয়।"
তল্পি—বোচ্‌কা, গাঁঠ গাঁঠরি ইত্যাদি।
তর—রকম; বেতর—বিসদৃশ, বেয়াদব।
তাল—হুস্; জ্ঞান।
তাহুত—পরিশ্রম।
তাইস—রুচি।

থ

থোয়া—রাখা।
থেতা—যাহা সহজে কাটা যায় না।
থুবরা—জড়সড়, একত্র।
থাক—শ্রেণী, সারি।
থাকথাক—সারিসারি।

দ

দশি—প্রদীপের সলিতা।
দাউদরা-খাউদরা—খস্‌খসে, কর্কশ।
দাওয়াল—ইতর, চাষা।
দপান—ধড়ফড় করা, লাফান।

ফ

ফান—ফাঁদ, যথা—"তুমি ঘুঘু দেখেছ ফান দেখ নাই।"
ফাতরা—ফাজিল; কলাগাছের শুষ্ক পাতা ও খোলকেও ফাতরা বলে।
ফাল—লাফ।
ফালাফালি—লাফালাফি।

ব

বাইটা—সূতা।
বাইল—সুপারিগাছের খোল।
বাউগরা—তাল, খেজুর ও নারিকেল গাছের ডালকে বাউগরা বলে।
বেবাক—সমস্ত।
বেজ—ভদ্রলোক।
বরই—কুল।
বৌটা—একরকম বেতের টুর্‌রী। ইহাতে ১৬ সের ধান ওজন করা যায়।
বদনা—গাড়ু।

ভ

ভাঁড়ালী—কলাগাছের শাঁস।
ভেঙ্কি—ঘরের গোড়ার বেড়ার উপরের বেড়া।
ভেঙানি—ভেঙচানি।
ভেদা—মেনি মাছ।
ভেট্‌কি—মুখবিকৃতি; ভেঙচানি।

ম

মেড়া—ভেড়া।
মচ্‌কা—ঘরের চালগুলি যেখানে পরস্পর মিলিত হয়, সেখানে যে ছাউনী দেওয়া হয়, তাহাকে মচ্‌কা বলে।
মাগ্‌গি—দুর্ম্মূল্য; সম্ভবতঃ মহার্ঘ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে।
মেকুর—বিড়াল।
মাজা—কোমার।
মাইজাল—মেঝ।
মাইচা—চেয়ার, কেদারা।
মাইর—প্রহার।

য

যো—সুবিধা; সুযোগ; যেমন—"সেখানে আর যাওয়ার যো নাই।"

র

রাউয়া—হাবাতে; লোভী।
রাইঙ্গ—মাটীর হাঁড়ি।

রাব—তামাক মাখিবার গুড়।

ল

লটি—সুপারিগাছের খোলের টুক্‌রা।
লুড়ি—নুড়ি।
লাক্‌রী—খড়ি, জ্বালানী কাষ্ঠ।
লটকন্—নোলক।
লাগুড়—লাগাল ধরা। যেমন—"যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি লাগুড় যদি পাই,
ঝাড়েমূলে আমি তবে আগুনে পোড়াই।"
লচ্‌কা—ঘরের খুঁটি ও পাইরের সঙ্গে যে বন্ধন, তাহাকে লচ্‌কা বলে।
লাই—অতিরিক্ত আদর। যথা—"লাই কুত্তার পাতে ভোজন।"
লেছুর—ময়লা, জঞ্জাল; মাটির সঙ্গে গা মিশাইয়া চলার নামও লেছুর।
লুষ্ঠি—ঘাম।
লেঠা—মুস্কিল, যথা "মহা লেঠায় পড়িলাম।"
লেহাজ—লজ্জা।
বে-লেহাজ—নির্ল্লজ্জ।

স

সাদাপাতা—তামাকপাতা।
সুইমর—উত্তর।
সোরা মাছ—শুষ্ক মৎস্য।

হ

হুটক—সাজসজ্জা।
হাটর—কষ্ট।
হাউতা—পাতিলের ন্যায় একরকম মৃৎপাত্র।
হাতাইল—ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শস্থ অপ্রশস্ত রাস্তা।
হাউস—সখ।
হাউসনাগী—সৌখীন, যথা—"হাউসনাগীর বিয়াই।"

বাঙ্গালা প্রবাদ-সংগ্রহ

শ্রী সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ

অতিমন্দ শুভকরী।
অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।
　　অবলা প্রবলা যস্য, মন্ত্রিষস্য নিরক্ষর,
　　অন্ধস্য স্কন্ধমারূঢ় বিপদ তস্য পদে
　　পদে।
অকাজে বেশী দড়, লাউ কাটে খরখর।
অন্ধজাগ, কিবা রাত্র কিবা দিন।
অল্পজলে পুঁটি মাছ।
আপনার ছাগল লেজ থেকে কাট।
　　আন্ মাগীর আন্ চিন্তে!
　　দুয়া মাগীর ভাতারের চিন্তে।
　　আকালের ঝারী,
　　মায়ে ঝিয়ে জল পিয়ে মরি।
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।
আমে দেখে ধান, তেঁতুল দেখে বান।
আননা ধান, মাননা মূসুরি।
　　আঁকড়ধারী বাঁকড়াবাসী
　　মুড়িখান রাশি রাশি।
অভাবে গুরুর ধন খরচ হয়।
আদায় কাঁচকলা।
　　আপ্তবুদ্ধি শুভকরী, গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ।
　　পরবুদ্ধি নাশকশ্চৈব, স্ত্রীবুদ্ধি তথৈব চ।
আঁতে পুতে চাস।
　　আম ফুরালে আমসী,
　　যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি।
　　আগেহাঁটে, পাঁঠাকাটে, প্রদীপ উস্কায়,
　　দৈবাটে, ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রান্ধনী
　　বামুন,
　　যশ পায় না এই সাতজন।
　　অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘ-
　　ডম্বুরে,
　　দম্পতিকলহশ্চৈব বহবাড়ম্বে লঘুক্রিয়া।
অতিবাড় বেড়না, ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে
অতি ছোট হইওনা, ছাগলে ছিঁড়ে খাবে।
　　আশিজুতা গুণে খায়,
　　ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।
আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর।
আটে পিটে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চর।
অধর্ম্মের পয়সা।
আপনার চরকায় তেল দাও গে।
ক'বার নেড়া বেলতলায় যায়।
আস্‌কে খেয়েছ, ফোঁড় গণ নাই?
আউশেও যা পৌষেও তা।
　　আম, আমড়া সজনে, শিমুল,
　　ফাগুণের জলে সব নির্ম্মূল।
　　আমারে না দিয়ে ননী,
　　কত ধন রেখেছ তুমি।
　　আমারর শ্লোকটি ফুরাল,
　　নটেগাছটি মুড়াল।
তাই ডেগরের মরণ---মাঝ-মাঠে।
　　ইষ্টি কুটুম বাবা,
　　সকল কুটুম টাকা।
উড়তে নারে ফুরফুর করে।
　　উইলসেন, ইষ্টিসেন, আর কেশব
　　সেন,
　　তিন সেনে দেশ মজালে।

উপরে থুতু ফেল্লে গায়ে লাগে।
উবুনদী ষোল ক্রোশ।
উঁচুকপাল, চিরুণি দাঁতি।
খড়পায়া, অধিক বাতি।
উচু পিড়ে শত্রুকে দিবে।
ঊণভাতে দুণফল, পূরাভাতে রসাতল।
এক মাঘে শীত পলায় না।
এক কম্বলে দুইফকিরের জায়গা হয়,
তবু এক দেশে দুই রাজার জায়গা হয় না।
এক দেশের ঝুলি
অন্য দেশের পালি।
এ খোলা আমার পাটালি।
এত ধাতালি কাঁথা বগলে
কোথা ছিলে ঝড়বাদলে।
এ মাসী ও মাসী, তবে কেন উপবাসী।
এ কি হলো মকর, গঙ্গাজল
খাচ্ছি দাচ্ছি শুকায়ে যাচ্চি
মাজায় পাই না বল।
এমন মার মারব হালিম খেতে হবে।
একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ।
কড়ি যেওনা কুটুমবাড়ী,
হবে যে ছাড়াছাড়ি।
কর্জ্জ দেবে না যার চলে জুতা,
কর্জ্জ দেবে না যার কাঁধে পুতো।
কানা খোড়া ভাঙ্গুড়
হারামজাদার নাঙ্গুর।
কাক সকলের মাংস খায়,
কাকের মাংস খেলে কাক কা কা করে।
কাণ টানিলে মাথা আসে।
ক্রোশ অন্তর ধুয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।
কালি কলম মন, লিখে তিনজন।
কেঁচ ধর্ত্তে পারে না, সাপ ধর্ত্তে যায়।
কেঁচ খুঁড়তে যেন সাপ বাহির হয় না।
কড়ি দিয়ে খাব দৈ,
গোয়ালিনী আমার কিসের সৈ।
কখন নাই লক্ষ্মীপূজা একবারে দশভূজা।
কুকুরের পেটে ঘী হজম হয় না।
বন পোড়ে সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না।
কোথাকার লঙ্কাপোড়া।
কানা কন্যের নানারোগ।
কানাপুতের নাম পদ্মলোচন।
কুড়ে গরু অমাবস্যে খুজে।
কোথা বাঙ্গা কোথা কুসী,
তাঁতি রেখে ধোবা পুষি।
কবুতরের কল্যাণে মহিষবলি।
কোন্ বা বিয়ে, তার দুপায়ে আল্‌তা।
কুশ, কেশে, বেনা, তিন অভাবে সন্না।
কার শ্রাদ্ধ কে করে,
খোলা কেটে বামুন মরে।
কালর মন ভাল, কটার মন হটা।
কালনয়নে কেলেসোনা,
ইচ্ছে করে কত জনা।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা বার করা।
কাণে জল দিয়ে জল বার করা।
কাজির কাছে মুর্গির বিচার।
কিলিয়ে কাঁটাল পাকান।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়,
মন্দ মন্দ দিচ্চে বায়
খনা বলে বাঁধগা আল,
আজ না হয় হবে কাল।
কোন্ অভাগীর পোষাবিড়াল।

সারানিশি জাগবে, মাচার নীচে কাস্তে
আছে,
মাজপাড়া কেটে মাথায় দাওরে।
কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা
কনের মা কান্দে
টাকার হাড়ী বান্ধে।
কাঠের বিড়াল হউক না কেন
ইন্দুর ধর্ত্তে পারলে হয়।
কাণা নড়ী কবার হারায়।
কিসে নয় ক কি, পান্ত ভাতে ঘী।
কলমি-শাক বলে আমার পুকুর যুড়ে
থানা,
কত কাটবে কাটুক না, না করিব মানা।
শুশুনিশাক বলে আমার চারটি চারটি
পাতা,
বৌ ঝি এলে আমি কই দুঃক্ষের কথা।
কত দুঃখের নীলমণি
জানে দিদি রোহিনী।
খোঁড়ার পা খোপরে পড়া।
খুঁটার জোরে বলদ লড়ে।
খেলিলে কাণাকড়িতে খেলা হয়।
খিটিখিটি বুণে, সব তাঁতীকে জিনে
খেলুম না দেলুম
পাথর ধুয়ে মলুম।
খাটে খাটায় দুগুন পায়
তার অর্দ্ধেক বসে পায়।
গতরের নাম আদরমণি,
গতর খাটাও খাও ননী।
গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।
গরু জরু ধান, তিন রাখবে আপন
বিদ্যমান।
গাছে কি ফল হবে, পাতাতে মালুম।
গো লাঠী, পো চাপড়।
গোত্র হারালে কাস্যপ গোত্র।
গাধা সকল জিনিস বইতে পারে
ভাঙ্গা কাঠীটি বইতে পারে না।
গাধা পিটালে ঘোড়া হয় না।
গাবতলায় যাব না, গাব ফল খাব না।
গাব খাবনা ত খাব কি,
গাবের চেয়ে আছে কি।
গুড়ুকে গম্ভীর বুদ্ধি।
গায়ের গন্ধে ভূত পালায়।
গরু মেরে জুতা দান।
গরজে গোয়ালা ঢেলা বয়।
পায়ে রাং তামা ঠকায় নাই।
ঘর থাকতে বাবুই ভিজে।
ঘোড়া যোড়া পান,
না ফিরালে মান।
ঘোড়া চিনবে কানে,
দাতা চিনবে দানে।
ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখ নাই।
ঘর সর্ব্বস্বটি তোমার,
চাবিকাটিটি আমার।
ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে।
ঘর সারলে দড়ি,
বিয়ে সারলে কড়ি।
চাল নাই ঝুলিতে,
লাফ মারে কুলিতে।
চালুনিতে ঘোল বিলান।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
চোরকে বলে চুরী কর্ত্তে,
গৃহস্থকে বলে সত্বর হতে।
চলিতে না পারিলে বলে উঠান বাঁকা।
চাল দিবে যত,

জল দিবে তার তিন তত,
উথলাইলে দিয়ে কাটি,
জ্বাল করে দিবে ভাটি।
চৈত্রে ভ্রমণ পন্থা, অথবা নিম্বভক্ষণ,
অথবা যুবতী ভার্য্যা, অথবা বহ্নিসেবন
চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।
চিনি খেয়ে মিনি।
চাস করে ভাত খেতাম যদি,
ঘানি টানতে হতোনা
বলাই শ্বশুর গো।
চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া।
চোরে চোরে মাসতুত ভাই।
ছেলেকে লাই দিও না,
বুড়কে খৈ দিও না।
ছেলের হাতের মোয়া
ছাড়া সাতটা মাথা।
ঝাপি দাড়িয়ে কাঁপি।
ছাড় বেটি ছাড়, পুরুষের রাগ চণ্ডাল।
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।
ছেঁড়া চাটায় শুয়ে থাকে
লাখ টাকার স্বপন দেখে।
যম জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।
জাত হারালে বৈষ্ণব।
জমি জহরত জরু
তিন আপদের গুরু।
জল নেড়ে জোঁকের বল দেখ।
জাতভাল শুভকর্ম্মের বাদ্যকর।
ডুবে জল খাওয়া।
ডুবেছি না ডুবতে আছি,
পাতাল কতদূর।
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানিতে হয়।
ঢেউ দেখে নাও ডুবাও না।
ঢাল নাই তরয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার।
ঢেঁকি না কুল,
চাল না চুলো।
ঢাকের শব্দ থামলে ভাল লাগে।
ঢপ্ দেখে কফ করে।
তেল তামাকে পিত্তিনাশ,
যদি করে বার মাস।
তেলামাথায় তেল সবাই দেয়।
তুমি আমার রোদের ছাতা,
জাড়ের কাঁথা, আকাল কাল। (তোমার)
কার মিছরি ভিজে, হায়
হারালে পাই না খুঁজে।
তুমি যে ডুমুরফুল হলে গো।
তার দুঃখে হাড়ী ডোম, চণ্ডাল কাঁদছে।
তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।
তোর কি তেল বাতি পুড়ছে?
তুমি রাধা আমি শ্যাম,
এই কাঁধে বাড়ি বলরাম।
তাঁতির তাঁত বুনা ছিল ভাল,
গরু কিনে কাল হলো।
তোমারই শিল তোমারই নোড়া,
তোমারই ভাঙ্গিব দাঁতের গোড়া।
তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।
থালায় জল রেখে ডুবে মরব।
দস্যির বাড় দশদিন।
দিন যাবে, কথা রবে।
দুই সতীনের রান্না,
ঘরের গিন্নি ভাত পান না।
দামু ঘোষের বেটা শিশুপাল।
দিবা শিবা নিশা কাক,

বৎসের কোলে গাভীর ডাক,
ঘরের উপর গৃধিনীর বাসা,
ছাড়বে গৃহস্ত জীবনের আশা।
দুই কাণে রামখড়ি,
চলে মিন্‌সে গুড়িগুড়ি।
দৈয়ের আগা, ঘোলের শেষ,
কচি অজ বুড় মেষ।
দরবারে না পেয়ে ঠাই,
ঘরে গিয়ে মাগ কিলাই।
ধানভানিতে শিবের গীত।
ধূলা পায়ে বিদায় হবে।
ধরমে থাকিলে তুমি রাখ হে ধরম।
নাই মামার চেয়ে কানামামা ভাল।
নাই বল্লে সাপের বিষ উড়ে যায়।
নায়ের কুকুর পাতে ভোজে।
নাই দিলে কুকুর মাথায় উঠে।
নামের ডাকে গগন ফাটে।
নরানাং মাতুল ক্রম।
ন রাত্রে দধি ভোজনম্।
না হল অঙ্কুর নাহল পাতা,
বাদে লাগ্‌ল বিধাতা।
নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্চে।
নির্ব্বিষ সাপের কুলপারা ফনা।
নটে খটে আড়ায়ে, সজনে বার মাস।
নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার।
ন দেবে ন ধর্ম্মে।
নয়নচ্ছারে খাবে।
নূতন চাঁদ দেখে, মুখে তেল মেখে।
নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবোধ উড়ায় হেসে।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই।
না খেলিবে জুয়া, না ডেঙ্গাবে কুয়া।
নাচতে নেমে ঘোমটা টানা।

নিম নিসিন্দা যেখানে রয়,
সেখানে কি মানুষের পীড়া হয়।
নন্দঘোষের বেটাটা,
সেটা বড় ঠেটাটা।
রূপ নাই গুণ নাই, সুধু চিকণকালাটা।
ননীর পুতুল তা রোদে গলে যাবে।
নরানাং নাপিতো ধূর্ত্ত।
পাঁচে জনে করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।
পেটে খেলে পিঠে সয়।
পরের ভাতে বেগুণপোড়া।
পরভাতি হইও, পরঘরি হইও না।
পরের ছেলে পরমেশ্বর।
পেটের বালাই মুড়ি,
ঘরের বালাই বুড়ি।
পরের ধনে পোদ্দারি।
পবনের পুত্র ভাই তার নামটি কি?
ভাগের বেলায় দেড়া দুন, আমরা জানি কি?
অদ্য হৈতে হৈল ভাই সমান সমান,
তবে তার নামটী ভাই বীর হনুমান।
পরের দিব্বি পান্তভাত।
পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী।
পুঁজি নাই নারায়ণ,
কোথা পাব সিংহাসন।
পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে।
পড়লে শুনলে দুধু ভাতি,
না পড়লে ঠেঙ্গার গুতি।
পড়ে ত সর খায় ঘি,
তার কড়ির খরচ কি?
পরের সোণা দিওনা কাণে,
কেড়ে নিবে হেঁচকা টানে।

পুঁটিমাছের প্রাণ টিপলেই নাই.
পাতের ভাতে মানুষ।
বামুণ বাদল বান,
দক্ষিণে পেলেই যান।
বসতে জায়গা হলে শুতে পারা যায়।
বেল পাকিলে কাকের কি?
বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
সাগর ডেঙ্গাতে বানর মাথা করে হেট।
বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসি।
বিয়ের বালাই বরযাত্র।
বানের জল যেচে ঢুকান।
বৃষ্টি যদি হয়, তবে, আমাদের গ্রামে,
আর একটি গ্রামে।
বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত।
বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া।
বেগারেরপুণ্যে গঙ্গাস্নান।
বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ।
বানরের চুল হলে বাঁধতে জানে না।
বেটীবেচা, না পাঁটীবেচা।
বুড় শালিক পোষ মানে না।
বক ধার্ম্মিক।
বাপের নাম দূরে গেল, হরে জোলার নাতি।
বাবুজী ঘোর কলিকাল,
দিনের বেলায় চাঁদে গেরণ, খেজুরগাছে তাল।
বুলে বার, বসে তের।
বসে থাকি না বেগার যাই।
বল্লে মা মার খায়,
না বল্লে বাবার জাত যায়।
বিড়ালতপস্বী আমি ধর্ম্মে দিয়েছি মন—
জুতার বা হাড়ের মালা গলায় দিয়ে
যাচ্ছি বৃন্দাবন।
বাবা হাটে, মা পেটে,
তখন আমি বছর সাত আটে।
বুড়ালে বক চিন না।
বামে শিবা, শব দৃষ্ট, দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ।
ভাই কি বা রবি জ্বলে,
ভাই—কেবা চক্ষু মেলে।
ভাত পায় না চিড়ের নাগর,
আমানী খেয়ে তার পেটটা ডাগর।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
ভাল দিন দেখে মুখে তেল মেখে।
ভাত পায় না ভাতার চায়,
থেকে থেকে ছুঁড়ি গয়না চায়।
ভাত দেয় না ভাতারে,
ভাত দেয় গতরে।
ভূঁইফোড় ছেলে।
ভূতের মুখে রামনাম।
ভাত ফেলিলে কাকের অভাব নাই।
ভাজা খাবে ত তেলের ব্যয়।
ভাতার যমকে দিতে পারি,
তবু সতীনকে দিতে পারি না।
ভুলিলো ভুলি, খরজ্বালে খৈ আসকে
ধিকি জ্বালে সরুচাকলি।
ভালবাসা কেমন,
ভালবাসা যেমন।
মাংসে মাংসবৃদ্ধি,
দুগ্ধে শুক্রবৃদ্ধি,
ঘৃতে বৃদ্ধি বল,
শাকে বৃদ্ধি মল।
মাসে এক বছরে বার,

তা চেয়ে চড় কমাতে পার,
মা চায় আঁতপানে,
মাগ চায় আঁচলপানে।
মেয়ে দেখবে ফেতড়ি,
গাই দেখবে ঝামরি।
মুনিব গেলে ঘোল পায় না,
চাকরকে পাঠায় দুধ আনতে।
মেউ ধরবে কে?
মাঘের মাটি হীরের পাটি
ফাগুনের মাটি লোনা,
চৈত্রের মাটি যেমন তেমন
বৈশাখের মাটি সোনা।
মামার জয়ে জয়।
মাতাল আর দাঁতাল।
মন ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না।
মনে অগোচর পাপ নাই—
মায়ের অগোচর বাপ নাই।
মাথা নাই তার মাথাব্যথা।
মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।
যার তরে পালাও তুমি,
সেই দেবী আমি।
যাঁহা মুস্কিল তাহা আসান।
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,
মশা মারতে গালে চড়।
যেমন কর্ম্ম তেমনি সাজা,
অড়হর ডাল পটল ভাজা।
যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা,
তার সনে হয় নিত্য দেখা।
যেমন হাড়ি, তেমনি বিড়ে।
যে করে রাগ, তার যায় ভাগ।
যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা।
যাব হাতে খাই নাই সে বড় রান্ধুনি।

যৌবন জুয়ারের জল,
দুদিন পরে ঢল মল।
যার খাই তার গুণ গাই।
যার ক্ষেত তার বুদ্ধি, পাকা ধানে মই।
যদি খাবে কাল দেবনের ভাত,
ডোবা দেখে পাতবে পাত।
যদি কালদেবনে যাবে বাবা,
তেল মাখবে আবাথাবা।
যদি বলে রোকা,
তবে পালিয়ে আস রে ভেড়ের বেটা বোকা।
যদি বল্লে ঋণ, তবে কিনে ফেল ভাগ দুইতিন।
যদি থাকে আগে পাছে,
কি করবে তার শাকে মাছে।
যেখানে বৃক্ষ নাই সেখানে ভেরেণ্ডা গাছই বৃক্ষ।
যদি না পড়ালো পো,
তবে সহবৎ নিয়ে থো।
যার দৌলতে রামের মা,
তারে তুমি চিন না।
যে এলো চষে, সে রৈল বসে।
যদি মানুষ মরলা,
গ্রামের লোক কাদলা।
এ তোমার শিয়াল মারবার লচনা।
যেখানে পাইবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।
যার জন্যে যার মন কাঁদে না,
সে চালা থাকতে ভাত রান্ধেনা।
যার জন্যে যার মন কান্দে,
সে বীজ ধান ভেনে ভাত রান্ধে।

যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই।
যারে রাখ সেই রাখে।
যত ছিল নাড়াবুনে, সব হলো কীর্ত্তনে।
যদি বর্ষে আঘণে, রাজা যায় মাগনে,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজার পুণ্যি দেশ।
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।
যত করি উপার্জ্জন
গোদাপায়ে বিসর্জ্জন।
রাজার ঘরে চুরি, পারি কি নারি।
রমণী অবনীপালে যে করে বিশ্বাস,
দাঁড়ায়ে বালির বান্ধে হয় সে হতাশ।
রংগের বেলায় রাংগে কড়ি
রং ফুরালে গড়াগড়ি।
লাজে সরমে যে জন মরে,
শুঁট পিপুলে তার কি কাজ করে।
শিয়াল, ঘুঘুর ছা, ফাঁদে না দেয় পা।
সাতথালি তেলও পুড়বে না,
রাধাও নাচবে না।
সতীন চেয়ে সতীনের কাঁটা মন্দ।
সতের বিনাশ নাই।
সাতেও হাঁ, পাঁচেও হাঁ।
স্বনামো পুরুষ ধন্য,
পিতৃনামে চ মধ্যম,
অধম শ্বশুর নামশ্চ
শালা নামোধমাধম।
সখীরে সখী আপন মান আপনি রাখি।
শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মীছাড়ে।
সিয়ানে সিয়ানে কোলাকুলি।
সাত গেঁয়ের কাছে মাম্‌দবাজী।
সব শিয়ালের এক রা।
সাত ঘাটের ঠেলা খাওয়ান।
সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়।
শঠের পিরিতী বালির বান্ধ,
কভু হাতে দড়ি কভু চাঁদ।
শিয়ালের যুক্তি।
সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।
সাত বাণিজ্যের ধন এক ক্ষেতের কোণ্।
সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ।
ষাঁড়ে ধান খায়, ভাঁতী বান্ধা চায়।
সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।
শাঁখারির করাত, যেতেও কাটে আসতেও কাটে।
শ্যাম রাখি কি কূল রাখি।
শ্বশুরাবাড়ী মথুরাপুরী,
তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ী।
সর লো সর, আমার নূতন মলে লাগবে জল।
সালুক খেয়ে দাঁত কাল,
লোকে বলে আছে ভাল।
সেই ধানে সেই চাল, গিন্নি বিনে আলথাল।
সৎসঙ্গে গেলে তুমি খাবে গুয়াপান,
অসৎসঙ্গে গেলে তুমি কাটাবে নাক কান।
সুন্দর গাধা।
সাত রাঁড় এক এয়ো,
যার কাছে যাই সেই বলে আমার মত হইয়ো।
সাদা, মুলুকজাদা।
সল্‌তে উস্কায়ে দিতে লোক নাই।
সেকরা মায়ের কাণের সোণা চুরী করে
সাঁজে সকালে বাহ্যে যায়,

তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।
সপ্তম মঙ্গলে যার রন্ধ্রগত
শনিকে দিবে অনলে,
হাতকে ধরে সে ফণী।
সরস্বতীর কাছে পাঠের বিচার।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।
স্বরের মাথায় দিয়ে, পা,
যথা ইচ্ছা তথায় যা।
শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাবে তাই সয়।
শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।
শনিবারের মড়া দোসর খুজে।
শক্তের তিনকুল মুক্ত।
শুভস্যশীঘ্রং অশুভস্য কালরহণং।
শ্যাম কাঁদান ভাল নয়,
কাঁদালে কাঁদিতে হয়।
সাত বৈদ্য এক পথ্য।
শাকা হাতে গোরপা,
ওর বাপ যার শ্বশুর সে হয় আমার ভাসুর।
সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে,
যে মণিকে খোঁড়ে তার মুখটী পোড়ে।
শিশিরে কি ফলে ধান্য বিনা বারি বরিষণে।
সকালে বর্ষা বিকালে বান,
মধ্যাহ্নে বর্ষিলে ধানেই ধান।
সেকরার ঠুক্‌ঠাক্ কামারের এক ঘা।
সময়ে কমলের মধু আপনি উথলে রে,
তারে কে শিখায়।
হেলে থাকতে না বয় হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।
হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত।
হাটে নাটে ঘুরে এলাম ঘাটে নাই না,
রণে বনে ফিরে এলাম ঘরে নাই মা।
হরি বিনা হরির যাত্রা,
বিনা পিষ্টকে মাধব,
কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষ,
প্রহারেন ধনঞ্জয়।
হাতীর গলায় ঘণ্টা।
হাসতে হাসতে দিলাম ধূলি,
ধূলি নয় সে কূলে কালি।
হিজল গাছে না বান্ধা।